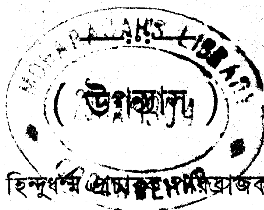
আকাশ-গঙ্গা।



(উপন্যাস)

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক পরিব্রাজক

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

"She is mine own,
And I as rich in having such a jewel
As twenty seas, if all their sands were pearls,
The water nectar, and the rocks pure gold."

(*Shakespeare.*)

কলিকাতা।

বরাহনগর, পালপাড়া "হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা" প্রেসে,

শ্রীবিনোদবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯। আশ্বিন।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে ধরিয়া

বিঘ্নসঙ্কুল—ভব-সমুদ্র—নিশ্চয়ই

উত্তীর্ণ হইব বলিয়া

ভরসা আছে;

তাঁহারই পবিত্র ত্রিভুবন-বিজয়ী—

"শ্রীশ্রীব্রজমোহন" নামে

এই পুস্তক ভক্তির সহিত

উৎসর্গ করিলাম।

—:*:—

ইতি শ্রীশ্রীব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়

গুরুদেব মহাশয়ের পাদপদ্মে

অসংখ্য প্রণাম।

ভূমিকা।

———:০:———

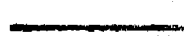
রূপ বস্তুটী কি? প্রকৃতি কাহার সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যময়ী?—ইহাই এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। মানুষের রূপতৃষ্ণায় এক অদৃষ্ট মহাশক্তি পৃথিবীর মাধাকর্ষণের মত কার্য্য করিতেছে;—এই মহা সত্য এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। প্রণয়ীর প্রাণ প্রণয়িণীর চাঁদমুখের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পরিশেষে কি প্রকারে আদর্শ অনন্ত সৌন্দর্য্যে শান্তিলাভ করে তাহা এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। কবি যে আদর্শ রূপ আঁকিবার জন্য ঈশ্বরাবিষ্ট; প্রণয়ী প্রণয়িণীর রূপের ভিতর দিয়া সেই আদর্শ রূপ দেখিবার জন্যই উন্মত্ত; এই পুস্তকে তাহাই দেখান হইয়াছে। প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয় কি বস্তু, কি প্রথায় কার্য্যকারী, মানুষকে কি প্রকারে শান্তির নিকেতনে লইয়া যায়;—তাহাই এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে।

সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণ গল্প পড়িয়া তৃপ্ত হন, হউন; তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহারা সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল, প্রতিভাশালী তাঁহারা যেন ঐ সব উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রাখেন। ইহাতে আমার জীবনের রক্ত, মজ্জা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল, আলো

ও অন্ধকার আছে ; সুতরাং কেবল গল্প পড়িলে, পাঠকের পাঠও সার্থক হইবে না এবং আমার উদ্দেশ্যও সফল হইবে না।

পরিশেষে সমালোচক দিগের প্রতি সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা কলমে বা জিহ্বায় যেন হঠাৎ এ পুস্তকের সমালোচনা না করেন। কারণ অন্যায় সমালোচনায় সাহিত্যের যেমন অনিষ্ট হয় এমন আর কিছুতেই নহে। যাঁহারা প্লেটোর "রিপব্লিক," "আইয়ন," ও "গরজিয়স্" বা জন রস্কিনের "আধুনিক চিত্রকর" অথবা "সপেন হিউএর" কৃত দার্শনিক পুস্তকের "কাব্যালোচনাটী" ভাল বুঝেন নাই ; তাঁহারা যেন এই পুস্তকের সমালোচনা না করেন।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র।



মৎপ্রণীত

পুস্তকের সুখ্যাতি।

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ইংরাজি লেখক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

We have very great pleasure in introducing and recommending to our readers Babu Satya Charan Mittra. He is a Bengali writer of Superior talents and great originality and his two books Barabau (বড়বউ) and Abalabala (অবলাবালা) were highly spoken of by the public and the press, and carried off the palm of preeminence in the Bengal g'.ernment's report of the progress of Bengali Literature (1892 Hope)

• • •

বড় বউ বা সুধাবৃক্ষ—মূল্য ৷৷০ আট আনা।

"আমরা এই পুস্তক পাঠে মোহিত হইয়াছি। পরিবার মধ্যে এরূপ উপন্যাস পঠিত হইতে দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দিত হই। বিশ্বনাথের আফিমের নেশা, নরঘাতকদিগের জীবনের পরিবর্ত্তন, কামিনীর উন্মত্ত ভাব অতি মধুরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সুরুচি ও পবিত্রতা এই পুস্তকের পত্রে পত্রে অঙ্কিত আছে ইত্যাদি ("ভেরি ও কুশদহ" পত্রিকায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত)

"পুস্তকের উদ্দেশ্য ভাল। লেখা মিষ্ট ও সরল" (নব্যভারত)

"আজকাল অনেকেই অতি সুন্দর সুন্দর নাম দিয়া পুস্ত লিখিয়া থাকেন ; কিন্তু সে সকল পুস্তকের নামই সার, এ পুস্ত খানি সেরূপ নহে, ইহার উপরের নামটি যেমন মধুর, ভিতরে জিনিসও তেমনি সুন্দর। পুস্তকের "সুধাবৃক্ষ" নাম সার্থক হইয়াছে। সরলা স্বামী অন্বেষণ করিতে গিয়া, আপনার ধর্ম্ম ধন রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, তাহা যখনি পড়িয়াছি তখনি স্বর্গের দেবী ভাবিয়া প্রণাম করিয়াছি। আর কামিনী কুচক্রী লোকে মিথ্যা অপরাধে স্বামীকে নানা বিপদে ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে, আর কামিনী তেজস্বিনী বাক্যে স্বামীর হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেছেন।" (সঞ্জীবনী)

আরো অনেক প্রশংসা আছে বাহুল্যভয়ে দিলাম না।

অবলাবালা—১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

১৮৮৭ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে "অবলাবালা" সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম প্রশংসিত হইয়াছে :—

"And the best of these is "Abala bala" by Babu Satya Charan Mittra. The characters in this book are boldly and distinctly drawn and they are real because the author is in sympathy with them &c

(Records India Government—Home department.)

প্রসিদ্ধ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত :—

"তোমার অবলাবালা পাঠ করিলে স্ত্রীলোকেরা স্বামী পাগলিনী হইবেক। রাতদিন স্বামীভাবে বিভোর থাকিলে কাজকর্ম্ম হইবে কি প্রকারে ? বঙ্কিম যে টুকু বাকি রাখিয়াছিল—তুমিই সে টুকু

ধাতু দৌর্ব্বল্যের ঔষধ।

(দাতব্য)

স্নায়বিক দুর্ব্বলতার এমন ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। শ্রী
পুরের সেই প্রসিদ্ধ পোষ্টমাষ্টার (রামলাল বাবু) আম
এই ঔষধটী বলিয়া দেন। ইহাকোন যোগীদত্ত ঔষধ।
বিনা মূল্যে দিব। কেবল ডাক খরচ গ্রাহক দিবেন। ব্য
পত্রানুসারে ঔষধ সেবনীয়। আমি এই সকল ঔষধের বিজ্ঞা
দিতে অসম্মতছিলাম। কারণ আমি ধর্ম্মপ্রচারক ও গ্রন্থক
ঔষধের বিজ্ঞাপনে আমাকে লোকে ব্যবসাদার মনে করি
কিন্তু লোকহিতার্থে অনেক লোক অনুরোধ করায় অবে
সাধুমহাত্মাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম

হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক ও বাঙ্গালাগ্রন্থকার,
শ্রীসত্যচরণ মিত্র।

কলিকাতা। পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা।

পূর্ণ করিয়াছ। এ উপন্যাস কঠোর সংসারের উপযুক্ত নহে—কোমল স্বর্গেরই উপযুক্ত। দুঃখের এরূপ ভীষণ বর্ণনা বৃদ্ধ বয়সে পড়িতে পারি না—বুক ফাটিয়া যায় ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত মতগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে। তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকের সৌন্দর্য্য ও কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

সহমরণ।

ধর্ম্মোপন্যাস—১৲ এক টাকা।

(এই পুস্তক সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা)

Sahamaran—by Babu Satya Charan Mitra, is a work of a very different nature. In this the young author attempts to give the picture of a woman absorbed in the contemplation of the Deity. The miseries of the world, the neglect of the husband, the threats of the seducer, the allurements of the wicked men, are of no moment to her. She knows only two beings, her father whom she is bouud to tend and her Kali whose presence she always feels about her. Some of the scenes are very powerfully described. The scenes in which Anupama who came to seduce her felt an immense gulf that separates him from her and was persuaded to expiate his sins by severe penances, exerts a powerful and ennobling influence upon the mind.

(India Government—Home department.)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহে লিখিয়াছেন :—

I have read your Sahamaran, with the deep feeling and intense attention and I am glad find that my prediction when I read the Abalab by an unkhown writer, some years back, has be so literally fulfilled.

You have now developed into a fullfledg and powerful novelist capable of stirring pow fully the tenderest, the sweetest, and the nobl chord of a Bengali's heart, with a full concepti of the dignity of the noble art of representi human feelings in words. Your Kadambini is giant figure ; allpowerful in doing good. She the embodiment of love, but love in a mu purer sense than that in which the word is us by the ordinary run of novelists. You have tl true key of vivifying and ennobling the Benga mind revealed to you. Go on steadily with yo mission ; success is sure to attend your efforts."

উপন্যাস-মালা—৷৷০ আট আনা

"গ্রন্থকার যিনিই হউন ইনি একজন কৃতী লেখক। অতি সর সুমধুর বাঙ্গালায় কয়েকটী মনোহর গল্প সাজান হইয়াছে। পা করিয়া আনন্দিত হইলাম।" (নব্যভারত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—১৷৷০ দেড় টাকা।

এক বৎসরে এক সহস্র পুস্তক ফুরাইল। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্ত চারিগুণ বড় হইবে—বিশেষ যত্ন পরিশ্রমের সহিত লেখা হইতেছে

হিন্দু-সৎকর্ম্মমালা।

—•:•:•—

বরাহনগর পোষ্টঃ, পালপাড়া চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রায় দুইসহস্র পৃষ্ঠায় বারখণ্ডে পূর্ণ। এই দ্বাদশ খণ্ড পুস্তক মাসুলাদি খরচাসহ ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। প্রতিখণ্ড পাঁচ আনা।

দশম সংস্করণ, প্রথমভাগে—প্রাতঃস্মরণীয় হইতে সব্যবস্থা স্নান, তর্পণ, ত্রিবেদী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা, নিত্য কাম্য পূজা ও জন্মতিথি, কোজাগর, ঘটোৎসর্গাদি ব্যবস্থাদিসহ লেখা হইয়াছে।

ষষ্ঠ সংস্করণ, দ্বিতীয়ভাগে, সানুবাদ স্তবসমূহ, শতনাম দীপান্বিতা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ও স্বস্ত্যয়নাদি।

পঞ্চম সংস্করণ তৃতীয়ভাগে.—ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদসহ সাম ও যজুর্ব্বেদীয় পার্ব্বণ, আভ্যুদয়িক ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি এবং মুমুক্ষুকৃত্য ও অকাল ব্যবস্থাদি এবং বাস্তুযাগ, বৃষোৎসর্গ, উপনয়ন ও ব্রতপ্রতিষ্ঠাদির ফর্দ্দাদি লেখা আছে।

পঞ্চম সংস্করণ, চতুর্থভাগে,—সানুবাদ-মহিম্নস্তব, শনিস্তব, আদিত্যহৃদয়, সপিণ্ডীকরণ, মুমূর্ষুকৃত্য, বৈতরণী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অশৌচের বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং তিলকাঞ্চন ও দশপিণ্ডাদি।

চতুর্থ সংস্করণ পঞ্চমভাগে,—ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুবাদসহ বিবাহ, স্ত্রীগমন, দ্রব্যশুদ্ধি, রাস, দোল, দান, একাদশী, কবচাদি।

(চতুর্থ সংস্করণ, ষষ্ঠভাগ হইতে পুঁথির আকার) ষষ্ঠভাগে,—গোহত্যাদি ঐহিক এবং জন্মান্তরীণ প্রায় যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, গো সেবা, নানা ব্যবস্থা ও ফর্দ্দাদিসহ কালীপূজাদি।

চতুর্থ সংস্করণ, সপ্তমভাগে,—সব্যবস্থা পুরশ্চরণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক ও যাবতীয় ব্যবস্থাদিসহ বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাদি।

চতুর্থ সংস্করণ অষ্টমভাগে,—কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, আপদুদ্ধার ও অপরাজিতাস্তব, এবং গুণবিষ্ণু টীকাসহ কুশণ্ডিকাদি।

তৃতীয় সংস্করণ, নবমভাগে—ব্যবস্থা ও গুণবিষ্ণু টীকাসহ গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কার, বিদ্যারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, দরাপ খাঁ কৃত গঙ্গাস্তব, নবগ্রহকবচ ও রামকবচাদি।

হিন্দু-ব্রতমালা বা দশমভাগে,—ব্রতপ্রতিষ্ঠা এবং পূজাদিপ্রয়োগ ও অনুবাদাদিসহ ব্রতকথা। ঐ দ্বিতীয়ভাগে,—বাস্তুযাগ, পুষ্করণি, মঠ ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাদি এবং সংক্রান্তি ব্রতাদি আছে। ঐ তৃতীয় ভাগে;—সটীক বৃষোৎসর্গ, চন্দ্রধেনু, দেবপ্রতিষ্ঠা, শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গপ্রকরণ এবং দীক্ষা পদ্ধতি।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। সরল অনুবাদ, সটীক দেবীসূক্ত ও স্তব কবচাদি সহ পুঁথির আকারে মুদ্রিত মূল্য ।০ চারি আনা। ঐ চণ্ডীর গোপাল চক্রবর্ত্তীকৃত প্রসিদ্ধ টীকা চারি আনা।

'বিরাটপর্ব্ব' অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকাদি ও দ্বিপাঠাদি সহ বিশুদ্ধরূপে তুলট পুঁথির আকারে মুদ্রিত। ৷৷০ আট আনা।

সত্যনারায়ণ।—পদ্যানুবাদ সহ রেবাখণ্ড টাকা।

হিন্দু-নিত্যকর্ম্ম।—স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের দ্বিতীয় মূল, দুইআনা জন্য দুইআনা।

সকলেই বলেন, এই সকল পুস্তক দ্বারা বিনা উপদেশে যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাদি নিরূপণ সহজেই করা যায়। এই বিশুদ্ধ প্রকাণ্ড পুস্তকের মূল্য ও গুণানুসারে যথেষ্ট সুলভ। এইজন্য ইহা বহুবার মুদ্রিত ও দেশময় অতি আদরের সহিত প্রচারিত হইতেছে। একখানি লইয়াই পরীক্ষা করুন।

ইহার বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া দুই একখানি কথঞ্চিৎ এইধরণে নকল পুস্তক হইতেছে বটে কিন্তু তাহা এরূপ বিশুদ্ধ বিস্তৃত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হওয়ায় ইহারই ক্রমশঃ সমাদর বৃদ্ধি হইতেছে। যাহা বারম্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে তাহার প্রসংসাপত্র (যথেষ্ট থাকিলেও) প্রকাশ বাহুল্য। সস্তার দুরবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ নকল লইয়া ঠকিবেন না। আমার পুস্তকের নাম ধাম ভালো করিয়া দেখিয়া লইবেন।

যে কোন শাস্ত্রীয় পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মিত্র মহাশয়ের সমস্ত পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন।



আকাশ-গঙ্গা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঝড়।

বৈশাখ মাস।—সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। লোহিত সূর্য্য বৃক্ষ প্রাচীরের মাথার উপর জ্বলিতেছে। বাতাস একটু শীতল হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে; বোধ হয় কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে। রাখাল গোধন-সঙ্গে ঘরে ফিরিতেছে। ঊইচিঙ্গড়া নৈস সঙ্গীতের আখড়াই সুরু করিয়াছে। আকাশের দক্ষিণে সোনার রৌদ্র একটু একটু চিক্ মিক্ করিতেছে। সেই রৌদ্র জলের ভিতরে সোনালি রং ফলাইয়া শোভা ঢালিতেছে। কোকিল, পাপিয়া মধুর স্বরে মেদিনী মাতাইতেছে। গ্রাম্য রমণীগণ কলসী কক্ষে অঙ্গভঙ্গিমায় সরোবর হইতে জল আনিতেছে।

দেখিতে দেখিতে মহীপৃষ্ঠে নৈশ-ছায়া পড়িল। সে ছায়া ক্রমশঃ ঘন হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল না; তারা সকল মিটু মিটু করিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস বন্ধ হওয়ায়, ভয়ানক গরম হইল। পূর্ব্বদিকে একখানা বৈশাখী মেঘে খুব কাল হইয়া আকা-

প্রথমপরিচ্ছেদ।

পাখীর ছানা বায়ুবেগে ছুটাছুটি করিতে করিতে পবনের ভীষণ ধাক্কায় তৃণাদিগকে সঙ্গে ছিঁড়িয়া লইয়া নক্ষত্রবেগে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। পবনের বিক্রমে পৃথিবী যায় যায় হইয়াছে। পৃথিবী শব্দময়ী ও আঁধারময়ী হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে।

ঝড় কমিল; বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই ঝড় বৃষ্টির সময় কৃষ্ণপুরের রাজবাটীতে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। বাহিরের লোক কেহ শুনিতে পাইল না। ঝড় বৃষ্টির শব্দে সে ধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। রাজা নাই; রাণী আছেন। রাণীর একমাত্র কন্যা আকাশ-গঙ্গা আড়াই বৎসরের কচি মেয়ে এদুর্য্যোগে কোথায়? রাণীর ভগিনী পুত্র, ভগিনী কন্যা, প্রভৃতি তের চৌদ্দটী ছোট কচি ছেলে সবই মার কোলে আছে; কিন্তু রাণীর একমাত্র কন্যা আড়াই বৎসরের আকাশ-গঙ্গা কই?

রাণীর দশ বার জন দাসী, ভাগিনী, ভগিনী, খুড়ি, জেটাই, সে মহাদুর্যোগে আকাশ-গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া, বিপদ নিশ্চয় মনে করিয়া পাগলিনীবৎ ব্যাকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল। এঘর ওঘর, এতলা ওতলা, খুঁজিতে লাগিল। দাস দাসীদিগকে রাণী ভীম-রুক্ষস্বরে গালি দিতে লাগিল। দাস, দাসী, দ্বারবান, কর্ম্ম-চারী (যাহাদিগকে সে সময়ে নিকটে দেখিল) প্রভৃতিকে রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"একলক্ষ টাকা বক্সিস্ দিব আমার গঙ্গাকে খুঁজিয়া আন।" কিন্তু সে প্রলয়ে কে বাহিরে যাবে?

রাজবাটীর প্রধান দ্বারবান "ফত্তুসিং" এতক্ষণ জানিতে পারে নাই। সে অন্য একজন দ্বারবান কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাণীর নিকটে গেল। রাণী ফত্তুসিংহকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ফত্তুসিংহের গাঢ় রক্ত সাহসে নাচিয়া উঠিল। ফত্তু দাড়ির চুল

টানিতে টানিতে বলিল, "আমি! আমি গঙ্গার জন্ত মরিতে হয় মরিব—আমি চলিলাম।" ফন্তু তীরবেগে সে ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া গঙ্গার অন্বেষণে ছুটিল। ফন্তুর অসীম সাহস, অসীম বল।

ফন্তুসিংহ, আপনার কামরায় আসিয়া, লাঠি গামছা লইল, একটা ছোট কাপড় দৃঢ় করিয়া মালকোচা করিল। কামরায় চাবি দিল। বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল; তারপর "জয়কালী" বলিয়া লাঠি ঘাড়ে করিয়া ঝড় বৃষ্টিতে গা ভাসান দিল।

কিয়দ্দূর যাইয়াই প্রাণ যায় যায় হইল। নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল। দুর্গতি বুঝিয়া ফন্তুসিংহ সম্মুখের কালী মন্দিরের দ্বারে উঠিল। মহাশব্দে দ্বার খুলিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এদিকে রাণী হিরণ্য-প্রভার কন্যাশোক উথলিয়া উঠিতেছে। তিনি ভূমে পড়িয়া কাটা ছাগলের মত ছট্ ফট্ করিতেছেন। কন্যা-শোকে বুক ফাটিতেছে, মাথা জ্বলিতেছে, অস্তিত্ব চৈতন্য শূন্য হইতেছে।

কন্যার গোলাপের মত—কচি রূপ, আধ আধ কথা, কচি টুক্ টুকে হাত পা, রাঙা ঠোঁট, সে সব এ জল ঝড়ে এ প্রলয়ে কোথায়? রাণীর জীবনের সাধ সবই সে প্রলয়ে ভাসিয়া গিয়াছে! আকাশ-গঙ্গা কি আর আছে; সে এদুর্য্যোগে আকাশেই মিশিয়াছে! "তবে রাজার সঙ্গে আমায় সেও ফাঁকি দিল! ওমা! আকাশ-গঙ্গা! তোকে এ ঝড়ে জলে কোথায় হারালাম মা! তুই যে আমার একটু ঘা সইতে পারিসনা মা! একটু আঁচড় লাগলে তুই যে কেঁদে উঠিস! তুই কি আর এঝড়ে আছিস?" রাণী এই

পর্য্যন্ত কাঁদিয়া শোকভরে নিরস্ত হইলেন। ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীন হইয়া আসিলেন। খানিক পরে স্বপ্ন দেখিয়া ধড়মড় করিয়া আলু থালু বেশে স্নেহ-পাগলিনীরমত বলিতেছেন—"ওগো! তাই বুঝি গঙ্গা আমার এসেছে! জলে ঝড়ে ভিজে এসে মা! মা! বলে ডাকছে। ওগো! তোরা শীঘ্র এনেদে আমি ভাল ক'রে গা মুছিয়ে দি।

নিকটবর্ত্তিনী রমণীরা এদিক ওদিক ধাবিত হইয়া অনেক অন্বেষণ করিল—কই? কেউ কোথাও নাই। রাণী তথন আবার মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া গেলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল। বাটীর ভিতরে ঘোর হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মেদিনীকে ক্লান্ত করিয়া ঝড় বৃষ্টি অনেক কমিল। ঝড় থামিল; কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল মাত্র। ফত্তেসিং, মন্দির হইতে, বাহির হইয়া কালীমন্দিরের উচ্চ দাওয়া হইতে বিদ্যুতের আলোকে একবার চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইল। বিদ্যুতের আলোকে দেখিল মেটে ঘরের চাল কোথাও নাই, কোটাঘর অনেকগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে; রাস্তায় বড় বড় গাছ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করিয়াছে, মাটীতে কোথাও রাশি রাশি পাতা, কোথাও খড় এবং যে দিকে দেখে সেদিকে মরা পাখির দেহ ছড়াছড়ি। রাজবাটীর ক্রন্দন ভিন্ন মানুষের শব্দ কোথাও নাই।

দেখিতে দেখিতে আবার বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিল। ফত্তেসিং "আকাশ-গঙ্গা নিশ্চয় মরিয়াছে" ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মন্দিরের ভিতরে গিয়া ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ছেলেধরা।

রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণপুরের রাজবাটীতে কন্যা শোকের ঝড় ছুটিল। ঝড়ে পৃথিবীর দুর্দ্দশা যতদূর করিবার করিয়াছে। কৃষ্ণপুরের আশ্রয় প্রতিপালক যিনি ছিলেন তিনি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এইকালে হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তো আপনার কন্যাশোক বিস্মৃত হইয়া, জনপদের দুস্থ ব্যক্তিদের বিপদুদ্ধারের জন্য বিধিমত চেষ্টা পাইতেন। রাজা মরিলে অনেকে খুবই দুঃখ করিয়াছিলেন, খুবই কাঁদিয়াছিলেন কিন্তু সেই দয়াব্রত রাজার অভাব বিশেষ রূপে অনুভব করেন নাই। যেমন দন্তবিহীন ব্যক্তি শক্ত জিনিস চিবাইবার সময় দন্তের অভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকেন, আজ কৃষ্ণপুর ও নিকটবর্ত্তী জনপদের দরিদ্র, বিপন্ন, গৃহশূন্য ব্যক্তিরা রাজার অভাব বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। যাহাদের ঝড়ে সব একবারে গিয়াছে, আজ রাজা-মহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঘরের উপায় হইত—আজ তাহারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক হতভাগ্য ঝটিকা উপদ্রুত প্রকৃত ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে রাণীমার কাছে সাহায্য-প্রাপ্তির আশয়ে বৈটকখানার একপাশে ম্লান মূর্ত্তিতে বসিয়া রাজ-বাটীর ক্রন্দন কোলাহল শুনিয়া আপনার বিপদকে আরো ভয়ানক

ভাবিয়া ত্রাসিত হইতেছে। কোন কোন অপ্রকৃত ব্রাহ্মণ উপবীত গলায় পরিয়া রাজবাটীতে "ব্রাহ্মণকে দায় হ'তে উদ্ধার করুন" বলিয়া রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে বিরক্ত করিয়া ভর্ৎসিত হইতেছে।

এদিকে রাণীর কন্যাশোকে সকলেই আকুল। রাণীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় অতি ব্যস্তভাবে দ্বারবান ও ভৃত্যদিগকে এক এক স্থানে কন্যা খুঁজিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেছেন। পঞ্চাশখানা গ্রামের চৌকিদারকে তলব করিয়া, তাহাদিগকে নিজ নিজ গ্রামের সমস্ত কচি মেয়ে আনিয়া হাজির করিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন। প্রত্যেক চৌকিদারের সঙ্গে ৪জন বেহারা, একখানি পাল্কি ও একটী দাসী সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রত্যেক দাসীর সঙ্গে "আকাশ-গঙ্গার" একখানি করিয়া ফটোগ্রাফও দেওয়া হইয়াছে।

তিন চার ঘণ্টার মধ্যে এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, বাটীর লোকেরা বিশেষতঃ জননীগণ নিজ নিজ কচি মেয়েদের জন্য বড়ই ভাবিত হইল। সকল বাটীতেই ছেলে ধরার ভয় পড়িয়া গেল। অনেক জননী মেয়ে ধরার ভয়ে বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিল। কেহ বা মেয়ে ছেলের গহনা খুলিয়া তাহাকে বেটাছেলের মত কাপড় পরাইয়া রাখিল। ৮।৯ বৎসরের দুষ্ট বালিকারা ঠাকুরমার সঙ্গে স্নান করিতে যাইবার সময় বালক সাজিয়া ভয়ে ভয়ে বাহির হইল।

নিজ কৃষ্ণপুরে এক ব্রাহ্মণ বাটীতে বেলা ২টার সময় এক পাঁড়ে দ্বারবান আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিতেছে। বাটীর মেয়েরা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া আছে। দ্বারবানের কথায় কেহ উত্তর দেয় না। বাটীতে পুরুষ কেহ নাই। সে বাটীতে একটী ৪ বৎসরের বালিকা

আছে। সে তখন বাটীতে কি উপদ্রব করিতেছিল, দ্বারবানের আঘাত শুনিয়াই ভয়ে জড়সড় হইয়া মার কোলে লিপ্ত হইয়া থাকিল। মার বুক ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। সেই পল্লীর একজন বিজ্ঞ লোক আসিয়া দ্বার খুলিতে বলিলে, বাটীর বৃদ্ধা গৃহিণী দ্বার খুলিল। দ্বার খুলিয়াই বলিল—"আমাদের বাটীতে ছেলে টেলে নাই বাছা বরং দেখে যাও।" দ্বারবানের সঙ্গে একজনা দাসী ছিল, সে তখন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া জননী মেয়েটীকে তক্তপোষের নীচে একটা প্রকাণ্ড বালিসের সঙ্গে মাদুর ঢাকা দিয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছে। বালিকা ভয়ে ঘামিতেছে—কাঁপিতেছে। মা মেয়েটীকে লুকাইয়া ঘরের বাহিরে যাইবামাত্র মেয়েটী ভয়ে চীৎকার করিল। তখন দাসী "হাঁগা তবে নাকি তোমাদের ছেলে নাই।" তা অত ভয় কিসের? রাজবাটীতে পাল্কি ক'রে যাবে—সেখানে খাওয়া দাওয়া ক'রবে, একখানা পরবার কাপড় পাবে—তা ইচ্ছা ক'রলে মেয়ের মাও সঙ্গে যেতে পারে।" এই প্রকার অনেক কথা দাসী বলিতে লাগিল। মেয়ের মা বলিল "না বাছা! শুনছি নাকি রাণী কালীর কাছে নরবলী দিবেন—আপনার মেয়ে পাবার জন্য বড় মানুষ ব'লে কি এসব করা ভাল বাছা।" দাসী শুনিয়া অবাক হইল। বাস্তবিক একটা গুজব উঠিয়াছে "রাণী হারান মেয়ে পাবার জন্য কালীর কাছে বালিকা বলি দিবার মানস করিয়াছে।" এদিকে চৌকিনীচে মেয়েটা ভয়ে ঘামিতে ঘামিতে কাঁদিতেছে। তার চীৎকার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দাসীর ও সেই বিজ্ঞ লোকের নানা কথায় যখন গৃহিণী ও বধুর বিশ্বাস হইল যে নরবলীর কথা মিথ্যা, তখন বধূ ঘরের ভিতরে আসিয়া মেয়েকে বাহিরে আসিতে বলিল। মেয়েটী তাহাতে আরও ভীত হইয়া,

"নাগো আমি আর দুষ্টমি ক'র্‌বো নাগো।" বলিয়া কান্নার রোল বাড়াইল। মা তখন মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিল। মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। মেয়ের কান্না দেখিয়া দাসী ফিরিয়া গেল।

এদিকে ফক্কুসিং বড়রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল, একটী বুড়ি একটী সুন্দরী বালিকার হাত ধরিয়া কাঁকালে তুলার ঝাঁকা লইয়া যাইতেছে। বুড়ি রাস্তায় লোকের মুখে ছেলে ধরার কথা শুনিয়াছে। এখন রাস্তায় দ্বারবান দেখিয়া ভয় পাইল। দ্বারবান বুড়ির দিকেই আসিতেছে। বুড়ি তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে একটা বড় অশ্বথের আড়ালে নাতিনীকে লইয়া লুকাইল। খুকি! ঐ ছেলে ধরা আসছে—শীগ্‌গীর এই তুলোর ভিতর লুকো"—তাড়াতাড়ি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা বলিয়া বালিকাকে ঝাঁকার ভিতরে ভাল গোল পাকাইয়া বসাইয়া তাড়াতাড়ি তুলা গুলা চাপা দিল। এদিকে ফক্কুসিং, অশ্বথগাছের কাছে "কোন হ্যা" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িল। বুড়ি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঝাঁকা লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে না করিতে লাঠিঘাড়ে চাপদাড়ি ওয়ালা ভোজপুরে মূর্ত্তি যমমূর্ত্তির মত বুড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ি তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া "আমি বাবা [illegible] এদিকে এয়েছি, তোমার ভয়ে আসিনি বাবা!" বলিয়া ঝাঁকা পিছনে রাখিয়া পিছন দিক দিয়া দুই হাতে অতিস্নেহে ঝাঁকা ধরিয়া বসিল। ফক্কুসিং, বলিল—"আরে মাগি! ক্ষুদ্র মেয়েটী কোথা গেল?"

বু। আমার মেয়ে কি আর আছে—যমে নিয়েছে বাবা!

ফ। আরে শ্বশুরা। তেরা সাথ যে ছোটা মেয়ে—সে কোথা গেল?

বু। নানা বাবা! কই ছোটা মেয়ে কই বাবা! আমি একলা বাবা!

ফক্ক বুড়ির কথা শুনিতে শুনিতে ঝাঁকার উপর নজর দিয়া বলিল, আয়ি বুড্‌ঢি! ঝাঁকামে নড়ে কে?

"না বাবা! মাইরি কেউনা বাবা!" বুড়ি আপনার প্রাণ ঠোঁটে ধরিয়া নবমী পুজার পাঁটার মত কাঁপিতে কাঁপিতে এইকথা বলিয়া ঝাঁকার দিকে ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তার প্রাণ ঠোঁট ছাড়িয়া আকাশে উড়িবার মত হইল। বুড়ি বাস্তবিকই ঝাঁকা নড়িতেছে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বলিল "ও বা! কাতলা মাছ—জন্ত—তাই চিলের ভয়ে তুলো চাপা দিয়ে রেখেছি।" ফক্কসিং সেই ঝাঁকার তলা দিয়া জল ঝরিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "আরে শশুরা! মছলি কি মোতে? এই কথা বলিতে বলিতে অতিশীঘ্র ফক্ক তুলা তুলিয়া দেখিল, একটী বৎসর তিনেকের রাঙা মেয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মুতিয়া ফেলিয়াছে। ফক্ক তখন হাসিতে হাসিতে ছোট্ট মেয়েটাকে ঝাঁকা হইতে বাহিরে আনিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিল,—"আরে পাঁটি! তেরা ভয় ক্যা—কা লাবু?"

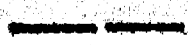
ফক্ক এই প্রকারে হিন্দিতে বাঙ্গালাতে মিশাইয়া—একটা হাস্যোদ্দীপক ভাষায় উহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে উহাদিগকে লইয়া রাজবাটীতে গেল।

সহজে লোকে মেয়ে আনিতে চাহে না—এই কথা শুনিয়া রাণী এই সংবাদ প্রচার করিলেন—"চার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মেয়ের মা বা অভিভাবিকা মেয়েসঙ্গে পাল্কি করিয়া আমার কাছে আসিবে, আমি মেয়েকে একটী করিয়া সোনার মোহর দেব। আর আমার

মেয়েকে যে দিতে পারিবে তাহাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিব।'
এই সংবাদ শুনিয়া শত শত গ্রাম হইতে শত শত মেয়ে, মা, দিদি বা ঠাকুরমার সহিত রাণীর পাল্কি চড়িয়া হাঁটিয়া বা কোলে পিটে চড়িয়া রাজবাটীতে আসিতে লাগিল। একবৎসর হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের কত রকমের মেয়ে রাণীমার কাছে গিয়া হাজির হইতেছে। কাল, ধাঁদা, হাঁদা কত রকমের মেয়ে। অলকা, তিলকা, স্বর্ণ, লাবণ্য, হেমন্ত, বসন্ত, কুমুদিনী, নলিনী, নিস্তারিণী, অবলা, সরলা, চপলা, চঞ্চলা, গরবিনী, মাতঙ্গিনী, সৌদামিনী, প্রভৃতি শতশত কতরকমের রোগা, মোটা, কত মেয়ে রাজপুরি পূর্ণ করিল। কত লম্বাচুলো মেয়েমুখো ছেলে, মেয়ে সাজিয়া একটী মোহরের জন্য মার সঙ্গে দিদির সঙ্গে পাল্কি করিয়া বা চড়িয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইল।

প্রথম দিনে রাজবাটীর অন্দরের বড় ঘরে প্রায় দুইশত বালিকাকে দেখিয়া দেখিয়া রাণীমা একটী করিয়া মোহর হাতে দিয়া বিদায় করিলেন।

দ্বিতীয় দিনে প্রায় চারশত বালিকা, তৃতীয় দিনে পাঁচশত। এইরূপে একমাসে প্রায় পাঁচ হাজার বালিকা বিদায় হইল ;—কিন্তু আকাশ-গঙ্গার কোন সন্ধান হইল না। তখন রাণী কন্যার মৃত্যু নিশ্চয় ভাবিয়া শোক-সাগরে ঝাঁপ দিলেন।





দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

——জেলায় দুর্গানগর একটী প্রকাণ্ড প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে এক প্রসিদ্ধ রাজা আছেন। নাম যশোদানন্দন। একটী পুত্র, নাম জ্ঞানদানন্দন।

প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। উদ্যানে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া থাকে। কোন স্থানে কেবল বেলের ঝাড়। বর্ষায় যখন ফুল ফোটে, তখন শ্বেতবর্ণের পুষ্পের অপূর্ব্ব গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। কোন স্থানে কেবল গোলাপের ঝাড়; বড় বড় গোলাপ—বসরাই, সারওয়াণ্টারস্কট প্রভৃতি কত প্রকারের ফুল যখন ফোটে, তখন বোধ হয় যেন আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের জ্যোতিঃ মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, কিছুদিন পরে গোলাপের সৌন্দর্য্য হইয়া প্রকাশ পায়। কোনস্থলে কেবল জুঁই ফুলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড়—পাতার কোলে কোলে ফুলের শোভা দেখিলে প্রাণ শোভার গন্ধে যেন গন্ধময় হইয়া উঠে। কোন স্থলে চামেলি —লতার মত ডাসে শ্বেতবর্ণের শীতল গন্ধে বায়ু পূর্ণ করিয়া, আপনার মনে আপনি দুলিতেছে—দু একটী ভ্রমরের মনোরঞ্জন

করিতেছে। কোথায় জবার লোহিতবর্ণ বৃক্ষকে এয়োস্ত্রীর শোভায় শোভিত করিয়াছে। কোথায় লাল করবি রাশি রাশি ফুটিয়া যেন বৃক্ষে আনন্দের তুফান তুলিয়াছে; করবির ডালে ডালে প্রজাপতির ডিম্ বড় বড় মুক্তার মত ঝুলিতেছে।

পশ্চাতের উদ্যানের দ্বারদেশের দুইপাশে সানবাধান দুটী বকুল গাছ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা বিস্তারে ঘন ঘন পাতায় ও রাশি রাশি ফুলে চারিদিক আমোদিত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই বকুলতলে রাজপুত্র জ্ঞানদানন্দন উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করেন।

একদিন অপরাহ্ণে, চৈত্রের হাওয়ায়, সেই সানবাধান বকুল-তলে একটী মসলন্দ মাদুরের উপর এক যুবামূর্ত্তি বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। যুবার দেহটী যেন লাবণ্যে গঠিত। মুখে, চখে, কপালে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ ফুটিতেছে। গুল্ফ ও শ্মশ্রু ভেদিয়া গাম্ভীর্য্য বাহির হইতেছে। বিস্তৃত কপালে চিন্তার আসন চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সেই আসনে বসিয়া চিন্তা-দেবী ভাবিতেছেন:—

"অনুভূতির ঘনীভূত মূর্ত্তি—রহস্যময় এই জগৎ কোথা হইতে আসিল? এই অনুভবের আদি কি? অন্তই বা কি? এই গূঢ় সূক্ষ্ম সূত্র কে ধরিতে পারিয়াছে? ধরা যায় না যদি তো মানুষের মন তাহা ধরিবার জন্য এত পাগল হয় কেন? এই সূত্র ধরিবার বাসনায় মানুষের আর সব বাসনা অন্তর্হিত হয় যখন, তখন এ বাসনা অমূলক নহে। এই বাসনা মানুষের মধ্যে যত জ্বলিয়াছে, জাতীয় জীবনে যত ফুটিয়াছে, মানুষও জাতি ততই উন্নতিলাভ করিয়াছে। এ বাসনা-বর্জ্জিত মানুষই অসভ্য—

মুর্খ। এই বাসনার স্রোতে সভ্যতার স্রোত—জ্ঞানের স্রোত। এই বাসনা কি তৃপ্ত হবে না? মানুষের এই প্রকার অনুভূতির একদিকে সু, অন্যদিকে কু; একদিকে শিব, অন্যদিকে অশিব। একদিকে প্রচণ্ড, অন্যদিকে কোমল শান্তভাব। একদিকে নরকঙ্কাল বিক্ষিপ্ত শ্মশান অন্যদিকে আনন্দ বর্দ্ধিত উৎসবক্ষেত্র। আবার এই দুই একসূত্রে আবদ্ধ—এক বস্তুই দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। সেই এক বস্তু ধরিতে কি পারা যায় না? যাহা হইতে কুও আসে সুও আসে তাহাই যদি প্রকৃত জ্ঞান—সে জ্ঞান পাইলাম কই? সেই জ্ঞান পাইবার জন্য কত ভাষা শিখিলাম, কত শাস্ত্র, কাব্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলাম, যত পড়িলাম, যত দেখিলাম ততই সেই বাসনাকে প্রবল করিল। বাসনার একবিন্দু শান্তিতো হইল না। সাংখ্য, কনাদ, বেদান্ত, পাতঞ্জল, গীতা, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি শত শত সহস্র সহস্র পুস্তক এই জীবনে পড়িলাম কিন্তু সকলেই আগুণে কাষ্ঠের মত পড়িয়া আগুণকেই প্রজ্জলিত করিল। এ আগুণের আঁচ যে পাইয়াছে, সে অন্য আগুণের জ্বালা হইতে নিস্তার পাইয়াছে। রূপবতী সুন্দরী সম্ভোগের বাসনা, ধনলাভের বাসনা, রাজ্যভোগের বাসনা, সব আমার দূর হইয়াছে—এই বাসনা যেদিন মা সরস্বতীর কৃপায় হৃদয়ে জ্বলিয়াছে। কিন্তু সে তাপ—সে পোড়ন অপেক্ষা এ জ্বলুনি অনেক ভাল। শুকরের ক্ষুধা বিষ্ঠা ভোজন করে; আর মানুষের ক্ষুধা দধি দুগ্ধ ক্ষীর ভোজন করে। এ দুইয়ে বিষয় বাসনা ও জ্ঞান বাসনা এ দুইয়ে কতকটা তাই প্রভেদ। আগে বিষয় বাসনা, সুন্দরী বাসনা আসিয়া আমার জীবনকে দগ্ধ করিয়াছিল—সমস্ত অস্তিত্ব সে

আগুণে ঝিযের অলনের মত ধুধু করিয়া জলিয়াছিল কিন্তু সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞানবাসনা জলিয়া সে আগুণ নিবিয়াছে। কিন্তু আগুণের জলনে যদিও দেহ ক্ষয় হয় না, শরীর ম্লান হয় না, পরমায়ু অল্প হয় না, কিন্তু ইহার জলুনিতে মন প্রাণ মস্তিষ্ক পুড়িয়া যায়। এই আগুণ কিসে নিবে? পৃথিবীর কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে কতবার বসিয়া কাঁদিয়াছি কিন্তু সে অশ্রুজলে এ আগুণ নিবিল কই? অন্ধকার রাত্রির গাম্ভীর্য্য সেবনে অন্ধকারমধ্যে কত কাঁদিয়াছি—কত প্রশ্ন করিয়াছি। আমার দেহ শান্ত নিশার কোমলস্পর্শে শান্ত হইয়াছে; চারিদিকের মৃত্তিকা, লতা, পাতা, ফল, ফুল শান্তিতে স্নান করিয়াছে, কিন্তু আমার এ জ্ঞানবহ্নি-প্রজ্জ্বলিত প্রাণ শীতল হইল কই? যখন পৃথিবী রজনীর কোমল কোলে শুইয়া আপনার জ্বালা যন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া গভীর আরামে কৃতার্থ হইয়াছে, তখন আমার জ্ঞানবহ্নি-তপ্তপ্রাণ নদীর তীরে, বনের ছায়ায়, আকাশের জ্যোৎস্নায়, সেই শান্তিবারির জন্য কত কাঁদিয়া চক্ষু হইতে শিশির-পাত করিয়াছে; কিন্তু বহ্নি তাহাতে নিবে নাই আরো জলিয়া উঠিয়াছে। আমি সোণা রূপাকে ধুলারমত জ্ঞান করি—রাজ্য-সুখকে কুকুরবিষ্ঠা অপেক্ষা অবজ্ঞা করি—এই পিপাসার কৃপায়। এ পিপাসার গুণ আছে, কিন্তু দোষ এই ইহা আমার চক্ষু হইতে নিদ্রাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে কর্ণ হইতে শব্দস্রোতের মাধুরিকে দূর করিয়াছে, চন্দ্র-সূর্য্য শোভিত জগতের শোভায় কালি ঢালিয়াছে। আমার বাসনা তবে চায় কি?

কতবার আকাশের জ্যোৎস্নারাশিকে, পৃথিবীর কুসুমদলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি আমার প্রাণ চায় কি? হে শব্দবহ আকাশ!

তুমি আদি-মধ্য অন্তহীন তোমাকে মনে ধরিতে পারিলে কি আমার জ্ঞান বাসনার তৃপ্তি হইবে? হে কলনাদিনী তটিনি! তুমি আপনার ভাবে গম্ভীর হইয়া জ্যোৎস্নায় যে গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়াছ ঐ গানের ভাব বুঝিতে পারিলে কি আমার জ্ঞান বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে। ওহে! আমি বেদান্তের ভাষ্য বুঝিয়াছি; ক্যান্টের সমালোচনার ভুল ধরিয়াছি; সেক্সপীরের ভাব-নৈপুণ্যে প্রবেশ করিয়াছি কিন্তু তটিনি! তোমার কল কল ধ্বনির মর্ম্ম তো বুঝিতে পারিলাম না। হে আকাশের চাঁদ তুমি অত সুন্দর! তোমায়তো প্রত্যহই দেখিতেছি কিন্তু, যাহা হইতে তুমি অত সুন্দর হইয়াছ তাহা কি দেখা যায় না? হয়তো সেই সামগ্রী পাইলে আমার এ বাসনার শান্তি হইবে—অথবা আবার নূতন বাসনার সৃষ্টি করিয়া আমাকে আরো অধিক পাগল করিবে—তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমি যৌবনের প্রথম সময়ে সুন্দরীর বাসনায় জ্বলিয়াছিলাম, সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞান বাসনার জ্বালায় সে জ্বালা এড়াইয়াছি। আবার কি এই প্রকার বাসনা হইতে নিস্তার পাইয়া কোন প্রকাণ্ডতর বাসনায় পতিত হইব। বাসনায় এই সংসার বাঁচিয়া রহিয়াছে। বাসনা না থাকিলে সংসার কোথায় থাকিত? প্রাণী-জগতের সমস্ত ব্যাপার যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার সমষ্টি তখন এই প্রকাণ্ড জগৎ কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসনার সমষ্টি? এই জগতের মূলে কি এই বাসনাগ্নি এই আগুন হইতেই কি জগতের উৎপত্তি? তবে সে বাসনা সমুদ্র—বাসনাকাশ কত বড়—তার তেজ, তার প্রভাব, তার হুঙ্কার, কত ভীষণ! সবই তবে আগুন! সবই বাসনার বহ্নি বাপরে! প্রাণ যে জ্বলিয়া যায়—মস্তিষ্ক পুড়িয়া ছারখার হয়-

আগুণে বিষের জ্বলনের মত ধূধূ করিয়া জ্বলিয়াছিল কিন্তু সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞানবাসনা জ্বলিয়া সে আগুণ নিবিয়াছে। কিন্তু আগুণের জ্বলনে যদিও দেহ ক্ষয় হয় না, শরীর ম্লান হয় না, পরমায়ু অল্প হয় না, কিন্তু ইহার জ্বলুনিতে মন প্রাণ মস্তিষ্ক পুড়িয়া যায়। এই আগুণ কিসে নিবে? পৃথিবীর কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে কতবার বসিয়া কাঁদিয়াছি কিন্তু সে অশ্রুজলে এ আগুণ নিবিল কই? অন্ধকার রাত্রির গাম্ভীর্য্য সেবনে অন্ধকারমধ্যে কত কাঁদিয়াছি—কত প্রশ্ন করিয়াছি। আমার দেহ শান্ত নিশার কোমলস্পর্শে শান্ত হইয়াছে; চারিদিকের মৃত্তিকা, লতা, পাতা, ফল, ফুল শান্তিতে স্নান করিয়াছে, কিন্তু আমার এ জ্ঞানবহ্নি-প্রজ্জ্বলিত প্রাণ শীতল হইল কই? যখন পৃথিবী রজনীর কোমল কোলে শুইয়া আপনার জ্বালা যন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া গভীর আরামে কৃতার্থ হইয়াছে, তখন আমার জ্ঞানবহ্নি-তপ্তপ্রাণ নদীর তীরে, বনের ছায়ায়, আকাশের জ্যোৎস্নায়, সেই শান্তিবারির জন্য কত কাঁদিয়া চক্ষু হইতে শিশির-পাত করিয়াছে; কিন্তু বহ্নি তাহাতে নিবে নাই আরো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমি সোণা রূপাকে ধুলারমত জ্ঞান করি—রাজ্য-সুখকে কুকুরবিষ্ঠা অপেক্ষা অবজ্ঞা করি—এই পিপাসার কৃপায়। এ পিপাসার গুণ আছে, কিন্তু দোষ এই ইহা আমার চক্ষু হইতে নিদ্রাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে কর্ণ হইতে শব্দস্রোতের মাধুরিকে দূর করিয়াছে, চন্দ্র-সূর্য্য শোভিত জগতের শোভায় কালি ঢালিয়াছে। আমার বাসনা তবে চায় কি?

কতবার আকাশের জ্যোৎস্নারাশিকে, পৃথিবীর কুসুমদলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি আমার প্রাণ চায় কি? হে শব্দবহ আকাশ!

তুমি আদি-মধ্য অন্তহীন তোমাকে মনে ধরিতে পারিলে কি আমার জ্ঞান বাসনার তৃপ্তি হইবে? হে কলনাদিনী তটিনি! তুমি আপনার ভাবে গম্ভীর হইয়া জ্যোৎস্নায় যে গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়াছ ঐ গানের ভাব বুঝিতে পারিলে কি আমার জ্ঞান বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে। ওহে! আমি বেদান্তের ভাষ্য বুঝিয়াছি; ক্যাণ্টের সমালোচনায় ভুল ধরিয়াছি; সেক্সপীয়রের ভাব-নৈপুণ্যে প্রবেশ করিয়াছি কিন্তু তটিনি! তোমার কল কল ধ্বনির মর্ম্ম তো বুঝিতে পারিলাম না। হে আকাশের চাঁদ! তুমি অত সুন্দর! তোমায়তো প্রত্যহই দেখিতেছি কিন্তু কি হইতে তুমি অত সুন্দর হইয়াছ তাহা কি দেখা যায় না? হয়ত সেই সামগ্রী পাইলে আমার এ বাসনার শান্তি হইবে—অথবা আবার নূতন বাসনার সৃষ্টি করিয়া আমাকে আরো অধিক পাগল করিবে—তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমি যৌবনের প্রথম সময়ে সুন্দরীর বাসনায় জ্বলিয়াছিলাম, সরস্বতীর কৃপায় জ্ঞান বাসনার জ্বালায় সে জ্বালা এড়াইয়াছি। আবার কি এই প্রকার বাসনা হইতে নিস্তার পাইয়া কোন প্রকাণ্ডতর বাসনায় পতিত হইব। বাসনায় এই সংসার বাঁচিয়া রহিয়াছে। বাসনা না থাকিলে সংসার কোথায় থাকিত? প্রাণী-জগতের সমস্ত ব্যাপার যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার সমষ্টি তখন এই প্রকাণ্ড জগৎ কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাসনার সমষ্টি? এই জগতের মূলে কি এই বাসনাগ্নি? এই আগুণ হইতেই কি জগতের উৎপত্তি? তবে সে বাসনা সমুদ্র—বাসনাকাশ কত বড়—তার তেজ, তার প্রভাব, তার হুঙ্কার, কত ভীষণ! সবই তবে আগুণ! সবই বাসনার বহ্নি! বাপরে! প্রাণ যে জ্বলিয়া যায়—মস্তিষ্ক পুড়িয়া ছারখার হয়-

কি উত্তাপ! কি জ্বালা! তখন জ্ঞানদানন্দন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখেন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—রাত্রি গাঢ় হইয়াছে—প্রকৃতি শান্তভাবে চারিদিকে শান্তিদান করিতেছে—তাঁর মাথার উপরে গাছ হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। জ্ঞানদগ্ধ যুবা, প্রকৃতির সেই ভাব দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন "পৃথিবীকে শান্ত করিবার বিধান দেখিতেছি—আমার এই দগ্ধ প্রাণকে শান্ত করিবার বিধান কি নাই? হে চন্দ্রমা-কর-বিধোত স্নিগ্ধ রজনি! আমার প্রাণকে তুমি স্নিগ্ধ করিতে পার না; কিন্তু দেহকে স্নিগ্ধ করিতেছ; ইহাতে বোধ হইতেছে আমার জ্ঞানদগ্ধ প্রাণকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য তোমার মত অন্য প্রকারের কোন রজনী জননী আছেন। তুমি জড়ের জ্বালা দূর করিতে পার আর তিনি আত্মার জ্বালা দূর করিতে পারেন। আহা! জড়তাপ হারিণী রজনী মাতার যদি এত সৌন্দর্য্যবিভব হয় তবে না জানি সেই আত্মতাপ-হারিণী রজনী মাতার কতই সৌন্দর্য্য বিভব! যদি কাহারও জীবনে সেই রজনী উদয় হইয়া থাকে তো তিনি ধন্য! তাঁর শান্তিতে জগতের শান্তি হউক!"

রাজপুত্র যেখানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সে স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন। প্রাসাদের পিছনে কাহারও যাইবার হুকুম ছিল না। রাজকুমার ভাবিতে ভাবিতে বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। চৈত্রের রাত্রে অল্প অল্প শীত থাকিলেও রাজকুমার তাহাতে কোন কষ্ট পাইতেছেন না, বিশেষতঃ মনে যখন বৈরাগ্যের তেজ উঠে তখন দেহে শীত গ্রীষ্ম সবই সহ্য হয়। বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, ফুর ফুর বাতাস বহিতেছে; তাহা একটু শীতল হইলেও রাজকুমারের চিন্তাতপ্ত দেহে আরাম

দিতেছে। গাছের দুই এক ফোটা শিশির বিন্দু মাথায়, কপালে
চক্ষের উপরে পড়িয়া একটু একটু আরাম দিতেছে।—এইরূ
সামান্য শিশিরে, সামান্য শীতে বকুলতলে, বালিসে মাথা দিয়
শুইয়া আবার ভাবিতেছেন।—জ্যোৎস্না চারিদিকে হাসিতেছে-
বকুলের পল্লবের ফাঁক দিয়া একটী চন্দ্ররশ্মি রাজপুত্রের লাবণ্যম
কপালে পড়িয়া বায়ুভরে ঈষৎ নড়িতেছে, যেন কপালে মাণি
জ্বলিতেছে। রাজকুমার আবার ভাবনার সাগরে ডুবিতে ডুবি
বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছেন। একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিল
চক্ষু মুদিত—ভিতরে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত। চক্ষের উপরে
হইতে একবিন্দু শিশির পড়িল—বড় শীতল—কি আরাম! আ
শিশির পড়িল তাহাও শীতল। আবার একবিন্দু পড়িল—উষ
আবার ঘন ঘন পড়িল—উত্তপ্ত! উত্তপ্ত!

রাজকুমার চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন! একি? ত
মুখের উপরে একখানি চাঁদপানা মুখ—সেই চাঁদমুখ কাঁদিতেছে!

• • •

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভোয়া সুখ।

বৈশাখ মাস। দ্বিপ্রহর। আকাশ স্তরে স্তরে উত্তপ্ত। প্রবাহ থাকায় মানুষের গায়ে রৌদ্র আগুণের হল্কার মত মাঝে ঝ লাগিতেছে।

পৃথিবী উত্তপ্ত রৌদ্রে। রাজবাটীতে দ্বিতলে রাজা যশোদা-ন উত্তপ্ত পুত্রের সংসার পরিত্যাগ চিন্তায়; ত্রিতলে রাজপুত্র প্ত সংসারের অসারতা চিন্তায়; প্রথম তলে রাণী স্বর্ণসুন্দরী প্ত পুত্রের অশান্তি ব্যথায়; এবং পার্শ্বে ইষ্টকময় ভবনে র্বোপরি বনলতা উত্তপ্ত প্রেমাগুণে।

দ্বিপ্রহরে রাজবাটী নীরব। বাহির বাটীতে দ্বারবানেরা প্রস্তুত করিতে করিতে গান গাহিতেছে। অন্দরে দ্বিতলে ার কক্ষে প্রবেশ করিলে পাঠক পাঠিকা দেখিতে পাইবেন, টী কেমন সুন্দর। দেয়ালের গায়ে বড় বড় ছবি। কোন র মূর্ত্তি হাসিতেছে; কোন ছবির মূর্ত্তি কাঁদিতেছে; কোন ান ছবিতে মল্লযুদ্ধ হইতেছে; কোন ছবিতে নায়িকা নায়কের ক পড়িতে উদ্যত—দিন মাস বৎসর যাইতেছে অথচ বুকে দন আর হইতেছে না। স্বচ্ছ মেজেতে রৌপ্যালঙ্কৃত খাট। টের উপরে মখমলের গদিতে বসিয়া রাজা কি ভাবিতেছেন। খে দাসী রূপার কলিকায় তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতেছে।

এমন সময়ে প্রকাণ্ড দেহ প্রকাণ্ড রূপ লইয়া হেলিতে দুলিতে রাণী স্বর্ণসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিন্তা-নিপীড়িত চক্ষু উন্মিলিত করিয়া রাজা সম্মুখে রাণীকে দেখিয়া বলিলেন, "জ্ঞানদা কই? এখনও যে এল না!

রাণী বলিলেন "আমি মনে করি এসেছে, ওই যে আসছে; আয় বাবা আয়!"

জ্ঞানদা গিয়া খাটের উপরে একপাশে খাটের একটী স্তম্ভে ঠেশ দিয়া বসিলেন। রাণী মেজের উপরে মসৃণ মার্বেল পাথরে উপবেশন করিলেন। রাজা পুত্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া কহিলেন, "বিবাহ তোমায় করিতেই হবে; কাল পত্র ক'রে আসবো, এখন তোমার মুখে একটা ঠিক কথা শুনতে চাই। আর যদি বিবাহ না কর, তো, আমি কালই কাশী যাব।

রাণী কাতরস্বরে বলিলেন "আমি কোথাও যাব না, বি[ষ] খাব।"

রাজপুত্র কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনার কথা ক[বে] শুনি নাই; আপনি আগুণে প্রবেশ করিতে বলেন, জলে ডুব[তে] বলেন সব করতে প্রস্তুত। একটী স্ত্রীলোকের ইহকাল পরকা[ল] কি প্রকারে নষ্ট করবো বলুন। বিবাহ আমার বিষতুল্য বো[ধ] হয়। কেন আর আমায় বৃথা অনুরোধ করেন? আমায় ক্ষম[া] করুন।

রাণী কাতরভাবে বলিলেন "জ্ঞানদা! তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধ'রেছি, আমার কথাটা রাখবিনা? মাকে আর যাতনা দিসনি, তুই বিবাহ না করলে আমি বিষ খেয়ে মরবো, সেটা কি তোর পুণ্য হবে!"

জননীর কাতরোক্তি শ্রবণে জ্ঞানদা কাঁদিয়া বলিলেন "মা! বিবাহ ক'রে একটী স্ত্রীলোককে বধ ক'রলে আপনাদের কি সুখ হবে বলুন? আমাকে সুখী ক'রতে আপনাদের ইচ্ছা। আমার সুখের জন্য আপনারা কত কষ্ট সহ্য ক'রছেন। বিবাহে যদি আমার অসুখ, যাতনাই হয়, তবে, সে বিবাহ দিয়া আপনাদের অসুখ ভিন্ন সুখ হবে না। বিবাহের কয়েক দিন পরেই যখন পুত্রবধূকে পুত্রের অসুখের কারণ বলিয়া বুঝিবেন তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবেন "কাজ ভাল করি নাই।" তাহাতে আমার কষ্ট, আপনাদের কষ্ট, এবং সেই স্ত্রীলোকটীর কষ্ট। অতএব আমার বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। আমিতো এখনি নানা জ্বালায় অস্থির, আবার জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াবেন কেন?

রাজা একটু বিরক্তিতে কাতর হইয়া বলিলেন "তোমার কিসের এত জ্বালা? তোমার কিসের এত অভাব? রাজার ছেলে, চাকর, চাকরাণী, হাতী, ঘোঁড়া, পালকী, গাড়ি সবই আছে! পুস্তক ভালবাস,—প্রায় লক্ষ টাকার পুস্তক দিয়াছি! তবে অসুখটা কিসের? বিষয়কর্ম্ম দেখা,—তা তোমায় দেখতে হয় না, আমিই সব দেখি। জমিদারীর কোন তত্ত্বই রাখতে হয় না! অসুখের কারণ তো আকাশ পাতাল ভেবেও ঠিক ক'রতে পারি না।

রাজপুত্র মুখ নত করিয়া রাগে দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন "ঐ সবই আমার অসুখের কারণ। জমিদারিতে নায়েবের অত্যাচারের কথা যখন শুনি তখন উৎপীড়িত প্রজার জন্য আমার প্রাণ ফাটিতে থাকে। যখন বাটীতে আপনার আদেশে দ্বারবান প্রজার পৃষ্ঠে জুতা মারিতে থাকে, তখন মনে হয় প্রজা হইয়া সেই

জুতার আঘাত নিজ পৃষ্ঠে সহ্য করি। কর্ম্মচারীরা প্রজাদের উপর কত অত্যাচার করে, আপনি জানিয়াও তাহা নিবারণ করেন না।"

রাণী রাজা মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন "ওসব বন্ধ ক'রে দাও না কেন ?"

রাজা একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তাই হবে, তাই হবে। প্রজাদের উপর যাতে অত্যাচার আর না হয় তার ব্যবস্থা তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করা যাবে। এই জন্য এত তোমার অসুখ! তা এতদিন বল নাই কেন ? হা অদৃষ্ট! আর কি কষ্ট বল ? রাজপুত্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "তা ব'লছি। তাতে কিন্তু মানুষের হাত নাই।

রাণী একটু আশ্বাসিত প্রাণে বলিলেন "তা শান্তি স্বস্ত্যয়ন ক'রলে হবে। কি তুই খুলে বল্‌না ?"

রাজপুত্র ধীরে ধীরে কাতর ভাষায় বলিতে লাগিলেন "জগতে দুঃখ যাতনা দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হয় নিজের অস্তিত্বটা ধ্বংস করিয়া ফেলি। প্রকৃত শান্তি কোথা ? এমন সুন্দর জগতে সৌন্দর্য্যও বৈচিত্র্যের উপযুক্ত শান্তি কোথা ? আমি রাজপুত্র হইয়া শান্তি পাইলাম কই ? অধ্যয়নে, জ্ঞানে শান্তি পাইলাম কই ? শান্তি তবে কি বাস্তবিক কোথাও নাই ? প্রাণে মহা বাসনা হ'য়েছে একবার জীবন আহুতি দিয়া প্রকৃত সুখ শান্তির অন্বেষণ করিব।

রাজা। তুমি ছেলেমানুষ; বুদ্ধিটুদ্ধি এখনও পাকে নাই; দুটো কাচ্চা বাচ্চা হ'লেই মন স্থির হবে। সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে যত ভাববে তত অসুখী হবে। ও সব না ভাবাতেই শান্তি। আমাদেরও এক সময়ে ওরকম ভাব হ'তো। আমরা

কি ক'রতাম—বৈটকখানায় গিয়ে তবলায় চাঁটি দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রতাম। আমার কিছু অসুখ দেখছ ?

রাণী। তা ওতো গান বাজনাও শিখেছে তবে অমন করে কেন ?

রাজপুত্র। আপনার যদি শান্তি সুখ আছে, তো, রাত্রে নিদ্রা হয় না কেন ? এক একদিন বিষয় চিন্তায় যে প্রকার ছট্‌ফট্ করেন, তা তো দেখেছি। আপনার অশান্তি দেখে আমার আরও অশান্তি বেড়েছে।

রাজা। তাহ'লেও ওরই ভিতরে একটু শান্তিসুখ ক'রে নিতে হবেরে বাবা! বে থা হ'লে মন স্থির হবে, তা হ'লেই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

রাজপুত্র। আপনি যা ব'লছেন সব আমারই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু বিবাহে গৃহস্থলোকের সুখশান্তি হ'তে পারে। অনেক গৃহস্থ মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রলোক স্ত্রীপুত্রাদিতে সুখ পায়। কিন্তু আমি যতদূর বুঝেছি তাতে বোধ হয়, ধনীর গৃহে স্ত্রীতে কি সন্তানে কোন সুখশান্তি পায় না।

রাজা। ওসব তোমার গরিব গ্রন্থকারদের কথা।

রাণী। ওমা! ও আবার কি কথা! জ্ঞান! তোর বই প'ড়ে প'ড়ে মাথা গরম হ'য়েছে!

রাণীর ঘুম পাইতেছিল। হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া অন্য ঘরে গেলেন। তখন রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন "আপনি যদি অনুমতি দেন, তো, সব খুলে বলি।"

রাজা। কোন চিন্তা নাই; সব খুলে বল; তুমি আমার উপযুক্ত জ্ঞানী ছেলে; তুমি এখন আমার বন্ধু।

রাজপুত্র। ধনীর ঘরে কোন সুখ স্বস্তি নাই কেন বলি শুনুন। ধনীদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এসব যেন বৈটকখানার চেয়ার, টেবিল, ছবি, হুকা প্রভৃতি সুখের সামগ্রীর মত। না রাখিলে চলে না— দুর্নাম হয়—দেখতে ভাল হয় না তাই। বাস্তবিক কয়জন ধনী স্ত্রীতে সুখী? স্ত্রীর স্নেহে যত্নে স্বামীর সুখ সম্ভব;—কিন্তু ধনীর স্ত্রী কি স্বামীকে সেবা করিতে জানে? না সেবা করিতে চায়? যার নিজের সেবার জন্য দশ বারজন দাসী;—একজন পা টেপে, একজন গা টেপে, একজন তেল মাথায়, একজন ঘর ঝাঁট দেয়, একজন কাপড় কাচে। এইরূপে যে নিজের দেহের জন্য এত লোকের অধীন, সে কি কখনও স্বামীর সেবা করিতে পারে? দরিদ্রের ঘরে ছেলেরা মার কাছে যে সেবা যত্ন পায় ধনীর ঘরে ছেলেরা তা আদতে পায় না। ধনীর ঘরে জননী কোকিলের মত কাকের বাসায় সন্তান প্রসব করেন। দাসী চাকরাণীরাই ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করে। বস্তুতঃ দাসী চাকরাণীরাই ধনী সন্তানের মাতা। পূর্ব্বকালে ধনীর ঘরের ব্যবস্থা কি প্রকার ছিল তা জানি না; কিন্তু এখন আমাদের দেশের ধনী সন্তানেরা দাসী সন্তান। দাসীদের নীচ সংসর্গে উহারা অসচ্চরিত্র হইবে তার আর আশ্চর্য্য কি? গরিবের ঘরে জননীরা যেমন গর্ভযাতনা পান, প্রসবের পরও তেমনি যাতনাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া সন্তান পালন করেন। তাঁরা কোলে পিঠে করিয়া পালন করেন, নিজে কোলে করেন, নিজে রেধে নিজে হাতে ক'রে খাওয়ান। নিজে হাতেধ'রে হাগান, মোতান। ছেলের অসুখে নিজেরই যেন অসুখ হয়। তখন মার রাত্রে ঘুম নাই, দিনে আহার নাই, দেবতার কাছে বুক চিরে রক্ত দেন। পশুদের মাও ছেলের

সঙ্গে কতক দিনের সম্পর্ক রাখেন, ধনীর মারা তাও রাখেন না। ইহাতে আর ছেলের মাতৃভক্তি হবে কি প্রকারে? ধনীর ঘরে শিশুরা মাকে যদিও রোজে দেখিতে, ছুঁতে পায়, বাপ কেমন তা জানে না। ধনীর ঘরে অনেক সন্তান বাপকে বিজয়ার প্রণামের দিন ছাড়া আর দেখিতে ছুঁতে পায় না। ধনীর ঘরে স্ত্রী একটা বিশেষ সুখের সামগ্রী। সমস্ত আসবাবের মধ্যে ও একটী বড় আসবাব বটে। দরিদ্র লোকের ব্যারাম হ'লে স্ত্রী গায়ে হাত বুলায়, বাতাস করে, প্রাণ দিয়ে যত্ন করে; স্বামীর জন্য দেবতার কাছে মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়। কিন্তু ধনীর ব্যারাম পীড়া হ'লে স্ত্রীর সেবা কি পায়? স্ত্রীর পরিবর্ত্তে কাল, ভোঁদা, হাঁদা, মূর্খ, ইতর চাকরগুলা শক্ত, মোটা, খস্‌খসে, তামাকগন্ধে ভরা, হাত দিয়া বেতনের জন্য সেবা করে। তখন দরিদ্রের ঘরের স্ত্রীদের সুন্দর, কোমল, স্নেহভরা হাতের সেবার কথা ভাবিলে মনে হয় পৃথিবীতে দরিদ্ররাই সুখী আর ধনীরাই অসুখী। ভগবান্ যেন ধনীদিগকে ভোয়া সুখের প্রলোভনে ঠকাইয়াছেন। স্ত্রীর রান্না ভাত খাওয়া দূরে থাকুক, স্ত্রী হাতেক'রে কোন জিনিস দিলেও খেতে সন্দেহ হয়। কি জানি উপপতির পরামর্শেই যদি বা বিষই খাওয়ায়। আবার যাঁর একাধিক স্ত্রী তাঁর সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। ধনীর মাতা প্রকৃত কিন্তু অনেক ধনীর পিতা অপ্রকৃত। নরক আর অন্যস্থলে খুঁজিতে হয় না। প্রকাণ্ড স্বর্ণ কটাহে বিষ্ঠা থাকিলে যেমন হয়, ধনীর জীবনও সেইরূপ। পুত্র সাবালক হ'লে পিতার ভয়। এজন্য অনেক ধনী সাবালক পুত্রের সঙ্গে বাস বা ভোজন করেন না। কারণ পুত্র কর্ত্তৃক পিতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা। আর বলিতে পারি না; রক্তে যেন বিষ জ্বলিতেছে। ধনী

হইয়া যদি দরিদ্র হইতাম, তো, বাঁচিতাম। তাহাই হইব। বিষয়ের সংশ্রব ছাড়িয়া, দরিদ্র হইয়া দেশে দেশে ফিরিব, সাধুর অন্বেষণ করিব। ছত্রিশ বৎসর ভোগে অধ্যয়নে সংসারে শান্তি তো পাইলাম না। বলিতে বলিতে রাজপুত্রের প্রাণে একটা সংসার বিরক্তির জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরঅনলে পুড়িতে পুড়িতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্নার অর্থ ভাব এ জগতের নহে; সে কান্নার সমুদ্র, পৃথিবীর সমুদ্র অপেক্ষা প্রকাণ্ড। তার পর পারেই যেন শান্তিনিকেতন। সে নিকেতনের প্রকৃত সংবাদ কে দেবে? সেখানে কে লইয়া যাবে? এই সমুদ্রের পার কি কেহ পাইয়াছে? রাজপুত্র সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এই সব ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া কাঁদিতে থাকিলেন। এই সময়ে রাজা মহাশয়ের ঘুম্ আসিতেছিল, ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে তাকিয়ায় মাথা রাখিলেন। তারপর চিত হইয়া শুইয়া নাসিকাধ্বনিতে ঘরের মাছি মশা প্রভৃতিকে ভয়ে কাঁপাইতে থাকিলেন। রাজপুত্র জীবনের অন্ধকারে যন্তনার জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজার ঘুম একটু ভাঙিল। ঘুমের আবেশে বলিলেন "বাবা! তুমি ছেলেমানুষ।" তারপর ঘুমের ঘোরটুকু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। রাণীও আলুথালুবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা পুত্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন "বাবা! তুমি ছেলেমানুষ! এখনও কিছু বুঝ নাই। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আছে তার আর সন্দেহ কি? তবু ওরই ভিতরে একটু সুখ স্বস্তি ক'রে নিতে হবে।

রাজপুত্র। জ্ঞানেই যখন শান্তি পেলাম না, তখন আর ওসবে শান্তি হবে না। বরং বিবাহ না ক'রে একটু ভাল আছি। বিবাহ ক'রলে আরও অশান্তি বাড়বে।

রাজা। না, না, আমার কথা শোন (অ)। বিবাহ হ'লে সব অশান্তি যাবে। আমার কথা শুনে চল সব গোলমাল কেটে যাবে।

রাণী। বাবা! কর্ত্তা যা বলেন তা শোন (অ)। তোমার পিসতুত ভাই কেমন দেখদেখি? লেখাপড়া সেও শিখেছে, জমিদারী তারও আছে; সে কি বাবা! বে করে নাই? তার কেমন সোণারচাঁদ ছেলেদুটী হ'য়েছে! আহা [illegible] থাক। তা তোর মন এমন হ'ল কেন? প'ড়ে প'ড়ে বাবা তোমা[illegible] মাথা খারাপ হয়েছে, ইটিইগুলো সব ফেলে দে বাবা!

রাজা। রাণী! ঠিক বলেছ, বড়মানুষের ছেলেদের মেয়াদো লেখাপড়া শেখা ভাল নয়। আমরা সামান্য লেখাপড়া শিখে গোল আছি। আমার ভাগনে যখন অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়লো, আমি তাকে কত ব'কেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি লেখাপড়ায় আমাদের ছেলেদের কি বিপদ। পাঁচটা বুদ্ধিমান লোকের কথায় ন বিগড়ে যায় আর কি! আর কথাটা কি জান, যে ব্যাটারা ই লিখেছে সে ব্যাটারা সবই গরিবের ছেলে তা গরিবের ছেলেদের উপদেশে গরিবের ছেলেদের উপকার হ'তে পারে, কারণ তারা গরিবের ছেলেদের ধাত বুঝে উপদেশ দেয়। এখন স উপদেশে যদি বড়মানুষের ছেলে ম'জেযায়, তো, তার সর্ব্বনাশ। আমার জ্ঞানর তাই হ'য়েছে। জ্ঞানদা! কথাগুলা যা বলছি, তা বুঝছ তো?

জ্ঞানদা। জ্ঞানেতো আমার তৃপ্তি হয় নাই। যদি জ্ঞানের তিরে বিবাহ না করতাম, তো, গরিবেরছেলে গ্রন্থকারদের দোষ

হ’তো। গ্রন্থকারেরা অনেকেই বিবাহ ক’রেছেন এবং বিবাহ ক’রতে উপদেশ দিয়েছেন।

রাজা। তাদের বই প’ড়ে প’ড়ে তাদের ধাত্ এসেছে। কোন ব্যাটা হয়তো লিখেছে, বিবাহে সুখ নাই। কারণ সে ব্যাটা বিবাহ ক’রে, অর্থাভাবে স্ত্রীকে ভাল কাপড় কি গহনা দিতে পারে নাই ; অর্থাভাবে স্ত্রীপুত্র পালনে যাতনা বোধ করেছে, সুতরাং আপনার জ্বালাটা কেতাবে লিখে, অন্যের বিবাহ বন্ধ করবার যোগাড় ক’রেছে। বাবা ! ওসব হতভাগাদের কথা শুন না। এখন আমাদের কথা রাখবে কিনা বল।

রাণী। ঐ লেখাপড়াতেই বাছাকে আমার খেয়েছে গো ! না বাপু ছেলেপিলেদের আর লেখাপড়া শিখান নয়।

রাজা। যা হ’ক। জ্ঞানদা ! আমার কথার উত্তর দাও ? বিবাহ ক’রবে কি না ?

রাণী। সম্বন্ধ ঠিক কর (অ)। ওর আবার মত লওয়া কি ?

• •

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রণয়-সঞ্চার।

দুর্গাপুরের রাজভবনের দক্ষিণদিকে একটী ইষ্টকময় বাটী আছে। বাটীর ভিতরে একটী ঘরে দুই প্রহরের রৌদ্রের সময়ে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইটী যুবতী কি কথোপকথন করিতেছে। একজনের বয়স বাইস বৎসর, থান কাপড় পরা, নাম কিরণ-শশী। অন্যজনের বয়স সতের, থান কাপড় পরা, নাম বন-লতা।

বনলতা কিরণশশীর ননদিনী। দুইজনে বড় ভাব। প্রাণের অতি গুপ্তস্থলে দুইজনের প্রণয়বন্ধনের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়। দুইজনে চুপে চুপে কথা কহিতেছে :—

কি। রাতদিন কি ভাবিস? আমায় বলনা—কোন ভয় নাই।

ব। কি ভাবি কিসে বুঝলি?

কি। ভাত খেতে খেতে ভাবিস, মাছ কুটতে কুটতে ভাবিস, শুতে শুতে ভাবিস, তোর মুখ দেখে চেহারা দেখে যে টের পাই। ওকি! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললি যে! কি ভাবিস বলনা? ছোট ঠাকুর-পোর খবর ভালতো? বাবা কদিন হ'ল গিয়েছেন, কোন অসুখ বিসুখ হয়নি তো? আমার মাথা খাস বল তুই রাতদিন কি ভাবিস?

ব। কোথা আবার কি ভাবি! কিছুই ভাবিনা। ছোট্দাদা ভাল আছেন, বাবাও ভাল আছেন, ভাববো আবার কি?

কি। তা বুঝেছি। অল্পবয়সে ভগবান তোর কপাল পুড়া-লেন! তা ভেবে আর কি ক'রবি বোন! হেসে খেলে জীবনটা দুজনে কাটিয়ে দি আয়। ছোট ঠাকুরপো আমার বেচে থাক; সোণার দত কলম হ'ক। আহা! ছোট ঠাকুরপোর মুখেরদিকেই আমরা চেয়ে আছি। ভগবানের মনে যে কি আছে তা জানি না। ছোট ঠাকুরপো আমায় "বউদিদি" ব'লতে পাগল হয়। সেবারে ছুটির সময় ছোট ঠাকুরপো একাদশীর দিনে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ ক্ষির! কাঁদছিস কেন বাবা!"

ছোট ঠাকুরপো কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে "মা বনলতা আমি বউ-দিদির আজ একাদশীর উপবাস, তাই ভেবে আমার মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। "তাই দাদার জন্য" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিরণশশী কাঁদিয়া ফেলিল—কথাগুলি গলায় বদ্ধ হইয়াগেল। মৃত স্বামীর দেবমূর্ত্তি স্মরণে চক্ষের জলের সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিল। বনলতাও চুপ করিয়া থাকিল। বনলতার মুখে গাম্ভীর্য্য ও কাতরতার বর্ণ প্রকাশ পাইল। একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বউ! আমায় খানিকটা আফিম্ দিতে পারিস খাই; আর যাতনা ভাল লাগে না, ম'লে বাঁচি।" কিরণশশী বনলতার গায়ে হাতটী বুলাতে বুলাতে বলিল "বালাই ওকথা ব'লতে আছে। অমন সোণারচাঁদ ভাই বেঁচে থাক, অমন দেবতার মত বাপ বেঁচে থাক, ভয় কি? মাতো আমাদের জ্বালায় জ্বালাতন, আবার আফিম্ খেয়ে কি সুখ বাড়াবি! একেতো কপাল পুড়িয়ে এদের হাড়মাস

জ্বালাতন ক'রছি, আবার আফিম্ খেয়ে জ্বালার উপর জ্বালা বাড়ালে আমাদের নরকেও যে স্থান জুটবে না।

ব। ভাই নরক কি সত্য সত্য আছে? সে কেমন? সেখানে কেমন কষ্ট?

কি। হা ভগবান! হাঁ ঠাকুরঝি! আমাদের নরকের কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? বৈধব্যের চেয়ে নরক কি আর আছে! এর চেয়ে বড় নরক আর নাই। বিধবা হওয়ার চেয়ে নরকে যাওয়া যে ভাল। ঠাকুরঝি! তোর দাদাকে যেদিন হারয়েছি, সেদিনথেকে যে নরকে ঝুপক'রে প'ড়েছি; মনে যখন হয়, তখন হাড় কখানা যে ধুধুক'রে জ্বলতে থাকে;—সেই মুখ—সেই এক একটা কথা—সেই হাত পা নাড়া—সে যে সব হাড়ে হাড়ে আঁকা র'য়েছে। ওলো আমাদের এ নরকের চেয়ে বড় নরক আর নাই।" এই অবধি বলিয়া কিরণশশী কাঁদিয়া ফেলিল। বনলতাও কাঁদিতে থাকিল।

কিয়ৎক্ষণপরে শোকের বেগ থামিলে, কিরণশশী আবার জিজ্ঞাসিল "তুই কি ভাবিস্ আমায় খুলে বল, আমি কাকেও ব'লবো না—মাইরি কাকেও ব'লবো না।

ব। কি আবার কথা—কাকেও বলবিনা!

কি। আমার সন্দেহ হ'য়েছে, বল ব'লছি!

ব। কি সন্দেহ! মরণ আর কি!

কি। অল্পবয়সে বিধবা হ'লে, যা সন্দেহ হয়।

মুখে আগুণ বলিয়া কিরণশশীর পৃষ্ঠে বনলতা দুম্দাম্ করিয়া কয়েকটা কিল্ মারিল।

কি। ও আবার কি? আমার কাছে খুলে বল। আমি রাজাদের বাড়িতে গিয়ে শুনে এসেছি।

শেষের কথাটা শুনিবামাত্র বনলতা চমকিত হইল, বুক গুর গুর করিল, মুখ শুকাইয়া আসিল।

কি। মুখ যে শুকিয়ে গেল লো! তবে বুঝি সব সত্য! কি—আমায় খুলে বল ব'লছি। নহিলে মাকে সব ব'লে দেব।

বনলতা তখন একটা ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়াগেল। আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল:—"জানতে তো লোকে পারবেই ভয় কিসের? আমি যা ক'রছি তা পাপ ব'লে তো মনে হয় না। আমার মনে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা নাই। কি মানুষে তা বুঝবে কেন? আমি নিজের জন্য কিছু করছি না তবে এই কথার রটনায় যদি তাঁর কষ্ট হয়, তাই ভয়। বউদিদিকে খুলে ব'লতে দোষই বা কি ভয়ই বা কি?" ভাবিতে ভাবিতে সে অন্ধকারে যেন আলো জ্বালিল; বনলতার চক্ষে জ্যোতি খেলিল; মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িল। বনলতা আবার ভাবিল "কি ব'লব? বলবার আছে কি? দুঃখের কথা ব'লে কি হবে? দুষ্কর্ম্মও নয় পুণ্যকর্ম্মও নয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্টে ফেলিবার ফাঁদ পেতেছি মাত্র, সে কথা ব'লে কি হবে। বউদিদি হয়তো রাজপুত্রকে ঘৃণা ক'রবে, ব'লবো, না লুকোবো?

কিরণশশী বনলতার গায়ে হাত দিয়া বলিল "আবার কি ভাবছিস? আর ডুবে জল খাসনি। সব খুলে বল ব'লছি।

বনলতা একটু মুখ নত করিয়া জিজ্ঞাসিল "তুই কি শুনেছিস শুনি?"

কি। আমি আই! [illegible] কাছে শুনলাম তুই নাকি রাজপুত্রকে পত্র লিখেছিস।"

থ। আর?

কি। আর শুনলাম রাজপুত্রের কাছে বকুলতলায় নাকি গেছিলি?

থ। এ সব শুনে তোর মনে কি বিশ্বাস হ'য়েছে?

কি। বিশ্বাস অবিশ্বাস চুলায় যাক, বিধবার নামে এ কলঙ্কের চেয়ে যে মরণ ভাল, গা যে সিউরে উঠছে! কি? কথাটা কি—খুলে বল?

বনলতা আবার ভাবিতে লাগিল:—"জানতে আর কারও বাকি থাক্‌বে না। আমার কলঙ্ককে ভয় করি না। তবে পিতা-[illegible] প্রাণ ভার হবে। ছোট্‌দাদা শুনলে কেটে ফেলবে! উকে কি খুলে ব'লবো? তা বলি না। ওতো প্রাণের বন্ধু। [illegible] ব্যথার ব্যথী হয়, তো, প্রাণের ব্যথা দূর ক'রবে। ও আমাকে [প্রা]ণের সহিত ভালবাসে, ওকে বলি। না না ব'লে ফলই বা [কি]? হয়তো রাজপুত্রকে ঘৃণা ক'রবে; আমার তা অসহ্য হবে। [ত]বে ব'লবো না। প্রাণ ব'লতে চায়—মনবুদ্ধি [illegible] করে। [আ]র দিন যাক, না—বলি। এতো আর খারাপ কথা নয়—[পা]পের কথা নয়। আমার জ্বালার কথা—যাহা হ'য়েছে সেই [ক]থা। সুখ কি দুঃখ জানি না; জ্বালা না আরাম বুঝি না; [রো]গ না অরোগ চিনি না; ভূতে পেয়েছে না দেবতায় পেয়েছে—[যা] হ'য়েছে বউকে খুলে বলি। ফুলগাছের শোভা দেখে মন [যা] হ'য়েছে,—ফুলতলায়, থাকতে ইচ্ছা হয়, গাছের ফুল ছুঁতে [ইচ্ছা] নাই, কেবল গাছতলায় দাঁড়িয়ে গাছের শোভা দেখিব;

যদি মরি কখনও, যেন ঐ ফুল তলায় মরি। ফুলের গন্ধে প্রাণ মন পূর্ণ হ'য়েছে।” ভাবিতে ভাবিতে বনলতার হৃদয়ে যেন ভাবের সমুদ্র উথলিতে থাকিল। ভাবের বেগ ধরিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ নত করিয়া থাকিল।

কিরণশশী বনলতার ধরণ দেখিয়া চমকিত ও স্তম্ভিত হইল। তার চিবুকে হাত দিয়া বলিল “ব্যাপারখানা কি লো? ভয়ে যে শরীর কাঁপে, দেহের রক্ত যে শুকোয়—খুলে বল, নইলে সর্বনাশ হবে দেখছি।”

বনলতা আবার ভাবিল “তা ব'লতে দোষ কি? যদি গোলাপ গাছে ফুল ফোটে তো ব'লতে দোষ কি? যদি আকাশে চাঁদ উঠে তো ব'লতে দোষ কি? মনে ফুলের সৌরভের মত, চাঁদের আলোর মত কি এসে আমাকে পাগল ক'রেছে। হয়তো সেই পীড়া হ'তে পারে। তা ব'লতে দোষ কি?”

তারপর মুখ নত করিয়া বনলতা ধীরে ধীরে বলিল “বউদি, আমি বোধ হয় দোষী!”

শুনিয়া বউ চমকিত হইয়া একদৃষ্টে বনলতাকে দেখিতে দেখিতে যেন তার আদি অন্ত পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বিস্মিত বচনে বলিল “বলিস কি? পেটের ভিতরে যে হাত পা সেধোয়! ও আবাগী! কি ব'লছিস? ভূতে পেয়েছে নাকি?

সে কথায় বনলতা কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তর দিল না। কীরণও কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে অন্তরজ্বালায় স্থির থাকিল। আবার অস্থির-ভাবে বনলতার আলুলায়িত কেশ আকর্ষণ করিয়া বলিল “ও পোড়ারমুখী! তোর কথা যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। এ যে স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে বাবা শুনলে যে বিষ খাবে! ঠাকুরপো যে

তোকে কেটে খান খান ক'রবে! মা যে গলায় দড়ি দেবে! ওসব তোর ঠাট্টা তামাসার কথা না কি? সব খুলে বল, আমার যে গা কাঁপছে!

বনলতা কাতরপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল। অধোমুখে মুদিত নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দুঃখের সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তার কান্নায় কাতর হইয়া তার মাথায় হাত দিয়া কিরণশশী বলিল "সত্য সত্য কি সর্ব্বনাশ ক'রেছিস? যৌবনেরভার কি এত অসহ্য হ'য়েছিল? তবে এখনও বেঁচে আছিস কেন? পয়সা দিচ্ছি আফিম্ কিনে খা। না হয় গলায় দড়ি দে, কি জলে ডুবে মর্। কুলে কালি ঢালিসনি। আর "বউদিদি" ব'লে ডাকিসনি। তোর কাছে থাকা আর ভাল দেখায় না। তোর কাছে থেকে,—তোর দাদাকে যেন নরকস্থ ক'রছি, এমনি বোধ হ'চ্ছে। তোর পাপে চৌদ্দপুরুষ বোধ হয় নরকস্থ হ'য়েছেন। আর না—তোর মুখ আর দেখতে যেন না হয়! যাই মাকে সব খুলে বলিগে।" এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া, কিরণশশী ধাবিত হইলে, বনলতা দ্রুত আসিয়া তার আঁচল ধরিয়া টানিল।

কিরণশশী ক্রুদ্ধদুঃখে বলিল "আর আঁচল ধ'রে টানা কেন? আমিতো তোমার নবযৌবনের আগুণ নিবাতে পারবো না।" বনলতা চক্ষু আরক্ত করিয়া—কিরণের দুই পা জড়াইয়া "বলিল আমার মাথা খাস আমার কথাগুলো শোন্, তারপর যা ইচ্ছা করিস। আমার এ বিপদে বন্ধুর কাজ কর।" বনলতার কাতরোক্তি শুনিয়া কিরণের দয়া হইল, আস্তে আস্তে ননদিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন ননদিনী ভাইজের দুটী হাত আপনার মাথার

উপরে রাখিয়া বলিল "বড় ভাজ মার মত, তুই আমার মাথায় হাত দিয়ে, দিব্য কর যে, আমার গুপ্তকথা কাকেও ব'লবিনা।" কিরণ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল "আচ্ছা এখন এসব কাকেও ব'লবো না, কিন্তু পাপের গন্ধ পেলে, এ বাড়ি ছেড়ে পালাব।"

ব। আমার রাজপুত্রের প্রতি কোন কুভাব নাই। চাঁদ দেখিবার মত দেখি মাত্র।

কি। সে চাঁদে তোর লোভ আছে কিনা?

ব। চাঁদকে যত্ন করিতে, চাঁদের কলঙ্ক মুছিতে, চাঁদের কথায় মরিতে লোভ আছে।

কি। যদি চাঁদ বলে আমি ওসব চাইনা, আমি যেমন তেমনি থাকি?

ব। কলঙ্কের সহিত ঝগড়া আছে—ও আমার চাঁদে থাকে কেন?

কি। তোর কাব্যকথা রাখ্। রাগে রক্তে আগুণ জ্ব'লছে—তোকে কেটে তোর রক্তে চাঁদের কলঙ্ক—কুলের কলঙ্ক ধুতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

ব। আমার মন কেমন ব'য়েগেছে, অনেক চেষ্টা যত্ন ক'রেও মনকে ফেরাতে পাচ্ছি না।

কি। কবে কি সূত্রে মন খারাপ হ'ল?

ব। বারাণ্ডায় একদিন দেখে।

কি। তারপর?

ব। দেখেই আর চোখ ফেরাতে—

বলিয়াই ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে জল আসিল, পাগলিনীর ত কিরণের মুখেরদিকে বিপন্নার মত চাহিয়া তার বুকে মুখ

গুজিয়া উত্তপ্ত অশ্রুজলে তার প্রাণকে কাতর করিল। কিরণ বনলতাকে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসিল।

কি। তোর মনের ভাবগুলি সব খুলে বল। উপায় ক'রতে পারি কি না দেখি।

ব। বউদিদি! মন চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতাম—সেখানে রাজপুত্রের একখানি মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আছে—তা কিছুতেই মুছতে পারছি না। যত মুছতে চেষ্টা করি, ভুলতে যত্ন করি, ততই যেন পৃথিবী আর্সির মত বোধ হয়। আকাশেরদিকে চেয়ে সে মূর্ত্তি ভুলতে যাই, আর আকাশ আর্সির মত তাঁর প্রতিবিম্ব আমার কাছে ধরে। অন্য শব্দ শুনে তাঁকে ভুলতে যাই, অমনি সেই শব্দে তাঁর গলার আওয়াজ শুনে আরও চমকিত হই। আমার হয়তো একটা কি ব্যাধি হ'ল।

কি। আর কি বাকি রেখেছিস! সর্ব্বনাশ আর কাকে বলে? জাতিকুল মজান আর কাকে বলে? তোর মনে এতও ছিল! আর শুনে কাজ নাই! কাকেও বলে কাজ নাই! আমি বাপের বাড়ি যাই—তুই যা ইচ্ছা কর্।

ব। বউদিদি! ঈশ্বরের দিব্য, মা বাপের দিব্য, আমি কিছু করি নাই, আমার কোন দোষ নাই। আমি রাজপুত্রকে আগে কখনও ভাবি নাই। আমার মন নির্ম্মল আকাশের মত ছিল। কোথাও কলঙ্ক ছিল না। হঠাৎ কে যেন আমাকে রাজপুত্রের কাছে বিক্রয় করিল। যেন তাঁর পায়ে ফেলিয়াদিল। তাঁর রূপে ডুবাইয়াদিল। তাঁর রূপে, চোখে, বাক্যে সুখের অনন্ত সমুদ্র দেখাইল। আমাকে কে ধরিয়া সেই সমুদ্রে ডুবাইয়াদিল।

আমার মনে প্রাণে যেন কে রাজপুত্রের রূপ জড়ায়ে দিয়াছে! আমার এ বিপদ কি সম্পদ তা জানি না।

কি। তুই ভুলতে চেষ্টা কর।

ব। কি দেখে ভুলবো?

কি। তোর স্বামীর মূর্ত্তি ভাব।

ব। সে ভাবা এখন পাপ, ব্যভিচার ব'লে বোধ হয়, পর-পুরুষ ভাবার মত বোধ হয়।

কি। হা ভগবান! আমাদের অদৃষ্টে এত কলঙ্কও ছিল। এ তোর কলঙ্ক নয়, যেন আমার নিজের কলঙ্ক নিজের পাপ বোধ হ'চ্ছে। আর কিছু ভাল লাগে না। আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

বিপ্লব।

সেইদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, বনলতা এক প্রকাণ্ড অন্তর বিপ্লবে অধীর হইল।—"বাস্তবিকই কি কুলের কলঙ্কিনী হইলাম? ভালবাসা কি পাপ? নিজের ইচ্ছায় ভালবাসি নাই—ইহা কি পাপ? আমার ভালবাসাকে বধ করিতে, মনকে বউদিদির মত নির্ম্মল করিতে, দিনরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় পাগলিনীর মত প্রয়াস পাইতেছি—বধ করিতে পারিতেছি কই? আকাশে যে ঝড় বয়, নদীতে যে বান হয়, তাহা কি ফিরান যায়? দেহের জ্বরের মত আমার মনের একটা কি ব্যাধি হ'য়েছে—এ ব্যাধির কারণ কি আমি? যাহা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই, তার কারণ কি আমি? সাধ করিয়া কে জলে ডোবে, আগুনে পোড়ে, বিষ পান করে? যদি আমার এ ভাব জল আগুন বা বিষ হয়—আমি ইচ্ছা করিয়া এ জলে ডুবি নাই, এ আগুনে পুড়ি নাই, এ বিষ খাই নাই। জলে আগুনে বিষে জ্বালা যন্ত্রণার অবধি থাকে না। কই আমার জ্বালা যন্ত্রণা কই? কেবল অনন্ত সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি-বোধ হয়। এ কি পাপ?"

"আকাশের চাঁদ জন্মাবধি দেখিতেছি, বনের ফুলে জন্মাবধি সুঘ্রাণ লইতেছি; কই উহাদের জন্যতো কখনও উন্মাদিনী হই

নাই! রাজপুত্রকে তো আগে কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু সেদিন হইতে আমার এ নূতনভাব হইল কেন? আমি সেরূপে আমার আনন্দ, আরাম, শান্তি দেখিয়া জগতের অসারতার মধ্যে তাঁকেই সারবস্তু জ্ঞান করি কেন? সেই অবধি আমার জীবনাকাশে একটা রূপের পূর্ণিমার উদয় হ'য়েছে, সুখের ঝড় বহিতেছে। আমি এ পূর্ণিমার এ সুখের কারণ? এত সুখের সৃষ্টি কি আমি করিতে পারি? এ যে সুখের সমুদ্র!"

"যাহাতে এত সুখ, এত আনন্দ, এত মত্ততা, তাহা যদি পাপ তো পুণ্য কি? পাপই হউক আর পুণ্যই হউক—কারণ আমি নহি; আর কেহ! ইনি কি মদন? তাঁকে শত শত প্রণাম। আমি সেই মদনের দাসী।"

"আমার মনে কি ভোগলালসা আছে? শ্বশুর বাড়িতে আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া সেই পাষণ্ড—উঃ বাপ! প্রাণ ফাটিয়া যায়। পাষণ্ড তোর মৃত্যু হউক!"

ভাবনার এই স্থানের জ্বালায় বনলতা অধীর হইল। জীবনকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিল। এ কলঙ্কিত জীবন রাজপুত্রের অনুপযুক্ত ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ভাবিল "আমি সেদিন কুভাবেতো রাজপুত্রকে দেখি নাই! কোন দিনতো তাঁকে কুভাবে দেখি নাই! এ জীবনে কখনও কাহাকেতো কামভাবে দেখি নাই! সেদিন তাঁহাকে দেখিবার আগেতো জানিতাম না কাহাকে দেখিব—কি দেখিব। দৈবাৎ সেই দেবমূর্ত্তিতে চক্ষে চক্ষু পড়িবামাত্র যেন সমস্ত জগতের রূপ, রস, গন্ধ, আনন্দ, শান্তি প্রবলবেগে বিধাতার নূতন সৃষ্টির মত আমার নিমেশ ভেদিয়া মরমে মরমে প্রবেশ করিল। আমার মনে, প্রাণে, জনমে, মরণে

চাঁদের কিরণ, ফুলের গন্ধ, স্বর্গের সুখ, ঘন করিয়া মাখাইয়া—আমার নবীন অস্তিত্বে প্রলেপ দিল; সেই অবধি সেই অমৃত প্রলেপের সুখস্পর্শে বিভোর হইয়াছি। সেইরূপ আমার দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব। কলঙ্ক হয় হউক, প্রাণ যায় যাউক, আমি তদবধি ভয় লজ্জা ঘৃণা ত্যাগ করিয়াছি। এ ভাব, এ আনন্দ আমি প্রস্তুত করি নাই; আমি ইহাকে নিবারণ করিতে পারি না। এ অমৃত পানে আমার দেহের রোগ গিয়াছে, দেহ মন তেজে পূর্ণ হইয়াছে; জগতে যেন সর্ব্বত্র অমৃত দেখিতেছি। সেদিন হইতে আকাশে, মাটীতে, বনে, জলে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। এ যদি কলঙ্ক তো অকলঙ্ক কি? এ যদি পাপ তো পুণ্য কি? এ যদি মন্দ তো ভাল কি? আমার প্রকৃতির সমস্ত শক্তি যাহাকে দমন করিতে পারে না, তাহা যদি পাপ হয় তো সে পাপের সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর।"

"আচ্ছা! যখন সকলে জানিতে পারিবে তখন কি হবে? এ মাথা দেহে থাকিবে না! তবে এ আনন্দের প্রয়োজন? এ প্রণয়ের ফল? যদি শেষই হয়, তো, সে নশ্বর বস্তুর জন্য কুলকলঙ্কিনী হই কেন? বউদিদি যা বলেন তাইতো ভাল? ইহার শেষ কোথায়—তাই বা কি জানি? মৃত্যু? সহস্র মৃত্যু মধুর বোধ হয় ঐ রূপ একবার ভাবিলে। যাতনা? সে রূপ স্মরণে ধরিয়া—সব যাতনা সহিতে পারি। ভয়? কাকে? গুরুজনকে? গুরু-জনকে মনে মনে ভক্তি করি, তাঁরা মারুণ, তাড়ান তাঁদের শাশনে একটী কথা কহিব না—পাথরের মত সহ্য করিব। যাতনা? অপমান? কত আসিবে আসুক, যাতনার আগুণে পুড়িলে বোধ হয় এ আনন্দের এ সুখের মলা অনেক নষ্ট হবে।

তাঁর জন্য যদি যাতনা না পাইলাম তো তাঁর পাদপদ্ম দর্শনের সার্থকতা কি? গৌরব কি? বিনামূল্যে কি ও দুর্লভ রত্ন মিলে? আমার প্রাণনাথের একবার দর্শনের মূল্য যদি সহস্রবার জীবনপাত না হয়, তো সে দর্শন সার্থক নহে। ঈশ্বর! যেন তাঁর একবার দর্শনের জন্য লক্ষবার মরিতে পারি। এ দেহ পচুক, গলুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন তাঁর পদধূলা একবার গায়ে মাখিতে পারি। মন শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয় হউক; যেন তাঁর পাদ-পদ্ম বিস্মৃত না হই। তাহা হইলে সব কলঙ্ক, সব যাতনা, মহা গৌরবে মহাসুখে উত্থিত হবে।

"সেদিন রাঁধিতে রাঁধিতে পায়ে ফেণ পড়িয়া পা পুড়িল, সে রূপ স্মরণে বিভোর ছিলাম, যাতনা টের পেলাম না। বোধ হয় ওরূপ স্মরণে সমস্ত দেহ পুড়িলেও অনুভব হয় না। ঈশ্বর! একি আমার পাপ না পুণ্য তা তুমিই জান। যদি পাপই হয় তো আমার জন্য তোমার অনন্ত নরক সৃষ্টি এতদিন পরে সার্থক হবে।"

• •

বউদিদি বলে "মৃত স্বামীকে চিন্তা কর"। আমি তা পারি না। পিতামাতা একজনকে আমার কাছে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মন কখনও সেদিকে ধাবিত হয় নাই। আমার নয় বৎসরে বিবাহ হয়; এখন সতের বৎসর বয়স। কত চেষ্টা করিয়াছি সেই মূর্ত্তিকে দেবতার মত ভাবিতে, কিন্তু যথনই ভাবিতে গিয়াছি অমনি যেন সমস্ত অস্তিত্বে বৃশ্চিক দংশনে জ্বলিয়া উঠিয়াছি। এখন যদি সে মূর্ত্তি পরিত্যাগে পাপ হয়, হউক—আমি নিজে তাহা ধরি নাই;—পিতামাতা ধরাইয়াও দেন নাই, শুনিয়াছি মন একজনকে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া লইলে পাপ হয়। আমি মন

বৎসর বয়সে সে মূর্ত্তি হারাইয়াছি, সে বয়সে খেলাঘরের পুতুলকে মন দিয়াছিলাম, এখন আর সে পুতুলে মন নাই। তাহা কি পাপ? যদি বল স্বামী বলিয়া যাহাকে ধরিয়াছ, তাহাকে ছাড়িলে পাপ, তাহা হইলে আমার আদৌ পাপ নাই। সমাজের বিচারে পাপ হইতে পারে, ঈশ্বরের বিচারে পাপ নাই। কারণ আমি নয় বৎসরে বিবাহের পর এ পর্য্যন্ত কখনও তাঁকে স্বামী বলিয়া ভাবি নাই। রাঙা কাপড়পরা, মাথায় মুকুট দেওয়া, হাতে জাঁতি-ধরা, পায়ে জরির জুতাপরা, একজন বিদেশীলোক বাজনা বাজাইয়া আমাকে কাঁদাইয়া পিতামাতার স্নেহের কোল হইতে কাড়িয়া বিদেশের সংসারে কয়দিনের জন্য লইয়াগিয়াছিল;—সেখানে কয়দিন কেবল কাঁদিয়াছিলাম, এই ভাব ছাড়া আর কোন ভাব আমার মনে আসে না। ভগবান! আমাকে অনেকে এই ভাবের পূজা করিতে উপদেশ দেয়; আমি তাহা পরি না। যে চিন্তায় যাতনা তাহাকে কি পূজা করা যায়? সমাজে এ যদি ধর্ম্ম তো আমি মহাপাপী আমি নরকেই থাকিব; নরকই আমার স্বর্গ। আমি শ্মশানে হাড়ের মূর্ত্তিকে সুগন্ধ পুষ্পমালায় না সাজাইয়া স্বর্গে আনন্দময় মূর্ত্তিকে সাজাইয়া যদি মহাপাতকী হই, তো আমার বিধাতা যেন আমাকে জন্ম জন্ম এমনি মহাপাতকী কুলকলঙ্কিনী করিয়া সংসারে প্রেরণ করেন।

"বউদিদি! তুমি আমার ব্যথার ব্যথি হইয়াও যেখানে ব্যথা বুঝিলে না! তুমি তোমার স্বামীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলে, আমার পথে আসিলে তুমি কলঙ্কিনী হবে। আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হয়, যে পথে দাঁড়াইয়াছি, তাহা ধর্ম্মপথ, বিধাতা স্বয়ং যদি এ স্বর্গকে নরক বলেন, তো, বিধাতাকে আমার

মধুর নরকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব এবং বলিব "তোমার স্বর্গও সৃষ্টি নরকও সৃষ্টি, আমাকে নরকের প্রাণী করুন, স্বর্গের দ্বার আমার জন্য বদ্ধ রাখুন।"

বনলতা শুইয়া এইরূপে কত কি ভাবিতে ভাবিতে জ্বলে আগুণে রাত্রিযাপন করিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আহ্লাদী দাসী।

সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। একহারা, লম্বা, পালিশকরা কাল। হাত পা গোলাল গোলাল। ভুরু টানা টানা। চক্ষু ভাসা ভাসা। মুখ হাসি হাসি। ঠোঁট রাঙা রাঙা। দাঁত মাজাঘসা ঝক্‌ঝকে। চুল লম্বা লম্বা। কালরঙে গঠন অতি সুন্দর। যদি কোন পুরুষের বুকে জীব বাহির করিয়া দাঁড়ায়, তো, ঠিক কালীঠাকুরাণী। একহারা দেহের কোথাও হাড় দেখা যায় না; হাতের আঙুল-গুলি পর্য্যন্ত বেশ নধর নধর। সে আঙুলে নখগুলি চক্‌চকে। কোন কোন সুশ্রী লোকের নখ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বড়ই কদাকার। আহ্লাদীর তাহাও সুঠাম। দেহের স্বাভাবিকতার উপর একটা কৃত্রিমতার চটক আছে। মুখে হাসির চটক, চলনে ভঙ্গিমার চটক। সে ঠমকে ঠমকে পা ফেলিয়া, পাছার তালে তালে সর্ব্বাঙ্গ দুলাইয়া, দেহের সৌন্দর্য্যে তরঙ্গ তুলিয়া, চলে কি নাচে বুঝা যায় না। ঢেউখেলান লম্বা কাল চুলে তৈলের সুগন্ধ ছড়াইয়া, মৃগনয়নের হাসিমাখা কথায় যুবার প্রাণ গলাইয়া, আহ্লাদী গরবে হেলিয়া দুলিয়া মলের ঝমকে ঝমকে চলে কি নাচে বুঝা যায় না। সে রাজবাটীর দাসী। তার উপর, হাতে সোণার বালা, সোণার তাবিজ, গলে সোণার হার, কোমরে সোণার গোট দেখাইয়া আনন্দে দুলিতে দুলিতে যখন যায় তখন অনেকেই তাহারদিকে প্রফুল্ল-

ভাবে চাহিয়া দেখে। নিজের হাতে তামাক সাজিয়া আহ্লাদীকে খাওয়াইতে পারিলে অনেক দোকানী জীবন সার্থক মনে করে।

রাজবাটীতে আহ্লাদীর বড় আদর বড় যশ। কারণ সে চার আনার ছয় আনার কাজ করিতে পারে। রাণীমা বলেন "বাজার সরকার কি বাঁদর! আহ্লাদী মেয়েমানুষ যা পারে, বাজার সরকার পুরুষমানুষ তা পারে না।"

আহ্লাদী এক একদিন রাণীমার জন্য হাটে যায়। মেয়েমানুষের কাছে জিনিস কিনিতেগেলে সুবিধা বড় হয় না। তবে বৃদ্ধারা রাজবাটীর দাসী বলিয়া ভয়ে ভয়ে বেয়াদা জিনিস দেয়। সে পুরুষদের একবারে সর্ব্বনাশ করে। পটলওলা আলুওলা বেগুণওলার কাছে বসিয়া এক পশলা হাসি ছড়াইয়া তাহাদিগকে কাত করে। যাহাদিগকে হাসিতে কথাতে পারে না, তাহাদিগকে দৃষ্টিবাণ মারিয়া বধ করে।

রাজবাটী হইতে একটু দূরে তার বড় মেটে বাড়ি। বাড়িতে মা বাপ ভাই ভাজ বন বনপো, অনেকগুলি আছে। সকলেই তাহার উপার্জ্জনে, রাজবাটীর কৃপায় পরমসুখে কালযাপন করে। বাপ মেটে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, গোঁপে তা দিয়া রূপার হুকায় তামাক খায়। ভাই দামী জুতা পরিয়া আতর পমেটম মাখিয়া বাজারে প্রণয় খরিদ করে।

রাজবাটীর অন্দরের যত সৌখীন জিনিস সব আহ্লাদী নিজে কেনে। টাকা হইতে আধুলি বাহির করিয়া একটা দোকানে দেয়, একটা নিজের পেটকাপড়ে লুকায়। ইহাই আহ্লাদীর রোজগার।

আহ্লাদী রাত্রি আটটার পর রাজবাটীতেও থাকে না, আপনার

বাটীতেও থাকে না। গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় গানের আড্ডা। সে, সেই আড্ডার কাছে, এলোচুলে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া, গান শুনে; শুনিতে শুনিতে সুরে সুর মিলাইয়া, হাঁটুর উপরে হাতের চাপড় মারিয়া তাল দেয়। জ্যোৎস্না রাত্রে বড় দীঘির দক্ষিণপাড়ে বকুলতলে সানবাঁধান রোয়াকে বা বাঁধাঘাটে পা মেলিয়া বসিয়া, এলোচুলে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে আপনার সুখে গরবে ফুলিতে থাকে। আকাশের জ্যোৎস্নায় ফুরফুরে বাতাসে যখন মনটা সরস হয়, তখন প্রাণখুলিয়া আহ্লাদী গাহিতে থাকে :—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসি না।
আমার স্বভাব এই তোমাবই আর জানি না॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি;
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসি না।

আবার রঙ্গের গান :—

গণেশের মা! কলাবউকে জ্বালা দিওনা।
সে যে গাছপালা অবলা ভালমন্দ জানে না।
কলাবউকে জ্বালা দিলে দুধেকলা খাওয়া হবে না॥

হা হা হা বলিতে বলিতে আহ্লাদী যেন আহ্লাদসাগরে ডুবিয়া পড়ে।

তার গলা বড় মিষ্ট। সেই মিষ্ট গলায় কত গান গায়। অনেক যুবা, বুড়া, আড়াল হইতে বা দূর হইতে তার গান শুনে। একদিন মনের আহ্লাদে প্রাণ খুলিয়া গাইতেছে। হরুঠাকুর পিছনে একটা গাছের আড়াল হইতে শুনিতেছে। আহ্লাদীর গান ফুরাইল। হরুঠাকুর তখন একটু নরমসুরে বলিল "কেও আহ্লাদ!"

আহ্লাদী অমনি তালে তাল বজায় রাখিয়া, হরুঠাকুরের মুখের কাছে সুগন্ধভরা মুখখানি অগ্রসর করিয়া উত্তর করিল "হা হা হা!"

হরু তার ব্যঙ্গস্বরে সাহস পাইয়া বলিল "বেশ আহ্লাদ! তোমার বেশ গান!"

আহ্লাদী আগের সুর বজায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল "তাইতো হরু বল কি?"

হ। মাইরি ভাই তোমার বেস গলা।

আ। তবে আমার আর সব খারাপ, কেবল গলাই বেস।

হ। না না তা নয়।

আ। তবে সবই মন্দ, বেস গলা আবার না না হ'ল যে!

হ। আহ্লাদ! আমি তা ব'লছি না।

আহ্লাদী বিকৃতস্বরে উত্তর করিল "তুমি তা ব'লছ না তো কি ব'লছ একবার প্রকাশ্য ক'রে বল।"

হ। ব'লছি তুমি বেস গাও।

আ। আমি বেস গাই আর তুমি বেস বলদ।

হ। কি এমন ভাগ্যি!

আ। বলদ কেন তোমাকে একবারে রাজবাড়ির ঘোড়া ক'রব, তাতে আরও ভাগ্যের জোর হবে।

হ। ওইতো তামাসা!

আ। তুমি বলদ হ'তে চাচ্ছিলে আমি ঘোড়া ক'রতে গেলাম, সেটা কি খারাপ হ'ল।

হ। তুমি তা হ'লে ঘুড়ি হও।

আ। আমি ঘুড়ি হব—তুমি আমাকে আকাশে উড়াতে পারবে?

হ। সে ঘুড়ি নয়, ঘোড়া ঘুড়ি। আহ্লাদ! তোমার ব্যাকরণ বোধ নাই।

"তবেরে গুখেকোর ব্যাটা! তোর ব্যাকরণের বাপের মুখে হাগি" বলিয়া আহ্লাদী "হুক" করিয়া মুখের গয়ের তার মুখে দিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড় দিল। আহ্লাদী তার দৌড়ের ধরণ দেখিয়া হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে পুকুরের বাঁধাঘাটে পা ছড়াইয়া বসিয়া আনন্দে গাহিতে লাগিল:—

একদিন হরি ব্রজের মাঠে,
একদিন হরি ব্রজের মাঠে,
কাটছিল ধান তুলি পোঁদের এঁটে।
গোয়ালাদের ছুঁড়ি যত, বিরহেতে কাঁদে কত,
হরি শুনতে পেয়ে কাস্তে ফেলে গেল তাদের কাছে ছুটে॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

পরেশ পাথর।

নয় বৎসরে বিধবা হইলে, বনলতা খেলাঘরে খেলা করিতে করিতে সে সম্বাদ শুনিয়া একটু চুপ করিয়াছিল ; তারপর বাটীতে শোকের তুফান দেখিয়া বিমর্ষপ্রাণে খেলাঘর ত্যাগ করিয়াছিল। যখন মা জামাতার শোকে কাঁদিত, তখন বালিকার চক্ষে সংসারে প্রফুল্ল আনন্দ-কানন শুষ্ক বোধ হইত। আবার মা কান্না ছাড়িয়া একটু প্রফুল্ল হইলে চারিদিক যেন ফলে ফুলে লতায় পাতায় বনলতার চক্ষে ফুটিয়া উঠিত। নয় হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তার বৈধব্য শীতল কি উষ্ণ, সরস কি নীরস, দুঃখের কি সুখের, বিষ কি অমৃত বালিকা তাহা বুঝিতে পারে নাই। বারর পর যখন সঙ্গিনীগণ শ্বশুরবাটী হইতে, বাপের বাটীর শুষ্ক মলিন সৌন্দর্য্যকে মাজিয়া ঘসিয়া চক্‌চকে করিয়া, মুখে চোখে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া, কাছে আসিতে থাকিল, তখন বনলতা নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু একটু বিমর্ষ হইতে থাকিল। মা কন্যার সে ভাব দেখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত চক্ষের জল ফেলিল।

যখন দেহে যৌবন উথলিয়া উঠিল, তখন আপনার জীবনো-দ্যানে রাশি রাশি ভাবফুল নিরাশার আঁধারে অমৃত দেখিয়া বনলতা

ব্যাকুল হইল। কাননে ফুল সকল চাঁদের আলোকে যে শোভা আনন্দ ও মাধুরি পায়, তার যৌবনোদ্যানে রাশি রাশি ফুল চন্দ্রালোক বিহনে বৈধব্যের অন্ধকারে দুঃখের আগুণে পুড়িয়া যাইতেছে। বনলতা আগে চারিদিকে যে মধুরতা আস্বাদন করিত সে আস্বাদন তিক্ত হইল। কি যেন প্রকৃতিতে তার সুখেরজন্য ছিল, তাহা জনমের মত গিয়াছে। আগে ফলে ফুলে লতায় পাতায় আনন্দ উথলিত; এখন সব নিরানন্দে শোকে পূর্ণ হইল। যত দিন যায়, যত সে দেহে মনে হৃদয়ে বড় হইতে লাগিল, তার নিরানন্দ, শোক, আক্ষেপ, বিমর্ষতা ততই বাড়িতে থাকিল। আগে কাছের পুকুরে পদ্ম ফুটিলে বনলতা কত ফুল আনিয়া খেলা করিত। এখন পুকুরে পদ্ম নাচে, বাগানে ফুল ফোটে, আকাশে চন্দ্র তারকা হাসে কিন্তু বনলতার সঙ্গে আর তাহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। যে সম্বন্ধ থাকায় জগতের আনন্দে মানুষের আনন্দ জাগ্রত হয়, বনলতার সহিত জগতের সে সম্বন্ধ-সূত্র যেন ছিড়িয়াগেল। বনলতা যেন সংসার বৃক্ষের ছিন্ন কুসুমের মত একপাশে পড়িয়া শুকাইতে থাকিল। ফুল যেমন এ অবস্থায় মাটীতে মিশিয়া যায়, পুকুরের পদ্মের মত বনলতার রূপ যৌবন সেইরূপ প্রকৃতিতে আর প্রকাশ না পাইয়া জনমের মত মিশিয়া যাইবে। বনলতা শীঘ্র মাটীতে মিশিবার জন্য, জল বুদ্বুদের মত বিলীন হইবার জন্য মনে মনে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু যেমন পরেশ পাথরে সকল বস্তু সোণা হয়, তেমনি সেই মহালগ্নে রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র বনলতার চারিদিকে মাটীর জগৎ সোণা হইয়াগেল। বনলতা বৈধব্যে পুড়িতে পুড়িতে যে জগৎকে ছাইভস্ম দেখিতেছিল; রাজকুমারের রূপস্পৃষ্ট দৃষ্টি

পরেশপাথরে সে জগৎ সোণা হইয়াগেল। আজ বনলতার কাছে পৃথিবীর প্রত্যেক ধূলিকণা সোণা—এ জগৎ সোণার জগৎ। তখন হৃদয়ের আনন্দ মুখে চোখে ফুটিয়া জগৎকে আনন্দময় করিল। পাখীর ডাকে, পবনের শব্দে বনলতা প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে লাগিল। এইরূপ আনন্দের জগতে ডুবিয়া যখন রাজ-কুমারকে ভাবে, তখন যেন সমস্ত জগতের সুখশান্তি ঐশ্বর্য্য তার প্রাণের মধ্যে একত্র হইয়া তাহাকে সুখশান্তি ঐশ্বর্য্যের রাণী করিয়া তুলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আহ্লাদীর স্পর্দ্ধা।

রাজকুমার বাটীর পিছনে বাগানের যে বকুলতলায় সন্ধ্যার পরে বসেন সেইখানে একটু দূরে একটী সানবাঁধান পুকুর। পুকুরের চারি পাড়ে চারটী বাঁধান ঘাট, নিকটের ভদ্রমহিলারা অনেকে সন্ধ্যাকালে সেই পুকুরে গা ধুইতে এবং জল লইতে আসে। রাজপুত্র বকুলতলা হইতে কিছুই দেখিতে পান না; কারণ পুকুরটী বৃক্ষরাজির অন্তরালে অবস্থিত। তবে একটু অগ্রসর হইলে পুকুর দেখা যায়।

একদিন ফাল্গুনের সন্ধ্যায় রাজকুমার সেই বকুলতলে বিছানায় শুইয়া কত কি ভাবিতেছেন। সেই সময়ে বনলতা পুকুরে কাপড় কাচিতে গেল। সঙ্গে একটী সাত বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র; বনলতা কাপড় কাচিতেছে, গা মাজিতেছে, ভাইপো হঠাৎ সরিয়া পড়িল। বনলতা কাপড় কাচিল, সিড়িতে উঠিয়া শুষ্ক কাপড় পরিতে পরিতে ভাইপোর নাম ধরিয়া ডাকিল, শাড়া না পাওয়ায় বাড়ি গিয়াছে স্থির করিল। কাছেই বাড়ি, পাড়ার ঝিউড়ি; সুতরাং একলা যাইতে সাহস করিল। আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল বনলতার হৃদয়াকাশেও এক চাঁদ হাসিতেছিল। বনে বসন্ত-বাতাসে গাছের পাতা নাচিতেছিল, শাখে পাখীরা গান গাহিতেছিল,

ফুলের গন্ধে উদ্যানের আকাশ উন্মত্ত হইতেছিল। এদিকে বনলতার চিন্তাবাতাসে উল্লাসে মন নাচিতেছিল, ভাব গাহিতেছিল, এবং প্রণয়-সৌরভে আপনি উন্মাদিনী হইয়া বসন্তদেবীর মত উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

বনলতা আকাশের চাঁদেরদিকে চাহিল, তাহা বড় সুন্দর! চাঁদ দেখিতে দেখিতে বনলতা আপনার হৃদয় সমুদ্রে জোয়ার অনুভব করিল। হৃদয় প্রাণ উছলিয়া, চক্ষু উছলিয়া অশ্রুজল ঝরিল। কাহার রূপ সেই চাঁদের মত—তার অস্তিত্বে আলো দিতেছে, তার প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে, তার বৈধব্যকে সৌভাগ্য করিতেছে; বনলতা প্রেমোন্মাদিনী হইল। চক্ষু মুদিয়া উদ্যানে কীট পতঙ্গ ও পাখীর গানে অমৃত পান করিতে করিতে কোন দেবকণ্ঠের শব্দ স্মরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। তেমন সুখের অশ্রু পৃথিবীতে অল্পই পতিত হয়। প্রেমবিহ্বলা যুবতী বাহিরের সৌন্দর্য্যে ভিতরের সৌন্দর্য্য ফুটিতে দেখিয়া, আপনাকে দুইটী জগতের যেন সুখের সন্ধিস্থলে অনুভব করিয়া আপনার নাম ধাম সবই ভুলিয়াগেল। সুরাপ্রমত্তের ন্যায় যুবতী প্রেম-মদিরায় উন্মাদিনী হইয়া, লজ্জাভয় ঘৃণা ভুলিয়া, আপনার দেবতাকে একবার দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। এক পা এক পা করিয়া যাইতেছে আর কাঁদিতেছে। কেন? কাঁদে কেন? এ কথার উত্তর কে দেবে? প্রণয়িনী যখন প্রণয়মন্দিরে দেবতার পূজার জন্য আত্মবলি দেয়, তখন কাঁদে কেন? প্রণয়-মদিরায় উন্মাদিনী যখন শত কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করিয়া, সহস্র যাতনাকে পুষ্পশয্যা ভাবিয়া, ঈপ্সিত ধন দেখিতে যায়, তখন কাঁদে কেন? প্রেমস্বরূপ ভগবানকে এ কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে

এ কথার উত্তর দেন। ভগবানের এই অশ্রুজল মানুষের অনু-তাপে, মানুষের দয়ায় এবং মানুষের প্রেমে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই অশ্রুজল অনুতাপে পবিত্র, অশ্রুজল দয়ায় পবিত্র, অশ্রু-জল প্রণয়ীর কোমল নয়নস্পর্শে পবিত্র।

"বকুলতলায় একবার দেখি!"—এই ভাব, এই আশা, এই বাসনা বনলতার হৃদয়ে যে শক্তি সাহস আনিয়াদিল, কোমলা অবলা-জীবনে তাহা কেবল প্রেমস্পর্শেই প্রকাশ পায়। শক্তি স্বরূপিনী ভগবতীর ইহাই প্রকৃত মূর্ত্তি।

"বকুলতলায় একবার দেখি!"—বনলতা ভাবে আর কাঁদে, কাঁদে আর অগ্রসর হয়, যেন তার স্বর্গ, তার মুক্তি, তার শান্তি, তার দুঃখে সুখ, রোগে ঔষধ, মরণে জীবন, লাভের জন্য বনলতা ধীরে ধীরে যাইতেছে। জীবনের যাহা লক্ষ্য, উদ্যমের যাহা ফল, যত্নের যাহা পুরস্কার, তাহা লাভ করিতে বনলতা ধীরে ধীরে যাইতেছে। আজ যেন তার জন্ম মরণের শেষ, অহংকারের সমাপ্তি, ভোগের শান্তি, কামনার নিবৃত্তি, অসার জীবনশেষে সার জীবনের প্রাপ্তি;—এইভাবে বনলতা প্রেমে ফুটিতে ফুটিতে ধীরে ধীরে বকুলেরদিকে যাইতেছে।

একটু দূর হইতে বকুলগাছ দেখিবামাত্র প্রেমিকা থমকিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নায় গাছে পাতাগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে; আলোতে ছায়াতে মিশিয়া, এক নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে;—আহা কি সুন্দর! কি উন্মাদক!! প্রেমিকার কাছে রজনীর এরূপ সৌন্দর্য্যাবরণে প্রেমরত্ন উদ্ধার করিতে যাওয়া যেমন মধুর, এমন মধুর ব্যাপার—অনন্ত ক্লেশের এমন মধুর পুরস্কার ত্রিভুবনে আর কোথাও কি আছে?

বনলতা দুই পা অগ্রসর হয়, আবার দাঁড়ায়। তীর্থে দাঁড়াইয়া তীর্থেশ্বরকে দেখিবার জন্য পাগলিনীবৎ চারিদিকে চায়। যেদিকে চায় সেদিকে তীর্থেশ্বর আছেন, ভাবিয়া লজ্জায় একটু জড়সড় হয়। বনলতা প্রেমতীর্থেরতন্ত্রে পঁহুছিল, বহু সাধনার দেবতাকে দেখিবামাত্র যেন আনন্দে জলিয়াগেল—দুই চক্ষু স্থির হইল, দৃষ্টি জলধারায় ডুবিয়া যাতনাবোধ করিল। সেই জলের ভিতরদিয়া একটু একটু দেখিতে দেখিতে প্রেমবেগে অজ্ঞাতে কলের পুতুলের মত বনলতা অগ্রসর হইল। বনলতার হৃদয়ের দেবতা দুইহাত তফাতে শুইয়া আছেন। তত নিকটে থাকিয়াও বনলতা আপনাকে অনেক দূরে অনুভব করিতেছে। রাজকুমার সানের মেজেতে নরম বিছানায় শুইয়া আছেন—নিদ্রিত—কপালে জ্যোৎস্নালোক নড়িতেছে, প্রেমিকা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অলঙ্কার স্বরূপ তাঁহাকে সেইভাবে দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞান রহিতার মত ধীরে ধীরে পুরুষরত্নের পার কাছে গিয়া বসিল। তখন আনন্দে শরীর কণ্টকিত হইল, চক্ষের জলধারা বাড়িল, প্রকৃতির চৈতন্য যেন আপনার ভিতরে একত্র করিয়া চৈতন্যের অতিরিক্ততার জীবনের আধিক্যে অভিভূত হইয়া সেস্থানের জড়ত্বে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। সেস্থানের মাটী, বাতাস, গাছ, লতা, পাতা, কীটপতঙ্গ সব যেন বনলতার সঙ্গে এক হইয়া তার প্রাণেশ্বরের সেবার জন্য ব্যস্ত হইল। বনলতা দেখিল, গাছ ফুল ফেলিয়া সেই দেবতাকে পূজা করিতেছে, স্মরণ করিয়া শিশিরে আর্দ্র হইতেছে, বায়ু যেন চামর ব্যজন করিতেছে, গাছ—লতা—পাতা—মর্ম্মরস্বরে যেন সেই দেবতার স্তব করিতেছে।

এদিকে দুষ্টা আহ্লাদী দূর হইতে একটী গাছের আড়ালে

সেই রাত্রে প্রেতিনীর মত কতকটা দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রাগে হিংসায় জ্বলিতেছিল; আর আজ রাত্রে না পারুক, কাল সকালে সেই কথা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে কি প্রকারে ঘোষণা করিবে, রাগে ফুলিতে ফুলিতে তাহাই ভাবিতেছিল।

রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, উঠিয়া বসিল; সম্মুখে সুন্দরী দেখিয়া ভয়ে চমকিয়া রুক্ষস্বরে দাবড়ি দিল "কেও তুমি?"

বনলতা সেই দাবড়িতে সেই তিরস্কার-বজ্রেতে মেঘসন্নিহিতা চাতকিনীর মত যেন মরিয়াগেল। মূর্চ্ছিতা হইয়া বনলতা সেই-খানে পতিতা হইল। যে বিধাতা বজ্রের নিকটে রামধনুর স্থান নির্দেশ করেন, সমুদ্রের ভীষণতায় রত্নের সংস্থান করেন, প্রতিভার ললাটে দরিদ্রতার কলঙ্ক অঙ্কন করেন, সেই বিধাতা আজ বনলতার অমন প্রেমকে রাজকুমারের ঘৃণা তিরস্কারের ভীষণতার পাশে স্থান দিলেন।

রাজকুমার বনলতার সেই স্বর্গীয় প্রেমকে কোন দুষ্টার দুরভি-সন্ধি ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তখন বাঘিনী আহ্লাদী সুযোগ পাইয়া ধীরে ধীরে বিকট আনন্দ প্রাণে চাপিয়া মূর্চ্ছিতা বনলতার কাছে আসিয়া বসিল। মুখ হেঁট করিয়া মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে, আনন্দভরে ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে, খোঁপা বাঁধা মাথা নাড়িতে নাড়িতে, শীকার বাগাইবার জন্য "বলি তুমি কেগো! ওগো কেগো?" বলিয়া বনলতার মুখের কাছে মুখ অগ্রসর করিতেছে, আবার হাসি "হো হো হো! মদনের জ্বালা শুধু আমার নয় বাবা! বামুন কায়েত সবই এ আগুণে পোড়ে! শুধু কৈবর্ত্ত নয়, বলি তুমি

কেগো!" বলিতে বলিতে আহ্লাদী একবার রাজকুমারের বিছানায় শয়ন করিল—মনে কত সাধ জাগিয়া উঠিল। তারপর বনলতার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে "তা বেশ! তা বেশ! আমার বুকে মই দিতে এসেছ! তা বেশ! তা বেশ!"

বনলতা একবারে সংজ্ঞাহীনা হয় নাই। মূর্চ্ছার বেগ অল্পক্ষণেই গিয়াছিল। আহ্লাদীর কথা সব বুঝিতেছিল; কিন্তু হৃদিবে বিষাদের তুফান পাইয়া চৈতন্যহারা হইতেছিল। বনলতা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিল—দাঁড়াইল—আহ্লাদীকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজ আবাসেরদিকে দ্রুতবেগে ধাবিতা হইল—যেন উন্মাদিনী—বিষাদিনী—শ্মশান-পরিত্যক্তা জগতের দয়া বিসর্জ্জিতা অভিমানিনী—আপনার অভিমানের আগুণে পুড়িবার জন্য জগৎ ছাড়িয়া কোন অনির্দ্দিষ্টদেশে যাইতেছে। যেন জগৎ হইতে কোমলতা, সৌন্দর্য্য, সুখশান্তি পলাইয়াছে। বনলতা তাই এমন দুষ্ট জগৎ ছাড়িয়া অভিমানের দুঃখে কোথায় অদৃশ্য হইতেছে। আর সে আনন্দ নাই, সে আশা নাই, সে জড়োন্মাদিকা মূর্ত্তি নাই। বনলতা যাইতেছে—আপনার দুঃখে অভিমান রাক্ষসীর সেবা করিতে করিতে, চক্ষের জলে আগুণ ঢালিতে ঢালিতে।

রাক্ষসী আহ্লাদী পিছনে পিছনে চলিল। শীকার পালায় দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসিল "বলি পীরিতক'রে যাও কোথা? দাঁড়াও একবার!"

বনলতা শুনিয়াও গ্রাহ্য করিল না, দ্রুতবেগে চলিল, আহ্লাদী ছুটিয়া গিয়া, সম্মুখের পথ আটক করিল। বনলতা তখন আত্মতেজে ফুলিয়া গর্জ্জন করিল "পাপিষ্ঠা দূর হ।"

বলিয়া বনলতা আহ্লাদীর পাশদিয়া চলিয়াগেল। তখন আহ্লাদী বনলতার আঁচল ধরিল। বনলতা আঁচল ছিনাইয়া ধাবিতা হইল। আহ্লাদী তখন রাগে হিংসায় জ্বলিতে জ্বলিতে গালি দিল "রাজকুমারের সঙ্গে আজ ধরাপ'ড়লি যে লো! পালাস কোথা? মাথায় ঘোল ঢালব! যোটেনা যে! হাঁলো যাস কোথা দাঁড়া ব'লছি।

এমন সময়ে রাজকুমারের শাড়া পাইয়া আহ্লাদী সরিয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

বৈধব্যের অধিক।

আহ্লাদী আপনার ঘরে গেল, কিছু খাইল না, ঘরে খিল দিল। প্রদীপ জ্বালিল; মেজেতে আর্শি খুলিয়া তার সম্মুখে বসিল। আর্শিতে আপনার শোভা দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবিল "বনলতার রংটা না হয় ভাল! কিন্তু গড়নটা কি? মানুষ রঙেই মজে কেন? আমার মুখের এমন গঠন! চ'খের এমন গঠন! হাতের পায়ের এমন গঠন! পাছার মাইএর এমন গঠন! এমন জিনিসেরদিকে যারা চায় না তাদের চক্ষু পোড়ে না কেন? রাজার ছেলে হ'য়েও চিনতে পারলো না! ছি! ছি! রাজকুমারের কি রুচি! ছি! ছি! পোড়া রঙে মজেগেল! আমার এই দাঁত কত ঝকঝ'কে! মুক্তা হার মানে! বামুনঠাকুরদা কতবার ব'লেছে! এ মুক্তাদাঁতে যখন হাসি ঝরে তখন কোন ব্যাটা পাগল না হয়! তা রাজপুত্রের কাছে তো দাঁড়িয়ে মুক্তাদাঁতের হাসি দেখাতে পারলাম না? তাহ'লে দেখতাম কালতে গোরা হার মানে কি না? আমার এমন পটলচেরা চক্ষু! হায় হায়! কতলোকের বুক যে এই চক্ষু ভেঙ্গেছে! সব বৃথা! সব বৃথা! রাজকুমারের আশায় কতলোকের স্তবস্তুতি অগ্রাহ্য ক'রেছি! ছি! ছি! রাজকুমার গোল্লায়গেল! আমাকে পসন্দ হ'ল না! আমি বার তের বৎসরে বিধবা হ'য়ে রাজকুমারকে বাগাবার জন্য কত কি ফিকির ক'রলাম

রূপকে কত ঘ’সলাম মাজলাম! রূপের কত তদারক কত কেয়ারি ক’রলাম! উঃ প্রাণ ফেটে যায়! বনলতা—শুখেকোর বেটী আবাগী আমার তৈরি ফসল নষ্ট ক’রলে! বনলতার মুখ পোড়াতে কি পারবো না! তার বুকে বাঁশ দিতে কি পারবো না! তার মাথায় ঘোল ঢালতে পারি তো বাপের বেটী! উঃ এ যৌবন আমি কাকেও দি নাই রাজকুমারকে দেবার জন্ত! বনলতা আমায় সে সাধে ঘা দিলে! আচ্ছা দেখি বনলতার সর্ব্বনাশ ক’রে রাজকুমারকে আমার করতে পারি কি না! আমি বনলতার মাথায় ঘোল ঢালতে যদি না পারি তো নিজে আত্মহত্যা ক’রব। এ যৌবনের রূপ ও শোভা কত যত্নে টাটকা রেখেছি, কত প্রলোভন এড়িয়েছি, কেবল রাজকুমারকে সম্ভোগ করাব বলিয়া! হায়! হায়! বামুনের মেয়ে আমার বুকে বাঁশ দিলে? দেখি এ বাঁশ উল্টে তার বুকে দিতে পারি কি না?

সেরাত্রি আহ্লাদীর বড় কালরাত্রি। যেরাত্রে বিধবা হইয়াছিল সেরাত্রে এত কষ্ট হয় নাই। সে সমস্ত রাত্রি দুঃখে রাগে হিংসায় অভিমানে কালসাপিনীর মত ফুলিতে গর্জ্জিতে থাকিল। বুকের ভিতরে আগুণ জ্বলিল, মাথার মগজ পুড়িল, আহ্লাদীর আহ্লাদে বাজ পড়িল। নিদ্রা হইল না, চক্ষু রাগে দুঃখে জল ফেলিয়া ফেলিয়া ফুলিল। চক্ষের কোলে কাল দাগ পড়িল, দেহের লাবণ্য কমিল, আহ্লাদী আগে যাহা ছিল একরাত্রে আদখানা হইল।

সে প্রত্যুষে উঠিল। আজ আর মুখে হাসি নাই, চলনে ঠমক নাই, আজ তার আহ্লাদে বজ্রাঘাত। এতদিন সে আপনাকে রাজকুমারের ভাবী উপপত্নী বলিয়া ভাবিয়াছিল;—সে হিসাবে

আজ ভুল হইল। রাস্তায় যখন রাজকুমারের গাড়ি ছুটিত তখন সে একদিন সেই গাড়িতে রাজকুমারের বামে বসিবে, মনে মনে এই হিসাব করিয়াছিল; আজ তার সে হিসাবে ভুল হইল। সমস্ত গ্রামকে তোলপাড় করিয়া যখন পূজা পার্ব্বণের ঘটা হইত, তখন সে আপনার বুকটা বড় করিয়া, মনে মনে আপনার পালঙ্কে রাজকুমারকে বসাইয়া, বাঁধা-হুঁকায় তামাক খাওয়াইতে খাওয়াইতে আনন্দে গরবে ফুলিয়া উঠিত। রাজকুমার যখন ছড়ি হাতে রাস্তায় পাইচারি করিত, তখন আহ্লাদী তাঁর সোণার চেইনের দিকে, আঙুলের হীরার আংটীরদিকে, চাহিতে চাহিতে ভাবিত, এই চেইন ও আংটী যখন আমার ঘরে শোভা ঢালিবে, তখন শত্রুদের মুখে চুণ কালী পড়িবে। এই ভাবনায় আহ্লাদীর হাসি ঠোঁট ও চক্ষু উপচিয়া পড়িত। আজ আর সে হাসি নাই; রাজকুমারের চিন্তায় সে রাতদিন ভোরপুর থাকিত, মনে মনে রাজকুমার তার, সে রাজকুমারের, আজ না হউক কাল না হউক, একদিন রাজকুমার আহ্লাদীকে কোলে বসাইবে, আহ্লাদী তখন গরবে অভিমানে মুখ নত করিয়া থাকিবে। যখন হাতের কয়টী হীরার আংটী একে একে খুলিয়া, সোহাগের সহিত রাজকুমার তার এক একটী আঙুলে আঙুলের তারিফ করিতে করিতে পরাইবে, তখন সে গরব অভিমান দূরে ফেলিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া, তার বালবৈধব্যের সমস্ত জ্বালার শান্তি করিবে। আহ্লাদী এইরূপে কত কি ভাবিত, ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিত, গাছতলায় বসিয়া হাওয়া খাইত, স্নান করিতে গিয়া জলে ভাসিত। এই সকল চিন্তায় আহ্লাদীর আশা ভরসা এত বৎসর ধরিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতেছিল।—আজ একরাত্রে সব

শুকাইয়াগেল। আহলাদী জ্যোৎস্নারাত্রে যে অত আনন্দে গরবে বিচরণ করিত, গান গাহিত, গানের আড্ডার কাছে বসিয়া সুরে সুর মিলাইত—সে সব ঐ আশার কুহকে, আজ সে কুহক ভাঙ্গিল।

তার সেই চলনের ঠমক, মলের ঝমক, কথার ধমক, হাসির ছটা, চাতুরির ঘটা সবই ঐ আশার কুহকে; সে কুহক আজ ভাঙ্গিল।

আজ একরাত্রের একটী ঘটনা দেখিয়া তার আহলাদের সাগর শুকাইয়াগেল। যেমন ঝড়ে পুষ্পোদ্যানের দুর্দ্দশা হয়, আজ এক রাত্রের ঝড়ে তার সেই দশা হইল। আজ মুখে হাসি নাই বিষণ্ণতা, দেহে স্ফূর্ত্তি নাই জড়তা, চলনে ঠমক নাই দীনতা। রাজবাটীতে যাইতে যাইতে পথে সম্পর্কীয় ঠাকুরদাদা ঠান্‌দিদির সঙ্গে কত আলাপ হয়, আজ সে সব কিছুই নাই। মাথার উপরে গাছের ডালে কোকিলে দয়েলে শীশ দিলে আহলাদীর যৌবনে তুফান উঠিত; আজ কোকিল ডাকিল, দয়েল শীশ দিল, আহলাদীর যৌবন যেন তাতে শুকাইয়া আসিল। মনে মনে বনলতার মাথায় ঘোল ঢালিবার মতলব আঁটিতে আঁটিতে চলিল। রাণীকে কি বলিবে, সমস্ত ঘটনার কোনটা চাপা দিয়া কোনটা রং দিয়া প্রকাশ করিবে তাহাই নীরসপ্রাণে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। আর রাজকুমারের দাবড়ির লক্ষ্য "বনলতা নহে আমি,"—এই ভাবনায় কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:•:০—

দুনিয়ার চিত্র।

আহলাদী রাজবাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে, অন্যান্য দাসীরা তার আকৃতির বিকৃতি দেখিয়া, একটু অবাক হইয়া থাকিল। আহলাদী কারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। আগে অন্যান্য দাসীদের কাজের খুঁত ধরিয়া ঝগড়া করিত; আজ আর সে সব নাই। যারা মনে মনে চটাছিল—তার বিকৃতি দর্শনে তাদের একটু আনন্দ হইল।

আহলাদী অন্দরে গিয়া রাণী মাকে খুঁজিতে লাগিল। রাণী তখন কোমলশয্যা হইতে তাঁর বিরাট বপুখানি ("আড়া মোড়া" দিয়া গহনায় শব্দ তুলিয়া) অনেক কষ্টে স্থানান্তর করিতেছিলেন। রাণীর মুখখানি একটু গোলাল—গোলাল মুখ একটু খাঁদা হয়। সেই খাঁদা নিটোল আভাময় নাকে প্রকাণ্ড নত—নতে বড় বড় মুক্তা—আর সেই বড় বড় এক একটী মুক্তার লাবণ্যে রাণীর মুখের প্রতিবিম্ব মুক্তার দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। হাতে হীরকের বলয় ঝক্‌মক্ করিতেছে। কণ্ঠদেশে মুক্তারমালা—কণ্ঠের সৌন্দর্য্যে আপনাকে দাসত্বে বিক্রয় করিয়াছে। শয়নের চাপে সে কোমল কণ্ঠে গ্রীবায় মুক্তার দাগ বসিয়াছে। রাণী আলুথালু-ভাবে প্রকাণ্ড নিতম্বের উপর আপনার অস্তিত্বের ভার রাখিয়া গম্ভীরকণ্ঠে একজনা দাসীকে ডাক দিতেছেন; এমন সময়ে

আহ্লাদী কাঁদ কাঁদ মূর্ত্তিতে উপস্থিত। তার মুখেরদিকে চাহিয়া রাণী একটু চমকিতা হইলেন; বিস্মিতস্বরে বলিলেন "ওলো! তোর কি, অসুখ হ'য়েছে নাকি?"

আহ্লাদী তখন মনের আবেগটা খুব জোরে চাপিতে চাপিতে (নহিলে কাঁদিয়া ফেলিত) বলিল "মা! আর বেঁচে সুখ নাই!"

রা। কেনলো! তোর মুখে এমন কথা তো শুনিনি।"

রাণীর কথা শুনিয়া আহ্লাদীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মনে একটা "মরিয়াভাব" উপস্থিত হইল—ভয় আবার কাকে? আমার পাকাধানে মই পড়িয়াছে, জীবনের আশা ভরসা রসাতলে গিয়াছে, আমার আবার ভয় কি? সবই ঘটনা খুলিয়া বলিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আহ্লাদী সাহসে ফুলিল—তারপর একটু কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "মা! কালকের কথা কি কিছু—!"

রাণী আহ্লাদীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত—একটা উগ্রভাবের প্রকাশ দেখিতে দেখিতে, তার সেই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কিছু ব'লে আবার থামলি কেন?" বলিয়াই রাণী তার মুখেরদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আ। ব'লতে ভয় ক'রছে মা! আপনারা বড়লোক, আমরা ছোটলোক—ছুঁচো বাঁদর। ছোটলোকের মুখে বড় ঘরের কথা বাহির করা—বিপদে ঝাঁপ দেওয়া।

"তবে ব'লতে এলি কেন?"—বলিতে বলিতে রাণী মুখ ফিরাইলেন।

আ। যদি কিছু না মনে করেন তো বলি। আপনাদের খেয়ে মানুষ আমার সাতপুরুষ। আপনাদের ঘরের একটা কিছু খারাপ দেখলে আমাদের বুকে যেন বাজ পড়ে।

রা। কিলো! কি এমন কথা!

আ। না মা! আমার ব'লতে আসা ঝকমারি!

রা। তবে দূর হ!

আ। তা ব'লবো বইকি? আপনাকে ব'লবোনা তো কাকে ব'লবো! তবে আর কেউ জানতে না পারে।

রা। তবে এখন থাক, একটু পরে এসে বলিস; এখন মুখ, হাত, ধুই স্নান আহ্নিক পূজা করি, তারপর নিরিবিলিতে শুনবো।

আহ্লাদী সরিয়াগেল, বাহির বাটীর শিবের মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "সব কথা বলা হবে না। শুধু ব'লবো কালরাত্রে বকুলতলায় দাদাবাবুর কাছে বামুনদের বনলতাকে দেখেছি। তা সত্যি ব'লতে দোষ কি? বনলতাকে ছেড়ে রাজকুমার আমাকে কখনও পছন্দ ক'রবে না। তা আমার জীবনের সব সাধ যা হ'তে নষ্ট হ'ল; তাকে ভয় ক'রবো কেন? পোড়ারমুখী খানকীকে আবার ভয়! রাজকুমার আমায় কাটবে! কোম্পানীর মুলুক বাবা! মগের মুলুক নয়! আমি ব'লেই কাজে জবাব দেব। পুলিশে খবর দিয়ে রাখবো! তাহ'লে আর আমার কে কি ক'রবে! দারগা মশাই কি ভদ্রলোক! আমাকে দেখলেই যেন সব ভুলে যায়। কতদিন আমারদিকে চেয়ে চেয়ে সারা হ'য়েছে। আমি মুচকে হেসে স'রে পড়েছি! কার জন্য? পোড়ার মুখোর জন্য কত ভাল লোককে অগ্রাহ্য ক'রেছি! আহা দারগা মশাইএর রূপ কি?" এই প্রকারে অনেক রকম ভাবিতে ভাবিতে আহ্লাদী রাণীর কাছে গেল।

রাণী তখন আহ্লাদীর অপেক্ষায় ঘরের মেজেতে বসিয়া আছেন।

রা। আমার কাছে স'রে এসে ব'স! চুপে চুপে বল শুনি।

আ। মা! দোহাই ধর্ম্ম! আপনার দিব্য! যদি মিথ্যা বলিতো যেন আজই মৃত্যু হয়।

রা। তোর কোন ভয় নাই। বলনা কথাটা কি?

আ। মা! কালরাত্রে!

আহ্লাদীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে—চোখ মুখ লাল—কথা মুখে আসিতে চায় না। অনেক কষ্টে অনেক সাবধানে জিহ্বা মন সংযত করিয়া আহ্লাদী আবার বলিল "মা! কালরাত্রে পিছনের ফুলবাগানের পুকুরে কাপড় কাচতে গেছলাম। কাপড় কেচে ঘড়া ক'রে জল নিয়ে আসতে আসতে বনলতাকে দেখতে পেলাম—এইখানে আহ্লাদী ভয়ে কাঁপিল—আর কথা কহিতে সাহস নাই। তখন রাণী বলিলেন "তা দেখতে পেলি পেলি তাতে তারই বা কি, আমারই বা কি, তোরই বা কি?

তখন আহ্লাদীর রাগ হইল, রাগে সাহস জাগিল। "শুধু কি তাই! আরো কিছু আছে! যা দেখেছি তাই ব'লছি। আপনাকে সাক্ষাৎ দুর্গা ঠাকরুণ ব'লে জানি, মিথ্যা বলি তো যেন এখনি জীব খসে!

রা। আমরণ! তত আগড়ম্ বাগড়ম্ ব'কছিস কেন? সব খুলে বল?

আ। মা! বনলতা তারপর দাদাবাবুর কাছে গিয়ে ব'সলো! এই কথা বলিবার সময় আহ্লাদীর মুখ, চোখ, শুকাইয়া আসিতেছিল—বুক মাথা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, সে তখন যমালয়ে কি পৃথিবীতে বুঝিতে পারিতেছিল না। মনে মনে ভাবিতেছিল, এইবার হনুমান সিংহ দ্বারবানের তীক্ষ্ণ তরবারে তার মাথা দেহ

হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তাই কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে রাণীর পায়ে ধরিয়া ব্যাকুলস্বরে চক্ষের জলে রাণীর পা ভিজাইয়া বলিল "রাণীমা! আমি তোমাদের গু মুত অনেক কেটেছি, আমাকে এখন রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন।

রাণী আহ্লাদীর কথা শুনিয়া মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে বলি-লেন "মা আহ্লাদী! তোকে আমি এই হাতের আংটী দিচ্ছি; তুই আর কি দেখেছিস সব খুলে বল মা! আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর মা! বনলতা হতে যদি ছেলে আমার সন্ন্যাসী না হয়, তো, বনলতার সঙ্গে আমার জ্ঞানর বে দেব, সমাজ মানবো না! হ্যা আহ্লাদ! সত্যি—না মিথ্যা!

আহ্লাদীর "আক্কেল গুড়ুম" হইল। মুখ, চোখ, প্রাণ, মর্ম্ম সব যেন শুকাইয়াগেল—বনলতার সৌভাগ্যের কথায় তার মাথায় বাজ পড়িল। তখন বনলতার কথাটা চাপা দিবার জন্ত বলিল তা রাত্রে দেখেছি মা! বনলতা যে ঠিক তা ব'লতে পারি না। আমি দেখেই লজ্জায় স'রে পড়লাম কি না?

রা। তা যেই হ'ক, ঘটনা সত্য কি না?

আ। ওমা! আমি আপনার কাছে মিথ্যা ব'লতে পারি।

রা। মা আহ্লাদি! আজথেকে তোর আর সব কর্ম্ম করতে হবে না; তোর মাইনে দুগুণ হ'ল। তুই চেষ্ট কর, যাতে বনলতার সঙ্গে জ্ঞানর প্রণয় খুব বাড়ে। একথা খবরদার প্রকাশ করনা মা! তাহ'লে সব ফেঁসে যাবে। জ্ঞান বে করতে চায়না বুঝি ঐ জন্ত! তা বিধবা বিয়ে তো অনেক হ'য়েছে! তা আমি দেব। মা এসব যেন আর কেউ না জানে, তোকে একটা ... পারবি?

আ। পারবোনা কেন? কবে কি না পারি?

রা। তুই আজথেকে গোপনে গোপনে ভালক'রে রাত্রে সন্ধান কর ঠিক বনলতা কি না? তারপর গোপনে গোপনে বনলতার সঙ্গে দেখা ক'রে বল যে, রাণীমার একান্ত ইচ্ছা তোমার সঙ্গে জ্ঞানর বিবাহ দেন।"

রাণী যদি তাহাকে যমের বাড়ি হইতে কিছু চুরি করিয়া আনিতে বলিত, তো, সে হয়তো হাসিতে হাসিতে সম্মত হইত। কিন্তু বনলতাকে রাজকুমারের প্রণয়িনী করিবার আয়োজন করিতে বলায়, সে মনে মনে রাণীর মাথায় তখনি শত বজ্র পড়িবার কামনা করিতে করিতে কপটভাবে বলিল "তা আর ব'লতে, আমি তাই ক'র্বো এখনি চল্লাম।" বলিতে বলিতে তার চক্ষুদিয়া কয় ফোটা জল পড়িল, রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

আহলাদীর ভিতরের ঝড় প্রবল হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

প্রলোভন।

চৈত্র মাস, রাত্রে শীত নাই বলিলে হয়। সন্ধ্যার পর রাজকুমার সেই প্রকাণ্ড বকুলতলায় একলা বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন। এ সংসার আর ভাল লাগে না, শীঘ্র সন্ন্যাসী সাজিবেন। পিতা বিবাহের সম্বন্ধ দেখিতেছেন। জীবনকে কারাগারে বদ্ধ করিবার আয়োজন হইতেছে। সেদিন রাত্রে কুটীরে আসিয়াছিল সে সুন্দরী কে? বামুনদের বনলতা! বিধবা যুবতীর পক্ষেতো বড়ই কলঙ্কের কথা! আমার পক্ষেতো ভীষণ কলঙ্কের কথা! ভাবিতে ভাবিতে একবারে কোথা হইতে দিশেহারার মতন পড়িয়াছেন! প্রকৃতি কি? ভেলকির খেলা? জড় আগে না চৈতন্য আগে? সূক্ষ্ম হইতে স্থূল বস্তুর উৎপত্তি যদি সত্য হয় তবে সূক্ষ্ম চৈতন্য হইতে স্থূল জড়ের উৎপত্তিই সম্ভব। কিন্তু এ সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধি যত উপরেই উঠুক, ঠিক মীমাংসা করিতে অক্ষম। মানুষ আপনার উন্মত্ত বুদ্ধিকে শান্ত করিবার জন্য এক একটা শাস্ত্র বিচারের অনুসরণে ক্ষণিক শান্তিলাভ করে। যাতে যার মন শান্ত হয় তাহাই তার প্রিয়শাস্ত্র। কোন ধাতুর বুদ্ধি সাংখ্যে তৃপ্তি পায়, কেহ বা বৈশেষিকে, কেহ বা ক্যাণ্টে, কেহ বা হেগেলে, কিন্তু ঠিক কথা কি বুঝা যায় না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা আছেন, এমন সময়ে, সেই জ্যোৎস্নাময়ীর রজনীতে

শীতল বাতাসে বকুল ফুলের গন্ধে রাজকুমারের মাথার উপরে একটী বৃহৎ গোলাপফুল পতিত হইল। তিনি তখন চমকিতভাবে উপরে চাহিতে চাহিতে ভাবিলেন, বকুলগাছ হইতে গোলাপফুল পড়ে কি প্রকারে? বালিসে মাথা দিয়া শুইয়া, গাছের জ্যোৎস্না শোভিত রূপেরদিকে চাহিয়া আছেন হঠাৎ একছড়া বেলফুলের মালা তাঁর বুকের উপরে পড়িল! তিনি ভীত হইয়া ধড়মড় করিয়া দাঁড়াইলেন। চমকিতভাবে ঊর্দ্ধনয়নে জিজ্ঞাসিলেন "কেরে! বকুলগাছে কেরে!"

কোন উত্তর নাই।

তখন রাজকুমারের কৌতূহল আরো বাড়িল। একমনে তন্ন তন্ন করিয়া গাছের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। জ্যোৎস্নায় পাতাগুলি চক্‌মক্‌ করিতেছে। গাছের ঘন পল্লবের ভিতরদিয়া চাঁদের কিরণ উঁকি মারিতেছে; আঁধারে আলোকে মিলিয়া জ্যোৎস্নাকণা ডালে ডালে দুলিতেছে। রাজকুমার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, গাছে মানুষ কোথাও নাই। তবে কি ভূত? তিনি ভূত মানেন না। অনেকবার বন্ধুদিগকে বলিয়াছেন ভূত দেখিতে পাইলে ভূতকে অল্পে ছাড়িয়া দেব না—পরলোকের কথা লিখাইয়া লইয়া তবে ছাড়িব। তাই ভাবিতে লাগিলেন—তবে কি ভূতে ফুল ফেলিতেছে! ও আবার কি? কে যেন মিহিসুরে গান গাহিতেছে—সুর ক্রমশঃ মোটা হইল। গাছের মধ্য হইতে অদৃশ্য থাকিয়া কে গাহিতেছে:—

দুঃখের কথা কারে বল কই?
আমার পাকাধানে দিয়েছে মই।
আমি দারুণ ব্যাথায়, মর্ম্ম কথায়, ব'লতে গেলে ম'রে রই।

একি ! কেথায় ? কার গলা ? গাছেতো কাকেও দেখিনা। তবে কি ভূতের কথাই সত্য ! কিন্তু শুনিয়াছি ভূতে খোঁনা খোঁনা কথা কয়। এতো মিষ্ট সাধা গলা। যেন শত ভ্রমরের ঝঙ্কার ! আবার গান হইতেছে ঃ—

কেমনে ভুলিব তোমা ভুলিতে কি কভু পারি।
আহা তব রূপরাশি
আমার হৃদয়ে ভাসি
ভাসাইল সব মম, প্রেমসাগরে তোমারি।
ইচ্ছা হয় লইয়া তোমায়
প'ড়ে থাকি গাছের তলায়
চাঁদের কিরণে ভাসি রাখি বুকের উপরি
না জানি কি আছে তোতে
কেন যে জীবন মাতে
ইচ্ছা করে থাকি সদা রূপের তলে তোমারি।

গান থামিল। কতকগুলি ফুল গাছ হইতে পড়িল। রাজকুমার বুকে সাহস ধরিয়া, একটু থামিতে থামিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি ?"

উত্তর নাই।

একটু ভয় হইল। আবার সাহস করিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন " কে তুমি ? মানুষ না দেবতা ? "

উত্তর নাই।

রাজকুমার তখন সাহসে রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন "কথা না কও এখনি পিস্তল আনিয়া গুলি করিব "।

উপর হইতে আবার গান হইল ঃ—

দুঃখের কথা আমি কারে কই?
আমার পাকাধানে দিয়েছে মই।

রাজকুমারের তখন ভয় গেল—বিস্ময় বাড়িল। বিস্ময়ে বলিলেন "তুমি কে বল? তোমার মর্ম্মকথা শুনা যাবে।"

আবার গান :—

শুনিলেতো দুঃখ যাবেনা
যাতনা মনে রবে প্রাণ শীতল হবেনা।
আমি চাই তোমারে প্রাণ
তোমারে সঁপেছি প্রাণ
তুমি আমার যদি বশে থাক মনের দুঃখ রবেনা।

রাজপুত্র এখন বুঝিলেন "এ ভূত নয় বটে কিন্তু ব্যাপার কি? [illegible] এমন ভাবে রঙ্গ করে কে? এত সাহস কার? সেদিনকার রাত্রের বনলতা নাকি? রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন "এত রাত্রে গাছে তুমি কে?

গাছ বলিল "আমি দেবকন্যা।

রা। এগাছে কেন?

আ। তুমি আইবুড় সুন্দর পুরুষ, এ জ্যোৎস্না রাত্রে ফুলের গন্ধে গাছতলায় কেন?

রা। আমি ভালবাসি থাকতে।

আ। আমি ভালবাসি তোমায় দেখতে।

রা। আমায় দেখে লাভ কি?

আ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ

রা। তা বেশ নেমে এস।

আ। আমায় বিবাহ ক'রবে বল।

রা। সেকথা পরে হবে।

আ। তবে স্বর্গে চলে যাই।

রা। তা যাও দেখি কি প্রকারে যাও।

আ। তোমাকে এই বকুলতলে দিন কয়েক সম্ভোগ করে যাব।

রা। কি সম্ভোগ ক'রবে ?

আ। রতি।

রা। তুমি নেমে এস।

আ। তুমি শপথ কর আমাকে স্ত্রীর মত দেখবে।

রা। মানুষে দেবতায় কি তা হয় ?

আ। আইবুড় সুন্দর কার্ত্তিক তুমি, এই জ্যোৎস্নায় তোমার দাসী হতে পারি কিনা পরখ কর। তোমাকে বুকে করে আকাশের জ্যোৎস্নায় উড়ব, দুজনে ছোট হ'য়ে ফুলের পাপড়িতে শুয়ে গাছের বাতাসে দোল খাব। নির্জ্জন বনে শীতল ছায়ায় তোমার বুকে শুয়ে প্রেমের স্বপ্ন দেখবো; তোমার এই ছাই রাজত্বে কি সুখ ?

রা। সুখ কোথা পাব ?

আ। আমার রূপে, আমার বুকে, আমার মুখে, আমার সুখে।

রা। তবে তুমি নীচে এস, তোমার রূপে যদি এত সুখ, তবে আমাকে সে রূপ দেখিয়ে, পাগল ক'রে তোমার স্বর্গে ল'য়ে যাওনা কেন ? আবার শপথের প্রয়োজন ?

আ। তুমি আমায় দেখলেই পাগল হবে।

রা। তবে আর কি ? এখানে কেহ নাই, কেহ আসবেনা।

তখন গাছের উপরের একটী বড় কোটরের ভিতর হইতে এক

রমণীমূর্ত্তি ঢাকাইশাটী পরিধানে, বলয় অনন্ত হার চিকাদি ভূষণে, নানা গন্ধদ্রব্য লেপনে ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিতে লাগিল। মূর্ত্তি অল্পক্ষণ মধ্যে ভূতলে ঝুপ করিয়া পড়িল। উঠিয়া প্রবল বেগে গিয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিল। রাজকুমার ভয়ে বিস্ময়ে রাগে বিকৃত হইয়া এক ভীষণ ঝাপটায় রমণীকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রমণী ধুলায় লুটিতে লুটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমার তখন দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়াছেন।

তখন আহ্লাদী রাগে ফুলিতে লাগিল। তার হৃদয়ে টগ্ বগ্ করিয়া আক্ষেপ, নিরাশা, হিংসা, কামনা একত্রে মিশিয়া ফুটিতে লাগিল। দ্রুতবেগে লজ্জায় ঘৃণায় গ্রামের সেই পুকুর-পাড়ের বকুলতলায় গেল। আকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে—আহ্লাদীও হাসিল—বড় বিকট হাসি—উন্মাদের হাসি। হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া আকাশের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে হিঃ হিঃ হিঃ শব্দে হাসির রোল তুলিল। হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া এক বার এদিকে এক বার ওদিকে যায়, আর নাচে। খানিক খুব নাচিয়া বসিল। কি ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় দুঃখে ভারি হইল; গান ধরিল :—

দুঃখের কথা কারে আমি কই,
আমার পাকাধানে পড়েছে মই।
আমি দারুণ ব্যথায়, মর্ম্ম কথায়
ব'লতে গেলে ম'রে রই॥

আহ্লাদী গানকে উল্টিয়া পাল্টিয়া গাহিতে লাগিল। নাচে, গায়, হাসে, বকে। গাহিতে গাহিতে একটা নিকটের ফুলবাগানে গেল, রাশি রাশি ফুল তুলিল। ভোরবেলা, এক কোঁচড় ফুল

লইয়া ঘরে ফিরিল। মালা গাঁথিয়া পরিল; একগাছা মালা হাতে লইয়া কাকে দিতে গেল।

আজ সকালে সকলে আহ্লাদীর উন্মাদিনীবেশ দেখিল। মাথার খোপায় ফুলের মালা জড়ান; গলায়, বুকে, হাতে, পায়ে, ফুলের মালা জড়ান' আহ্লাদী রাস্তা দিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে:—

দুঃখের কথা কারে বল কই?
আমার পাকা ধানে প'ড়েছে মই।

রাস্তার লোক জিজ্ঞাসিলেন "ও আহ্লাদ! কে মই দিয়েছে? তখন সে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "ওই মুখ পোড়া ভগবান, আমার ভাতার কেড়ে নিয়েছে যে, সেই দিয়েছে"।

রাস্তার লোক বলিল "ভগবানকে কি গাল দিতে আছে!"

আহ্লাদী ভয়ানক রাগিয়া বলিল "ভগবান তোর বুঝি বনাই, আর বামুনদের বনলতা বুঝি তোর মাগ।"

আহ্লাদী আবার গীত ধরিয়া চলিল। পাড়ার বামুন ঠাকুর-দাদা আহ্লাদীর সে বেশে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিল "ও আহ্লাদ!"

আ। কেন পেহ্লাদ।

বা। বলি আজ এ বেশ কেন?

আ। আমার বিয়ে বিয়ে
ধুচনি মাথায় দিয়ে
ধুচনি যাবে ভেসে
লুচি খাব ক'সে॥

বা। কার সঙ্গে বিয়ে?

তখন অহ্লাদ খানিকটা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল হাসিতে হাসিতে বলিল " রাজকুমার প্রাণনাথের সঙ্গে বিয়ে, তুমি বের পুরুত হবে ?

বা। দক্ষিণা দিবি কি ?

আ। আমার এই নব যৌবন, আর এক রাজত্ব।

এইরূপে নানা ভাবে নানা কথা কহিতে কহিতে, আহ্লাদী বামুনদের বাটীতে প্রবেশ করিল। বনলতাকে দাওয়ার ধারে বসিতে দেখিয়া—খানিকক্ষণ একদৃষ্টে যেন ভস্ম করিবার জন্য উগ্র-মূর্ত্তিতে চাহিয়া থাকিল। বনলতা তাহা দেখিয়া ভয় পাইল। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে গেল। তখন আহ্লাদী চিৎকার করিল " তবেলো ছুঁড়ি ! রাজকুমারকে দিয়ে ভুঁড়ি ক'রেছ ; তাই ভয়ে পালাচ্ছিস "।

বনলতার দাদা সতীশ চন্দ্র ঘরে শুইয়াছিল। চীৎকার শুনিয়া " কেরে। " বলিয়া বাহিরে আসিল। তখন আহ্লাদী সতিশকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সতীশ একটা লাটি লইয়া তাড়া করিলে আহ্লাদী পলাইয়া গেল। রাস্তায় গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল :—

দাঁতে মিশি মধুর হাসি
বাবলা গাছে ফুল ফুটেছে

আমরণ ! আমায় মারতে আসে ! বনাই হয়েছে রাজপুত্র কিনা তাই অত তেজ !

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

দুঃখে সুখে প্রেমের এক মূর্ত্তি।

বনলতা এক-আকাশ-জ্যোৎস্না গণ্ডূষ করিতে গিয়াছিলেন। স্পর্শ না করিতে করিতে তাহা অন্ধকার হইল। জীবনের আশা, ভরসা, আনন্দ, শান্তি সব অন্তর্হিত হইল। নিজ জীবনই যেন সে অমৃতকে গরল করিল। দেহ বড় ভারি, নিশ্বাস বড় ভারি, প্রাণ বড় ভারি,—সবই যাতনাময়—আর সহ্য হয় না। দেহে প্রাণ নাই, মনে প্রাণ নাই, স্মৃতিতে প্রাণ নাই—দেহ মন স্মৃতি অসাড়। এই ভাবে হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাসে সংসার ভস্ম করিয়া পথে চলিতে চলিতে বনলতা যেন স্থির—যাইবার স্থল কোথায়? চারিদিকেই আগুণ—আলোক শূন্য ঘনীভূত আগুণের অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বনলতা আপনার গৃহদ্বার ভুলিয়া অনেক দূরে গিয়া,—আবার স্মৃতির বিদ্যুতে গৃহে ফিরিলেন। অন্যমনে অনিচ্ছায় শুষ্ক শূন্য ভাষায় একবার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সাড়া পাইয়া, সেভাব ভুলিয়া আপনার চাপে সংগ্রাম করিতে করিতে কোন প্রকারে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। তারপর বড় ভাইজের কাছে শুইয়া, আঁধারে দুঃখের তুফান তুলিতে লাগিলেন।

"বিধাতা কেন আমার সৃষ্টি করিলেন? আমার জীবনে তাঁর উদ্দেশ্য কি? দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে রাজপুত্রের রূপে মজাইবার

উদ্দেশ্য কি? বিধবা করিয়া আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন কেন? আঁধারেও তো কত ফুল ফুটিয়া বিলীন হয়? সমুদ্রেও তো কত রত্ন লুকাইয়াছেন! রাজপুত্রকে আমার চক্ষে আনিবার উদ্দেশ্য কি? যদি আনিলেন তো বঞ্চিত করেন কেন?”

আবার ভাবিতেছেন:—“যাতনার ভয় রাখি না। চক্ষের জল, দীর্ঘনিশ্বাস—এ সবের ভয় করি না। যদি পাই—এইখানে বনলতা আশার উৎসাহে কয়েক বিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন—হৃদয়টা যেন হঠাৎ বড় হইয়া স্বর্গ আচ্ছন্ন করিল! আবার ভাবিতেছেন:—

কিন্তু পাইবার বাকি আর কি? ঐতো রূপ দেখিতেছি—আঁধার সাগর অকস্মাৎ আলোকিত করিয়া ঐতো দিব্যরূপ জ্বলিতেছে!—আমার সুখ দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, ইহকাল পরকাল আলোকিত করিয়া, ঐতো বকুলেরতলে জ্যোৎস্না-স্বর্গকে আমোদিত করিয়া, আমার ভিতরে বাহিরে ঐতো রূপ জ্বলিতেছে! আমি চকোরিণীর মত ঐ রূপে উড়ি না কেন? লোকনিন্দাকে ভয় কি? সমাজকে ভয় কি? দুঃখ? কিসের দুঃখ? রূপের দর্শনে তো বঞ্চিতা নই! চাঁদ দেখিয়াই তো তৃপ্ত হয়। চক্ষুর সৌভাগ্য দেখিয়া কর্ণের হিংসা কেন? স্পর্শের হিংসা কেন? মনের হিংসা কেন? দেখিলেই কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় কেন? তাওতো শুনিয়াছি! সেই একটী কথা যেন সহস্র—জগৎ-ব্যাপী। তাঁর তিরস্কারের কথাও মিষ্ট! আমাকে আদর না করিয়া তিরস্কার করিয়াছেন! তাঁর পদ্মমুখের আদরে তিরস্কারে প্রভেদ কি? মনবুদ্ধি প্রভেদ দেখে, কিন্তু প্রাণ তো প্রভেদ দেখে না! তাঁর আলিঙ্গনও যা—প্রত্যাখ্যানও তা! তাঁর সম্মানও যা—নির্য্যাতনও

তা! এ সবে পার্থক্য দেখি কেন? ভাবনার এই স্থান হইতে প্রেমিকার মনে প্রাণে যেন একটী অমৃতস্রোত ছুটিল—প্রাণ পুলকিত—দেহ পুলকিত হইল! ঘরের আঁধারে বনলতা যেন চক্ষুদিয়া আনন্দপ্রেম স্পর্শ করিতেছেন! বনলতা ধীরে ধীরে কল্পনাবলে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া পুরাতন জগৎ ভুলিলেন। হঠাৎ সেই জ্যোস্না-সাগরে সেই সৌন্দর্য্য রত্নের নিকটে দাঁড়াইয়া আপনাকে সেইরূপে আহুতি দিতে দিতে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণাম করিলেন। স্তবের মোহে কত কি বলিলেন। একবার পা দেখিতেছেন! সে পাদপদ্ম যেন অনন্ত সৌন্দর্য্য সুখস্মৃতি—যত দেখেন ততই আনন্দ—ততই তৃপ্তি—ততই শান্তি!

হঠাৎ পিতা বাহির হইতে ডাকিলেন "বনলতা!"

আবার ডাকিলেন "বনলতা!"

আবার জোরে ডাকিলেন "বনলতা!"

তখন সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চমকিত হইয়া সেই জ্যোৎস্না-সাগরের পদ্ম হারাইয়া আপনাকে নিজগৃহে—নিজশয্যায় অনুভব করিয়া পিতার ডাক বুঝিয়া বনলতা চমকিতভাবে উত্তর দিলেন "কেন? কেন? বাবা!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রেমোন্মাদিনী।

বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা তিথি, রাত্রি দ্বিপ্রহর। চন্দ্রমা নীলাকাশের মধ্যস্থলে বসিয়া, আপনার প্রেমে বসুন্ধরাকে আনন্দ-ময়ী করিতেছেন। কীটপতঙ্গ প্রেম-গীত গাহিতেছে। পৃথিবীর মাটী জ্যোৎস্নায় সোণার মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। জলাশয়ের জল জ্যোৎস্নাস্পর্শে গলিত স্বর্ণের মত বোধ হইতেছে। জ্যোৎস্না যে পদার্থে পড়িয়াছে, তাহাই স্বর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুই একটা শৃগাল, কুকুর. ভোদড়, বিড়াল, এখানে ওখানে বিচরণ করিতেছে। অর্দ্ধ-জোৎস্নালোকিত শাখে বসিয়া পেচক অসন্তোষ-পূর্ণ শব্দে কলরব করিতেছে। খোলা জানালায় ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া চুপে চুপে কোন যুবতীর পালে বসিয়া আনন্দে নাচিতেছে।

এমনি সময়ে প্রকৃতির আনন্দে আপনার আনন্দ মিশাইয়া, অট্টালিকার জ্যোৎস্নাময় ছাদে বসিয়া আকাশের চাঁদ দেখিয়া, কাহাকে ভাবিতে ভাবিতে এক সুন্দরী যুবতী আপনার ভাবে বিভোর হইতেছে। সুন্দরী যুবতী যেদিকে চায় সেইদিকেই জ্যোৎস্না হাসিতেছে, কোথাও আঁধারের পাশে জ্যোৎস্না আনন্দে ঘুমাইতেছে। এদিকে ওদিকে, নীচে উপরে দেখিতে দেখিতে

অকস্মাৎ ছাদের নিম্নে কোটার ধারে বাঁধা রাস্তায় সুন্দরীর দৃষ্টি পতিত হইল। সুরকির রাস্তার দুধারে গাছের কাল কাল ছায়া জ্যোৎস্নার উপরে পড়িয়া বাতাসে কাঁপিতেছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সুন্দরী সেই ছায়ায় জগতের বিষয় ভাবিতেছে! হয়তো পুণ্যাত্মারা মৃত্যুর পর ঐ আনন্দপূর্ণ ছায়ার ভিতরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে পরমসুখে বিচরণ করে, গান গায়, নৃত্য করে। যুবতী সেই আলোকমিশ্রিত ছায়ারদিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ চমকিত হইল—এক আনন্দময় পুরুষ যুবতীর দৃষ্টিভেদ করিল। পুরুষ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতেছে। যুবতী সেই আলোকছায়া চিত্রিত সৌন্দর্য্যে আপনাকে হারাইতে হারাইতে ক্রমশঃ ছাদের আলিসার কাছে অজ্ঞাতে অগ্রসর হইতেছে। একটু একটু যত অগ্রসর হইতেছে ততই আনন্দ ঘন হইতেছে, বাহ্যজ্ঞান কমিতেছে। যুবতী আলিসার উপরে বসিল, সেই পুরুষের সেই রূপ আপাদমস্তক দেখিয়া বিভোর হইল, সেই মুখের দিকে চায় আর চক্ষু যেন পদ্মে ভৃঙ্গের মত মজিয়া যায় আর উঠিতে চায় না, পায়দিকে চায় আর দেবতার পায় ফুলের মত যুবতীর দৃষ্টি সেই পাদপদ্মে পড়িয়া থাকে আর স্থানচ্যুত হইতে চায় না, যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী সেই পুরুষের আকর্ষণে যুবতী, যেমন পূর্ণিমার আকর্ষণে সমুদ্রের জল উচ্ছ্বাসিত হয়, ঐ যুবার আকর্ষণে যুবতীর প্রেমসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইল—নশ্বর ক্ষুদ্র দেহও সেই প্রকাণ্ড প্রেমে আকর্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে যুবার দিকে সরিতে থাকিল। একটু একটু সরিতে সরিতে, সেই রূপে ডুবিতে ডুবিতে, সুখে পাগল হইতে হইতে, যুবতী ঝুপ্ করিয়া ছাদ হইতে ভূতলে পড়িয়াগেল। সর্ব্বনাশ! যুবা নিজ দৃষ্টির পাশে রূপের আভায়, দৃষ্টি ফিরাইয়া

চমকিয়া দেখে, এক অসামান্যরূপা যুবতী তার পার কাছে যেন আকাশের চাঁদ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথে, সেই জ্যোৎস্নামিশ্রিত বৃক্ষ ছায়ায় যুবার কাছে কি কোন অভিমানিনী উপর হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল? যুবতী জীবিতা, মৃতা কি মূর্চ্ছিতা? শাড়াশব্দ নাই; নড়ন চড়ন নাই, এই সব চিন্তা যুবাকে বড়ই কাতর করিল। যুবা কি পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে? ভয়ে যুবার বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছে, গা ঘামিতেছে, মুখ শুকাইতেছে, কথা ফুটিতেছে না, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া যুবা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল "আপনি কে?"

উত্তর নাই।

একটু জোরে জিজ্ঞাসিল "আপনি কে?"

উত্তর নাই।

যুবার ভয় হইল, বুঝি মরিয়াছে কি মূর্চ্ছিতা হইয়াছে, যুবা বড় সঙ্কটে পড়িল। অমন জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জ্জনে অমন সুন্দরীর অমন দশা দেখিলে কোন যুবার প্রাণ যুবতীর প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল না হয়? যুবা আশে পাশে চাহিল, একটু এদিক ওদিক অগ্রসর হইয়া দেখিল—কোথাও জনমানব নাই। বাটীর কর্ত্তার নাম ধরিয়া, যুবতীর ভাইএর নাম ধরিয়া যুবা অনেকক্ষণ ডাকিল, কাহারও শাড়া পাইল না, তখন আরো ভয় হইল, নিজেই যুবতীর শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত হইল, যুবতীর নাকের কাছে হাত দিল—নিঃশ্বাস মৃদু মৃদু বহিতেছে। হঠাৎ হস্তে উত্তপ্ত অশ্রু অনুভব করিয়া যুবার প্রাণটী চঞ্চল হইল। বুঝিল পতনের আঘাতে গুরুতর বেদনা পাইয়া যুবতী কাঁদিতেছে; হয়তো লজ্জায় কথা কহিতেছে না। যুবা কষ্টে সাহস একত্র করিয়া আবার জিজ্ঞাসিল

"আপনি বোধ হয় এ বাটীরই কেহ হবেন, লজ্জা ত্যাগ করুন, আমার সঙ্গে কথা কন ?"

যুবতীর কথা বাহির হয় না দেখিয়া যুবা ভাবিল, আঘাত গুরুতর, কোমরের পায়ের কি মাথার হাড় বোধ হয় ভাঙ্গিয়াছে, যুবার বড়ই বিপদ, নিকটের পুকুর হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিল, যুবতী একপেশে হইয়া পড়িয়া আছে, যুবা যুবতীর মুখের কাছে বসিল, যুবা কাপড় নিংড়াইয়া চক্ষের উপরে জলের ঝাপট দিতে লাগিল। তখন যুবতী এক দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগে মুখ সোজা করিল—জ্যোৎস্নাসাগরে সে মুখ পদ্মের মত ফুটিল। যুবতীর কোমর ফাটিয়া ছেঁচিয়া রক্ত পড়িতেছে, রক্তে মাটী ও কাপড় ভিজিতেছে, কিন্তু শোণিত অপেক্ষা চক্ষের জল অধিক পড়িতেছে, চক্ষের পার্শ্ব-দেশ ফুটা হইয়া শোণিতে অশ্রুতে মিশিতেছে ;—যুবা তাহা দেখিতে পাইল না। যুবতীর নিজ যাতনারদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, সে আঘাত কিছুই নহে, বরং আনন্দের সীমা নাই। যুবতী আজ যুবার কাছে যেন বিবাহের ফুলশয্যায় শুইয়া আছে। যুবার এক একটী প্রশ্ন যেন যুবতীর সুখসমুদ্র মন্থন করিতেছে—সেই প্রশ্নের শব্দে যুবতীর কর্ণ অমৃতে পূর্ণ হইতেছে। চক্ষে যুবার হাতের জল যেন স্বর্গের অমৃতধারা পড়িতেছে—যুবতী আনন্দে কাঁদিতেছে। পথে কি কোথায় সে জ্ঞান নাই ; যেন যুবার বুকে যুবতী শুইয়া আছে। যেন যুবার সোহাগে যুবতী প্রফুল্ল হইতেছে। সুন্দরী এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে একবার জ্যোৎস্নাপূর্ণ আকাশেরদিকে চাহিল—চক্ষের সম্মুখে দুটী চাঁদ—একটী কাছে, সেইটী আসল—একটী দূরে সেইটী নকল—দূরের চাঁদ নিকটের চাঁদের প্রতিবিম্ব।

আসল চাঁদের পানে চাহিবামাত্র যুবতীর জীবনের সকল আশা মিটিল, যাতনা অপমান সব সার্থক হইল, তখন সেই চাঁদের শোভায় আপনাকে সরস প্রফুল্ল আমোদিত করিতে করিতে প্রেমজড়িতস্বরে ধীরে ধীরে মন্ত্রপাঠ করিল "প্রাণনাথ!" যুবতীর মুখোচ্চারিত সে মন্ত্র যুবা স্পষ্ট শুনিল। সে স্বরের মধুতে একটু আর্দ্র হইল, একটু চেতনাশূন্য হইল। সেই রজনীর অসংখ্য মিষ্ট শব্দ মধ্যে যুবতীর অধরনিস্থত সেই শব্দ যুবাকে একটু উন্মত্ত করিল। যুবা সেই অমৃতাধার মুখ-পদ্মের দিকে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইল—আঁধারে বিদ্যুৎতরঙ্গের মত সেই রূপতরঙ্গ যুবার হৃদয় প্রাণ আলোকিত করিল,—যুবা ভয়ে চক্ষু ফিরাইল। যুবা অবনতচক্ষে ভাবিল "যিনি এ মুখ গড়িয়াছেন, না জানি তাঁর মুখ কতই সুন্দর!" আবার ভাবিল "আকাশের চাঁদে যদি তদুপযুক্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কপাল, গণ্ড, ভ্রূ, চুল, দন্ত এবং সুমধুর বাক্যাবলী থাকিত তো এ মুখের তুল্য হইত। ভাবিতে ভাবিতে যুবার চক্ষে জল আসিল, যুবা আর একবার সে চন্দ্রবদন দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে আপনার অশ্রুপূর্ণ নয়ন উত্তোলন করিল, মুখ একটু সরিয়া মুখের উপরিস্থ আকাশে শোভা বৃদ্ধি করিল। যেন আকাশের চাঁদ ভূতলের চাঁদকে দেখিতেছে। আকাশের চাঁদের জল ভূতলের চাঁদে পড়িল। তখন ভূতলের চাঁদ অমৃতস্পর্শে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই চাঁদ দেখিল—হঠাৎ দুই চাঁদ দৃষ্টিসূত্রে আবদ্ধ হইল। তখন প্রেমসৌন্দর্য্যময় জগতে এক উন্মাদ সুখের তরঙ্গ উঠিল, অস্তিত্বে তড়িত প্রবাহ ছুটিল, যুবা জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সেই জ্যোৎস্নাঘন রূপে আহুতি দিয়া, সেই সুন্দরীর রক্তিম অধরে, আপনার অস্তিত্ব ঢালিয়া, একটী চুম্বনে সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ডের সুখ ঘনীভূত করিল। সেই নিবিড়সুখে মধুপতিত মক্ষিকার মত চিরকাল পড়িয়া থাকিবার বাসনায় অভিভূত হই-তেছে এমন সময়ে সেই রূপের ভিতর হইতে, এক ভীষণ সর্প বাহির হইয়া যুবার মর্ম্মস্থলে দংশন করিল, যুবা মর্ম্ম যাতনায় অস্থির হইল। তখন বৈরাগ্যের আগুণ চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল। যুবা "ভগবান! রক্ষাকর" বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

এমন চুরি ধরিবে কে?

বনলতা ও কিরণশশী এক ঘরে একটী বিছানায় শয়ন করেন, সে ঘরে আর কেহ থাকে না, বনলতা মাঝে মাঝে আজ কয়েক মাস হইতে গভীর রাত্রে ছাদে উঠিতেছেন, ছাদে আলোকে বা অন্ধকারে বসিয়া কি ভাবেন, কিরণশশীর ঘুম ভাঙ্গিলেই, বনলতাকে বিছানায় না দেখিতে পাইয়া চঞ্চলা হন; অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চুপে চুপে ননদিনীর অনুসন্ধান করেন। আজ রাত্রে কিরণশশী ঘুম ভাঙিবার পর, বিছানায় বনলতাকে না পাইয়া তাড়াতাড়ি ছাদে গেলেন, আকাশের জ্যোৎস্না দেখিয়াই বুঝিলেন, পোড়ারমুখী চাঁদের আগুণে পুড়িতে ছাদে গিয়াছে। কিরণশশী ছাদে গেলেন, ছাদ আলোকে হাসিতেছে, বনলতা কই? ছাদে ভাল করিয়া দেখিলেন, মাথায় বাজ পড়িল। কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে আসিয়া সদর দরজা খিড়কী দরজা বন্ধ দেখিলেন; ভয় বিস্ময় আরো বাড়িল। আবার ছাদে গেলেন—ভাল করিয়া দেখিলেন। আলিসার ধারে গিয়া রাস্তায় দৃষ্টিক্ষেপে দেখিলেন, কে শুইয়া রহিয়াছে। বনলতার রূপে চাঁদের আলো—এমন বস্তু সহজেই চিনিলেন। তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন "ঠাকুরঝি!"

শাড়া না পাইয়া, কিরণ ভয়ে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে নীচে আসিয়া শাশুড়িকে উঠাইলেন। শাশুড়ি শুনিয়া "হাউ মাউ" করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শ্বশুর বনলতার বাপ "কি ? কি ?" বলিয়া ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিলেন। সতীশও উঠিলেন, তখন ক্ষুদিরাম, সতীশ ও বনলতার মা তিনজনে তাড়াতাড়ি রাস্তায় গিয়া, বনলতাকে পতিতা দেখিয়া ভয় পাইলেন, মা কাঁদিয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি মেয়ের গায়ে হাত দিয়া বুঝিলেন—প্রাণ এখনও আছে। আঘাত গুরুতর, রক্তে কোমরের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। ধরাধরি করিয়া বনলতাকে বাড়িতে আনা হইল। পাড়ার আর কেহ সে ঘটনা জানিল না। বনলতা একমাস পরে বেশ সুস্থ হইলেন।

কিরণশশীকে বনলতা বলিয়াছিলেন "আলিসায় বসিয়া চাঁদ দেখিতে দেখিতে ঘুমের ঘোরে পড়িয়াছিলাম।"

কিরণ তাহাই বিশ্বাস করিল, বনলতার মা বলিল "তা নয়! সমস্ত মেয়েকে একলা পেয়ে ভূতে ফেলিয়া দিয়াছে।"



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ব্রহ্মা বিষ্ণু জ্বর জ্বর মানুষতো ছার।

মুখের যে স্থান দিয়া সুন্দরীর মুখচুম্বনে রাজকুমার অমৃত পান করিয়াছিলেন, মুখের সেই স্থানে সেই অমৃত গরল হইয়া অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করিল। আত্মার অনুভূতি শক্তি দেহের অন্যান্য স্থান পরিত্যাগে সে স্থানে ঘন হইয়া এক ভীষণ নরকযন্ত্রণার সৃষ্টি করিল। বিবেকের সহিত সে স্থানের একটা ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বিবেক সে স্থানকে আকাশে বিলীন করিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে অসাড়তার সঞ্চার করিল, কিন্তু সেস্থান বিলীন হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাতনায় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে যাতনাগ্নি ধুঃ ধুঃ জ্বলিয়া, সমস্ত অস্তিত্বকে পুড়াইতে থাকিল। স্পর্শ শক্তিতে আগুণ জ্বলিলে সমস্ত শক্তিই যেন পুড়িতে থাকে; কারণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্পর্শ শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত নরক কটাহবৎ বোধ হয়। জীব [illegible] এই নরক কটাহে দগ্ধ হইলে, তার পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবের অনুতাপানলে ইন্ধনবৎ জ্বলিতে থাকে অর্থাৎ পাপ-যাতনায় সমস্ত জগৎ যাতনাময় বোধ হয়, তখনি পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়; এবং সেই অগ্নিনির্ব্বাণে চিরশান্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল মানসিক যন্ত্র বিকৃত হইবে বলিয়া, প্রেমস্বরূপ ভগবান, তাকে এই বিরাট যাতনায় নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে

একটু পুড়াইতে থাকেন। একবারে পূর্ণমাত্রা আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

রাজপুত্রের অনুতাপবহ্নি পর্য্যাপ্ত সীমায় পঁহুছে নাই, কিয়দ্দূর বর্দ্ধিত হইয়াই কমিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সে আগুণ নিবিয়া গেল।

একদা পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধ ও পাখীর সঙ্গীত সম্ভোগে, সেই পূর্ণিমা-রাত্রির অমৃতময়ী-মূর্ত্তি-স্পর্শের কথা যুবরাজের মনে জাগ্রত হইল। চাঁদ যেমন আপনার স্বর্ণকান্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া, পৃথিবীকে অমৃতময়ী করে, বনলতার রূপ যুবার হৃদয়, মন, প্রাণকে সেই প্রকারে আচ্ছন্ন করিল। যুবা সেই রূপমোহে আচ্ছন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন :—সুন্দরীর মুখচুম্বনের পরই চলিয়া আসিলাম কেন? ভয় পাইয়া গৃহে ফিরিলাম কেন? সেই রূপ জ্যোৎস্নার মত, ফুলের সৌরভের মত; আমার অস্তিত্বকে উন্মত্ত করিতেছে। এই জীবনে কত পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাসুন্দরীকে সম্ভোগ করিয়াছি; তখন পূর্ণিমার যৌবন সঞ্চার হয় নাই; কিন্তু সে দিন রাত্রে বনলতার সংযোগে যেন জ্যোৎস্নার পূর্ণ যৌবন ফুটিয়া উঠিল। আহা! কি প্রাণ মাতান কান্তি! জলস্থল আকাশ সে রূপ জড়াইয়া মাতাল হইয়া আনন্দের গীত গাহিতেছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল সব যেন নিদ্রারঘোরে সেই রূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। সেই আলোক ও ছায়ার লীলাখেলার মধ্যে, বনলতা রাত্রির শোভাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, কি জ্যোৎস্না-ময়ী রাত্রি, অলঙ্কার বিহীনা বনলতার শোভাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার করিলে, বোধ হয়, বনলতা কর্ত্তৃক রাত্রির শোভাই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জ্যোৎস্না যে স্থলে পড়ে,

সে স্থলকে স্বর্গ করিয়া তুলে। নীল জলে জ্যোৎস্না কর্ত্তৃক স্বর্গ-সৃষ্টি দেখিয়াছি, সে শোভার মদিরা পান করিয়াছি। বৃক্ষপত্রের বুকে জ্যোৎস্নার স্বপ্নাবেশ দেখিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি; প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়ির উপরে, পার্শ্বে জ্যোৎস্নার প্রেমাবেশ দেখিয়া জীবন ধন্য করিয়াছি। কিন্তু সেই যুবতীর চাঁদপানা মুখে জ্যোৎস্নার যৌবন কান্তিতে যে মদিরা পান করিয়াছি, এমন আর কোথাও নহে। আমি যৌবনের প্রথম উন্মেষে কত সুন্দরীকে বুকে ধরিয়া জ্যোৎস্নাসাগরে স্নান করিয়াছি, বায়ুভরে বৃক্ষপত্রের সঙ্গে তালে তালে তাহাদের কেশগুচ্ছের নৃত্য দেখিয়া, কামোন্মত্ত হইয়া, পশুধর্ম্মের সেবা করিয়াছি। কিন্তু সেই রমণীর সহবাসে জ্যোৎস্নার সুষমার যে পূর্ণমাধুরি ও পবিত্রতা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যেন আমার চৈতন্য নূতন অমৃতে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। সুখের জন্য কি দুঃখের জন্য জানি না, আমি সে সময়ে আমার জীবনের সমস্ত প্রেম ঢালিয়া সেই জ্যোৎস্নাসাগরের প্রফুল্ল মুখপদ্মে চুম্বন করিয়া, যেন সুখের অনন্ত সমুদ্রকে মুহূর্ত্তমধ্যে গণ্ডূষ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সেই পদ্মের সৌন্দর্য্য হইতে পরস্ত্রীরূপী কালসর্প বাহির হইয়া, তাহার বিষে, আমার ক্ষীর সমুদ্রকে গরলময় করিয়াছিল। সেই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, প্রাণভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। প্রজ্বলিত মাণিকের তলে সর্পফণা দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেস্থান যমবৎ পরিত্যাগ করিলাম।"

"ভাল হউক, আর মন্দই হউক, যেমন গ্রীষ্মে পুষ্পোদ্যানে বারিপাতের পর বাতাস ফুলের গন্ধে আকুল করে, সেইরূপ অনেক কান্নার পর আমার কল্পনা সেই রূপের সৌরভে পূর্ণ হইয়া, আমাকে আকুল করিতেছে। ফুলে যদি কেবল রূপই থাকিত,

তো, কে ফুলকে নাসিকায় স্পর্শ করিত? দূর হইতে দেখিলেই লোকের তৃপ্তি হইত, চাঁদে কেবল রূপ আছে, তাই লোকে দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু চাঁদে যদি রূপের অনুরূপ সৌরভ থাকিত তো কি হইত? বনলতা কেবল রূপবতী নহেন—বনলতা সৌরভবতী। সে রূপ প্রেম জড়িত—দেখিলে মানুষ প্রেমাকুল হয়। আমি সেই সুন্দরীকে যতই চিন্তা করি, ততই যেন জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ, হাহাকার সব প্রেমাকার হইয়া আমাকে পবিত্র আনন্দরসে নিমগ্ন করে। কেবল আমার জন্য তার অতৃপ্ত প্রেমলালসার বিষয় ভাবিলে, যেন তৎক্ষণাৎ সুখের সাগর শুকাইয়া আসে, এবং আমার এই প্রেমভাবকে পাপ বলিয়া বোধ হয়।

কতবার সে রূপকে ভুলিতে প্রয়াস করি, কিন্তু পঙ্কমগ্ন ব্যক্তির উত্থান চেষ্টার মত আমি ক্রমশঃ ঐ রূপে ডুবিয়া যাই। আহা! ক্ষীণপ্রাণ মানব সামান্য রমণীর যৌবনপ্রভাব এড়াইতে পারে না; আমি সেই মানব হইয়া, জ্যোৎস্নার যৌবন স্বরূপিনী সেই রমণীকে কি প্রকারে ভুলি? সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ প্রস্ফুটিত গোলাপ, আপনার যৌবনকান্তি বায়ুকে সমর্পণ করিলে, জড়বায়ু তাহাকে চুম্বন আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না; আর আমি চেতন বস্তু হইয়া, রূপোদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুসুমকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে দেখিয়া, কিপ্রকারে স্থির থাকিতে পারি! শুনিয়াছি মানুষ সিদ্ধ হইলে কামনাশূন্য হয়; কিন্তু আমার তাহা বিশ্বাস হয় না, কারণ মহাসিদ্ধ সদাশিব শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তিতে কামাতুর হইলেন কেন? যে শক্তি লঘু দ্রব্য তুলিতে পারে, তাহা কখনই পাহাড়কে তুলিতে পারে না। পাহাড়কে তুলিবার মত বড় শক্তির

প্রয়োজন, কিন্তু সে ব্যক্তিকে কামোন্মত্ত করিবার উপযুক্ত রূপবতী আর কোথাও থাকিতে পারে না নহিলে সহরের অগণিত সুন্দরী ভোগে রূপস্পৃহা শান্ত হইবার পর, আবার ওরূপ দেখিয়া, উন্মত্ত হই কেন? কামনা এত বৎসরে পূর্ব্বের অসভ্যমূর্ত্তি পরিত্যাগে সভ্যমূর্ত্তি ধরিয়াছে মাত্র; নীচকাম পবিত্র প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে মাত্র। ইহা কামিনীস্পৃহা—কামিনীপ্রেম—কামের উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি এখন কি করি? পরস্ত্রী সম্ভোগ তো চৌর্য্য—ব্যভিচার—মহাপাপ। কিন্তু নয়বৎসরের বালিকা, তো, আপনাকে স্ত্রীভাবে কখনও কাহারও কাছে বিক্রয় করে নাই! সমাজ বন্ধন! উঃ কি ভয়ানক! সমাজধর্ম্ম! উঃ! কি ভীষণ প্রতিবন্ধক! এইখানেই সর্ব্বনাশ! উঃ! কোথাও যদি পালাই! জনসমাজ ছাড়িয়া, অরণ্যে—নিবিড়বনে দুইজনে ঘুঘুর মত—চক্রবাকচক্রবাকীর মত যদি জীবনপাত করি? তাহাতে দোষ কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা কি? অনেক দিন হইতে বামদেব স্বামীর নাম শুনিতেছি। তিনি নাকি মৃতকে প্রাণ দেন! অন্ধকে চক্ষু দেন, কত সাধুলোক এই কথা বলেন! তাঁরা কি মিথ্যাবাদী! একদিন তাঁর কাছে যাই, এ সব কথার মীমাংসা বোধ হয় তিনি করিতে পারিবেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য যেদিন উদ্যোগ করি, সেদিন একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়। এবারে কোন বাধা মানিব না, নিশ্চয়ই যাব।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বিবাহের সম্বন্ধ।

রাজা যশোদানন্দন পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন বিজ্ঞদের মধ্যে অনেকে রাজা মহাশয়কে বুঝাইলেন "অনেকে মুে বলে বিবাহ ক'রব না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব ইচ্ছা থাবে আপনি বিবাহ স্থির করুন; আর জ্ঞানদা বিদ্বান, সচ্চরিত্র, আপনা অমান্য কখনও ক'রবে না।" কেহ বলিলেন "সন্ন্যাসী হওয় মুখের কথা কিনা? এমন রাজ্যসম্পত্তি ছেড়ে কবে কে সন্ন্যাসি হ'য়েছে বলুন দেখি? দুই একটা বোকা বাঁদর থাকে, শনি দৃষ্টিতে রাজ্য ছাড়ে—যেমন বুদ্ধদেব!" দুই একজন রাজপুত্রে বিশেষ বন্ধু রাজা মহাশয়কে বলিলেন "মহাশয় বিবাহ দিবেন না।" ইহাতে তাহাদের বড়ই নিন্দা হইল। অনেকে বলিল "রাজপুত্রে বিবাহ না হ'লে ওঁদের বিষয় ভোগ দখলের সুবিধা হয়—মে ক'রেছেন রাজপুত্রের সঙ্গে দান খয়রাৎ ক'রে বিষয়টা ন ক'রবেন।"

যাহা হউক রাজা পুত্রের বিবাহের পাত্রীর জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কত রাজা, জমিদার, জজ, ম্যাজি

ষ্ট্রেট্ রাজপুত্রকে মেয়ে দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উমেদারি করিতে লাগিলেন। কত দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপন আপন পরমাসুন্দরী মেয়েকে রাজবাটীতে রাজার খরচে পাল্কি করিয়া আনিয়া অন্দরমহলে দেখাইতে লাগিলেন। রাণী একটী মেয়েকে পসন্দ করিয়া রাখিলেন, মেয়েটী পরমাসুন্দরী—বয়স ১৫ বৎসর। মা ও মেয়ে কয়েক মাস অন্দরে থাকিলেন, মেয়ের বাপ বাহির বাটীতে থাকিলেন। তারপর রাজার কর্ত্তকটা পসন্দ হওয়ায় স্বতন্ত্র বাড়িতে পিতা মাতা ও কন্যাকে দাস দাসীর বন্দবস্ত করিয়া দিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

মেয়ে পার্লিয়ামেণ্ট।

অন্দরে রাণী স্বর্ণসুন্দরী, রাণীর বড় ভগিনী (অন্য এক রাজার রাণী) হর সুন্দরী এবং অন্যান্য পরমাসুন্দরীগণ রাণীর ঘরে বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। স্বর্ণসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন, "দিদি! জ্ঞানের তো বেতে মত দেখিনা!"

হ। কিসে বুঝলি ?

স্ব। না বুঝলে এত দিন ছেলেকে আইবুড় রাখি।

নিস্তারিনী—রাণীর মাসতুতজা—বয়স পঁচিশ বৎসর, তিনি একটু বিজ্ঞতা প্রকাশে বলিলেন "দিদি! জ্ঞানদার কাছে প্রমদাকে মাঝে মাঝে পাঠাও। সুন্দরীর রূপে মহাদেব মজেন, মানুষ তো ছার।"

কথাটা অনেকেরই মনে লাগিল। তখন অন্য রাণী হরসুন্দরী বলিলেন " নিস্তারিনীর বুদ্ধিতে বোধ হয় এ সঙ্কটে নিস্তার হবে।"

তখন চাঁদবদনে, চাঁদবদনে, মুক্তাপংক্তিতে, মুক্তাপংক্তিতে একটা ভুবন মোহিনী হাসির সুর উঠিল। হাসি কমিলে রাণী স্বর্ণসুন্দরী একটু গম্ভির হইয়া " হাসির কথা নয়, কি পরামর্শ ঠিক কর, কার কত বুদ্ধি এইবার বোঝা যাবে। রাজা বলেছেন তোমাদের স্ত্রী বুদ্ধির জোরটা এইবার বোঝা যাবে। সেই জন্যই দিদিকে আনেয়েছি"।

দিদি বলিলেন " তোমার ভগ্নি পতির মুখ না দেখলে দিদির বুদ্ধি টুদ্ধি খুলবেনা "।

তখন আর এক রূপসী বলিলেন " নিস্তারিনীর কথাটা মন্দ নয় "।

রাণী। তোরা ছেলে মানুষ! একি সাহেবদের সমাজ যে কোর্টসিপ্ হবে!

তখন ষোড়শী হেমন্তকুমারী—রাজার ভাগিনেয়ী বলিলেন " মামী! কোর্টসিপ্ সে কেমন?

রাণী বলিতে লাগিলেন " এই সেদিনে আমাদের বাটীতে একটা মেদী গেঁরেবাজ এসেছে দেখিসনি। পায়রা গুলো যেমন ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে জোট্ ধরে আনে—সাহেবরাও সেই রকম ঘুরে ঘুরে মেম্ ধ'রে আনে "।

তখন নিস্তারিনী বলিলেন " তা আর খারাপ কি? আমাদের মা বাপ জোট বাধয়ে দেয় আর তারা নিজেরা বাঁধে—যেমন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা। হেমন্তকুমারি মুক্তাদন্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন " স্বয়ম্বরা হয় না "?

রাণী বলিলেন " বিবিদের স্বয়ম্বরা বের পরে হয় "।

তখন চাঁদে চাঁদে বাদ্যধ্বনির মত—হাস্যধ্বনি উঠিল। সে ধ্বনি থামিলে হেমন্ত, নিস্তারিনী, বিনোদিনী, সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন " বের পর স্বয়ম্বরা কেমন "?

রা। তা জানিসনা! আমাদের পরপুরুষের সঙ্গে কথা কহার নিয়ম নাই—কহিলে সর্ব্বনাশ। কিন্তু মেমেদের যত উল্টো। আমরা স্বামীর বশ, আর সাহেবেরা মেমেদের বশ। মেম যা বলে সাহেব তাই করে।

নিস্তারিনী বলিলেন " ওমা ! ওদের তবে মেম ভাতার, আর সাহেব মাগ "।

রাণী। সেই রকমই বটে ! তবে সাহেব চাকুরি করে মেম ঘরে সাহেবের টাকা লইয়া যা ইচ্ছা তাই করে।

হেমন্ত। যা ইচ্ছা তাই কি"?

রাণী। সেই কথাইতো হ'চ্ছে ?

নিস্তারিনী। তাই বল বল শুনি—বের পর স্বয়ম্বরা কি ?

রাণী। সাহেব বাহিরে গেছে, মেম ঘরে আছে, এমন সময়ে এক জন সাহেব মেমের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এল। মেম অভ্যর্থনা ক'রে, সাহেবকে আপনার ঘরে ল'য়ে গেল। দুজনে কত আনন্দ, গল্প, হাসি, মদ, চুরোট, লিমনেড্ খাওয়া হ'চ্ছে। আর মেম আনন্দে ডগমগ হ'য়ে সাহেবের গলা ধ'রছেন। সাহেব আর কি থাকতে পারেন, তিনিও মেমের মুখে চুমো খাচ্ছেন—

নিস্তারিনী ও হেমন্তকুমারি তখন হাসিতে হাসিতে দুজনে ঢলাঢলি করিতে লাগিলেন।

"আ পোড়ার মুখ ! হাসবি না শুনবি'?"—এই কথা বলিতে বলিতে দুজনের পিটে চাপড় মারিলেন। নিস্তারিনী ও হেমন্ত তখন হাসি সামলাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "তারপর ?"

রাণী। তারপর আবার কি? সাহেব মেম গলা ধরাধরি ক'রে স্বয়ম্বরা হ'চ্ছে।

তখন সকল স্ত্রীলোক যথা হেমন্ত, বসন্ত, নিস্তারিনী, রামমণি, বিনোদিনী, হাসির তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। খানিক হাসির পর হেমন্তকুমারি জিজ্ঞাসিলেন "তা সে পোড়ার মুখো ভাতার তখন কোন চুলোয় ?"

দিদি বলিলেন " তোমার ভগ্নি পতির মুখ না দেখলে দিদির বুদ্ধি টুদ্ধি খুলবেনা "।

তখন আর এক রূপসী বলিলেন " নিস্তারিনীর কথাটা মন্দ নয় "।

রাণী। তোরা ছেলে মানুষ! একি সাহেবদের সমাজ যে কোর্টসিপ্ হবে।

তখন যোড়শী হেমন্তকুমারী—রাজার ভাগিনেয়ী বলিলেন " মামী! কোর্টসিপ্ সে কেমন ?

রাণী বলিতে লাগিলেন " এই সেদিনে আমাদের বাটীতে একটা মেমী গেরেবাজ এসেছে দেখিসনি। পায়রা গুলো যেমন ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে জোট্ ধরে আনে—সাহেবরাও সেই রকম ঘুরে ঘুরে মেম্ ধ'রে আনে "।

তখন নিস্তারিনী বলিলেন " তা আর খারাপ কি ? আমাদের মা বাপ জোট বাধয়ে দেয় আর তারা নিজেরা বাঁধে—যেমন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা। হেমন্তকুমারি মুক্তাদন্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন " স্বয়ম্বরা হয় না " ?

রাণী বলিলেন " বিবিদের স্বয়ম্বরা বের পরে হয় "।

তখন চাঁদে চাঁদে বাদ্যধ্বনির মত—হাস্যধ্বনি উঠিল। সে ধ্বনি থামিলে হেমন্ত, নিস্তারিনী, বিনোদিনী, সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন " বের পর স্বয়ম্বরা কেমন " ?

রা। তা জানিসনা! আমাদের পরপুরুষের সঙ্গে কথা কহার নিয়ম নাই—কহিলে সর্ব্বনাশ। কিন্তু মেমেদের ঠিক উল্টা। আমরা স্বামীর বশ, আর সাহেবেরা মেমেদের বশ। মেম যা বলে সাহেব তাই করে।

নিস্তারিনী বলিলেন " ওমা! ওদের তবে মেম ভাতার, আর সাহেব মাগ "।

রাণী। সেই রকমই বটে! তবে সাহেব চাকুরি করে মেম ঘরে সাহেবের টাকা লইয়া যা ইচ্ছা তাই করে।

হেমন্ত। যা ইচ্ছা তাই কি?

রাণী। সেই কথাইতো হ'চ্ছে?

নিস্তারিনী। তাই বল বল শুনি—বের পর স্বয়ম্বরা কি?

রাণী। সাহেব বাহিরে গেছে, মেম ঘরে আছে, এমন সময়ে এক জন সাহেব মেমের সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। মেম অভ্যর্থনা ক'রে, সাহেবকে আপনার ঘরে ল'য়ে গেল। দুজনে কত আনন্দ, গল্প, হাসি, মদ, চুরোট, লিমনেড্ খাওয়া হ'চ্ছে। আর মেম আনন্দে ডগমগ হ'য়ে সাহেবের গলা ধ'রছেন। সাহেব আর কি থাকতে পারেন, তিনিও মেমের মুখে চুমো খাচ্ছেন—

নিস্তারিনী ও হেমন্তকুমারি তখন হাসিতে হাসিতে দুজনে ঢলাঢলি করিতে লাগিলেন।

"আ পোড়ার মুখ! হাসবি না শুনবি?"—এই কথা বলিতে বলিতে দুজনের পিটে চাপড় মারিলেন। নিস্তারিনী ও হেমন্ত তখন হাসি সামলাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "তারপর?"

রাণী। তারপর আবার কি? সাহেব মেম গলা ধরাধরি ক'রে স্বয়ম্বরা হ'চ্ছে।

তখন সকল স্ত্রীলোক যথা হেমন্ত, বসন্ত, নিস্তারিনী, রামমণি, বিনোদিনী, হাসির তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। খানিক হাসির পর হেমন্তকুমারি জিজ্ঞাসিলেন "তা সে পোড়ার মুখো ভাতার তখন কোন চুলোয়?"

রাণী। তিনিও আর একজনের মেমকে নিয়ে ঘরঘরা ক'রছেন।

হেমন্ত। সে সাহেব যদি এমনি সময়ে এসে ধ'রে ফেলে—তা হ'লেইত সর্ব্বনাশ!

রাণী। আমরণ! তাও জাননা? মেম-সাহেব যখন ঘরের ভিতরে অন্য সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে তখন স্বামীর সে ঘরে যাবার হুকুম নাই। সাহেব যদি এসে পড়েন, তো, মেমের হুকুম নিয়ে তবে ঘরে যেতে হবে। যদি সাহেব মেমের অনুমতি না নিয়ে' সে ঘরে যান, তো, মেম আর সাহেবকে নিয়ে ঘর ক'রবেনা।

তখন নিস্তারিনী—মুখে আগুণ! মুখে আগুণ! উঁরাই আবার সভ্য!

অন্নরাণী, বিনোদিনী, প্রভৃতি "মুখে আগুণই বটে" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হেমন্তকুমরি জিজ্ঞাসিলেন "মামি! তা পোড়ার মুখো সাহেব তখন বাহিরে ব'সে কি করে?"

রাণী। ব'সে ব'সে ছুলো তাড়ায় আর কি করে?

এইবার হাসির ঝড় উঠিল, এ ওর গায়ে পড়ে—এ ওর গায়ে ঠেলা মারে। গায়ে পড়ে—ঠেলা মারে আর "ছুলো তাড়ায়" বলিয়া হাসিয়া আকুল হয়।

হাসি কমিলে, নিস্তারিনী ও হেমন্তকুমারি আবার উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ছুলো তাড়ানটা কি?"

জিজ্ঞাসিয়াই আবার হাসি। রাণী বলিতে লাগিলেন। হেমন্ত ও নিস্তারিনী রাণীর কাছে সরিয়া কথা যেন গিলিবার মত করিয়া বসিলেন।

রাণী। হুলো বেরাল জানিসনা? একটা মেয়ে বেরালের পিছনে কত হুলো বেরাল অর্থাৎ পুরুষ বেরাল লাগে। সেই মেয়ে বেরালের জন্য হুলোতে হুলোতে ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তি হয়। সাহেবদের দেশে এই রকম মানুষে মানুষে হয়। একজনা সুন্দরীর জন্য হুলোতে হুলোতে ঝগড়া হয়—রক্তারক্তি হয়। যখন মেম অন্য সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে, তখন "ভাতার সাহেব" বাহিরে যদি সাহেবকে মেমের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য আসিতে দেখে, তো, সেই সাহেবকে ভদ্র কথায় তাড়াইয়া দেয়। এই হচ্ছে "হুলো তাড়ান"।

অন্য রাণী বলিলেন "হ্যা স্বর্ণ! সাহেব গুলো গলায় দড়ি দিয়ে মরেনা কেন? ওদের ঘরে সুখ তাহ'লে তো নাই?

রাণী। ঐ উপরে চ্যাপান চ্যাপান ভিতরে খড় গাছটা সাহেব-দের ঘর কান্নাও তাই দিদি! জ্ঞান আমার সাহেবদের উপরে এই জন্য চটা। এক সাহেব জ্ঞানকে তার সুন্দরী ব'নকে বে করবার কথা ব'লেছিল শেষে পেড়া পিড়ি তিনি আবার কমিশনর। বড় পেড়া পিড়ি দেখে জ্ঞান পত্র লিখেছিল "যদি সসাগরা সাম্রাজ্য দাওতো মেম বিয়ে ক'রবোনা। সাহেবদের অনেক গুণ কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে সব দোষ, তা না গেলে সাহেবদের দেশ উচ্ছন্ন যাবে। আমরা হিন্দু, আমাদের সকল দোষে আমরা স্ত্রীলোকের গুণে বেঁচে আছি। সাহেব! আমাদের দেশে হাড়ি বাগদির মেয়ে, তোমাদের দেশের বড় ঘরের মেয়ে চেয়ে ভাল। যদিও আমরা পরাধীন দুর্ব্বল কিন্তু সতী স্ত্রী, সতী ভগিনী, সতী জননী, যদি কোন দেশে থাকেতো ভারতে আছে। ভারতের স্ত্রীর মত সর্ব্বগুণবতী স্ত্রী আর কোন দেশে নাই। আমরা যদি আবার উঠি, তো, এই

সতী সাধ্বীদের গুণেই উঠিব। তোমরা আমাদের দেশে বিলাতী কাপড়, জুতা, ছাতা আনিয়া আমাদের উপকার কর কি অপকার কর জানিনা; কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের "সতীত্ব" কথা যখন তোমাদের দেশে যাইবে এবং তোমরা তাহা বুঝিবে, তখন তোমরা এক নূতন জাতি হবে। আরো যে কত লিখেছিল, তাকি মনে আছে, সাহেব পত্র প'ড়ে অবাক, আহা! জ্ঞানর আমার এত বুদ্ধি গো! বিয়ের নামেই জলে যায়।

হেমন্তকুমারি বলিলেন "আমার বোধ হয়, কোন স্ত্রীলোক দাদাবাবুকে অশুধ ক'রেছে।"

"দূর আবাগী" বলিয়া রাণী হেমন্তের পিটে চড় মারিলেন। তারপর রাণী বলিলেন "এরকম গোলমাল ক'রলে তো হবেনা।"

অন্তরাণী বলিলেন "ছুঁড়ি গুলোকে তাড়য়ে দাও।"

তখন হেমন্ত ও নিস্তারিনী সুন্দর সুন্দর হাত জোড় করিয়া কাতর ভাবে বলিলেন "না গো না, আমরা আর একটী কথা কবনা।"

তখন রাণী গম্ভীরভাবে বলিলেন "হিন্দুর ঘরের অমন সমত্ত মেয়েকে সমস্ত ছেলের কাছে পাঠান কি ভাল? যদি ছেলে, ও মেয়েকে বে না করে, তো, মেয়েটার ইহকাল পরকাল নষ্ট হবে। আর আমাদের, ধর্ম্মের কাছে দোষী হ'তে হবে।

অন্ত রাণী বলিলেন "আমি বলি দিনের বেলা তুমি মেয়েটাকে সঙ্গে ক'রে, জ্ঞানর কাছে ব'সো, ব'সে গল্প টল্প করু—মেয়েটী কখনও কখনও জ্ঞানকে পানটী দিক, গায়ে মাজে খাজে বাতাস করুক—তোমার সামনে এতে আর দোষ কি?

রাণী বলিলেন "মন্দ কথা নয়, তোরা কি বলিস গো! তখন সকলেই সেই কথায় সায় দিল।

হেমন্ত বলিলেন "মেয়ের যে রূপ, দাদাবাবু একবার দেখলেই ভুলে যাবেন।"

তাই তোর মুখে মা! ফুল চন্দন পড়ুক। তাই রাজাকে বলি। মহল দেখতে গিয়েছেন—দুই চারিদিন পরে আসবেন।

সাহেবদের সমাজের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাণীর ভগিনী অন্নরাণী বলিতেছেন "তা এদেশে অনেক বাঙ্গালী সাহেব সাজে কেন? মাগকে মেম সাজায় কেন? তারা তো অনেক লেখা পড়া শিখেছে?

স্বর্ণ বলিলেন "জ্ঞান বলে, যারা বিলাত হ'তে সাহেব হ'য়ে আসে তারা বড় হতভাগা। দেশে এসে সমাজ পায়না। সাহেব মহলেও আদর পায়না বরং ঘৃণা বিদ্বেষ পায়। বাঙ্গালী সাহেব, কোন রকমে কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থেকে সময়টা কাটিয়ে দেন; কিন্তু তাঁর বাঙ্গালিনী মেম মহাশয়ার বড় কষ্ট। ভাল ইংরাজী জানেননা যে, মেমেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কবেন। আর ঐ ছলোর ভয়—ওমা! সেদিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিল জজ্ সাহেবের মাগ, কেঁদে মরে, বলে দিদি! আমায় জোর ক'রে সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়ায়। আবার বলে, ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবের স.ঙ্গ বেড়াতে ভয় কি? আমি বলি, বাঘের মুখে যেতে পারবো— পরপুরুষের সঙ্গে ব'সতে কি বেড়াতে পারবোনা।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তা অনেকে তো যায়।"

তা বলে "যায় বটে! খুব কম। আমাদের সাহেব এখন একটু সেয়ানা হ'য়েছেন—এখন এক এক দিন বলেন "কি ঝকমারি

ক'রেই বিলাত গেছলাম—দেশে দুশত টাকার চাকুরি ভাল ছিল যা পাই সবই খরচ হয়। অথচ মানুষের যা আসল সুখ—সামাজিক সুখ তা কিছুই নাই। দেশের লোক জাত যাবার ভয়ে মেশেনা—সাহেবরাও "কালা বাঙ্গালী" বলে মনে মনে ঘৃণা করে।

তা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তা টাকা তো খুব ক'রেছ? একথা শুনে হেসে বলে "আরে অদৃষ্ট! দুহাজার টাকা মাইনের মধ্যে বাড়িভাড়া একশত টাকা, চাকরের মাহিনা একশত টাকা, খরচ পাঁচশত টাকা এই তো গেল সাতশত টাকা। তারপর দাদাবাবুকে পুরি খরচ দুইশত টাকা গেল নয়শত টাকা। থাকে

"দূর আবাগী" তার মধ্যে দেশে বাপকে দেন দুইশত টাকা,

তারপর বাগী —, মামাকে কুড়ি টাকা, বুড়ো পিসীকে দশ

থাকে কি? মাঝে মাঝে ডারজিলিঙে, সিমলায়

অন্তরাটি খরচ। আবার দুই ছেলেকে বিলাতে মাসে পাঁচশত

কা ক'রে পাঠাতে হয়। এই পনের বৎসরে নিজেদের একটা বাড়ি হ'লনা। দুচক্ষু যদি মোদেন তো আমি যে কোথাই দাঁড়াই—তার যায়গা নাই।

আমি বলিলাম "তা ছেলে দুজনে লায়েক হ'লে, আর ভাবনা কি? তাতে সে বলে "দিদি! হিন্দুর ঘরের ছেলে মাবাপকে ভাত দেয়, তারা না হিন্দু না খৃষ্টান, আমি মা, আমাকে কি কেয়ার করে, তবে উনি টাকা পাঠান, তাই একটু খাতির পান। তবে উনি যে বাপকে দুইশত টাকা দেন, সে উনি হিন্দু পিতার ছেলে, পিতৃভাব যাবে কোথা? আর আমার দুটী যে ছেলে, এরা তো হিন্দুর হাওয়া পায়নি। জন্মেছে সাহেবের ঘরে—খায় সাহেবের খানা—যাচ্ছে সাহেবের দেশে—দেখছে সাহেব—ভাবছে সাহেব—এরা কি

আর মাকে ভাত দেবে? তাইতো জীবনবীমা করয়েছি—দশহাজার টাকার। দিদি! আমার অনেক পাপ ছিল, তাই, হিঁন্দুর মেয়ে হিঁন্দুর বউ হ'য়ে স্বামীর জন্য সং সাজতে হ'য়েছে। আমার একটু সুখ নাই। তবে মেম মহলে "সতী" বলে একটা খাতির হ'য়েছে। তিনি বলেন, তোমার ভাব দেখে, অনেক সাহেবের বাঙ্গালীর মেয়েকে বে করবার সাধ হ'য়েছে। অনেক সাহেব তাঁকে বলেন, বাবু তুমি বিলাত গিয়ে ঠকেছ। কারণ তোমার দেশে স্ত্রী যেরকম গুণবতী; ভগিনী ও জননী যেরপ স্নেহময়ী—তাতে এমন সমাজ ছেড়ে, অসুরের দেশে গেলে কেন? টাকা নন্‌সেন্‌স্ টাকা! টাকায় কি সুখ? দিদি! আমার ভগবানের কাছে এই প্রার্থণা ম'রে যদি আবার জন্মাই, যেন হিন্দুর ঘরে আবার জন্মাই, আর যেন হিন্দু স্বামীর স্ত্রী হই।

অন্তরাণী তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার বিপিনকে কখনও বিলাত যেতে দেবনা। আর সাহেবদের সঙ্গে মিশতে দেবনা।"

রাণী। দিদি! এখন জ্ঞানর বিয়ে দিতে প্তারলে তবে মনের সুখ। বাঘের ভয় নাই কুমিরের ভয়—আমার হ'য়েছে তাই,—ছেলে সাহেব হয় নাই—সন্ন্যাসী হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রণয় পীরক্ষার মন্ত্রণা।

রাণী প্রমদাকে পসন্দ করিয়াছিলেন। রাজা মেয়েটীকে তত ভাল করিয়া দেখেন নাই।

রাজা মহল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, রাণী রাজাকে বলিলেন "বলি তোমার মেয়ে পসন্দ হয়?"

রা। আমি ভাল করে দেখি নাই। কেননা গরিবের মেয়ের প্রকৃতিতে রাজার ছেলের প্রকৃতি মিলেনা। গরিব লোকদের ষ্টি ছোট হয়। এই রাজ সংসারে কত লোককে প্রতিপালন ক'রতে হয়, কত দোষী লোকের অপরাধ ক্ষমা ক'রতে হয়, কত ণীর গুণের পুরস্কার দিতে হয়। স্বামীর চরিত্রে—স্ত্রী চরিত্রের ায়া পড়ে, এই জন্য রাজার যিনি স্ত্রী হবেন, তাঁর মন খুব উন্নত ওয়া দরকার। এই জন্য গরিবের মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ ক্ত সঙ্গত নহে।

রাণী। তা অনেক গরিবের মন রাজার মনের চেয়ে উন্নত া হয়।

রা। খুব কম। অধিকাংশ গরিবের মন নিকৃষ্ট।

রাণী। এইতো এত রাজাদের চরিত্র দেখছি। [illegible]রই দুটী একটী উপপত্নী। কারও কারও ৪০। ৫০ টী তার উপর গাঁজা, গুলি কত কি আছে। এঁরা আবার উন্নত কিসে?

রা। এত মদেতে বেশ্যাতে ডুবেও রাজাদের মনের যে উন্নত দৃষ্টি, মদ বেশ্যা ছেড়ে গরিবের মনের সে উন্নত দৃষ্টি নাই। গরিব যদি মদেতে বেশ্যাতে ডোবে, তো, তাদের মনই খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আমরা এত খারাপ হ'য়েও কত লোকের প্রতিপালন করি। ভগবান তো আর বোকা নন। তিনি বুঝে সুজেই মানুষকে ধনী করেন নির্ধন করেন। গরিব লোকদের যে প্রকৃতি তাতে যদি ধন দিতেন তো পৃথিবী এত দিনে রসাতলে যেতেন।

রাণী। কিন্তু অধিকাংশ সাধু তো গরিবের ঘরে জন্মেছেন?

রাজা। তা ঠিক কথা, তাঁরা ধন সম্পত্তিকে পরিত্যাগ ক'রে সাধুতা রক্ষা ক'রেছেন। গরিব সাধু, ধনীর আদরে মাটী হ'য়েছে। যেখানে সাধুর পতন সেইখানে ধনীর সংস্রব দেখা যায়। এই জন্য সাধুরা ধনীদিগকে বাঘের মত ভয় করেন। ধনে মনকে সাধুকরা শক্ত বটে, তথাপি ধনীর মন শক্ত হবে কিসে? ভার বহন ক'রতে ক'রতে বেহারাদের কাঁদ শক্ত হয়; মোট বইতে বইতে মুটের মাথা শক্ত হয়। গরিবের ভারই নাই, তো, মন শক্ত হবে কিসে?

রাণী। কিন্তু মেয়েটীর রূপ যদি দেখ তো মোহিত হবে।

রাজা। তা হ'তে পারে। কিন্তু শুধু রূপে কি হবে? গুণ চাই।

রাণী। এই এক বৎসরে মেয়েটীকে যা দেখছি, তাতে ভাল ব'লেই বোধ হয়।

রাজা। তাতে কিছু বোঝা যায়না।

রাণী। কিসে বোঝা যায়না?

রাজা। তার পরীক্ষা আছে।

রাণী। কি পরীক্ষা?

রাজা। গুপ্ত পরীক্ষা প্রণয় পরীক্ষা।

রাণী। তা আমায় ব'লতে দোষ কি?

রাজা। বিশেষ দোষ।

রাণী। কেন?

রাজা। মেয়ে মানুষের পেটে কবে কথা থাকে।

রাণী। তা আমার ছেলের মঙ্গল আগে দেখবো, না, ঐ মেয়েটীর মঙ্গল আগে দেখবো। ও মেয়ের চেয়ে কি সত্যি সত্যি আর ভাল মেয়ে জুটবেনা। তবে ভাল পেয়ে জিইয়ে রেখেছি।

রাজা। তা পরীক্ষা তুমিই ক'রতে পার।

রাণী। কি রকম পরীক্ষা।

রাজা। তোমার ঘরের আধখানা নূতন চকচকে টাকা, আধুলি, মোহর, মুক্তা, হীরা দিয়া ভাল করিয়া সাজাও। ঘরের আর আধখানা খালি রাখ। সেই খালি দিকটায় একখানা সামান্য আসনে তোমার ছেলেকে বসাও। মেয়েটী জ্ঞানদাকে দেখেছে তো?

রাণী। তা চার পাঁচ দিন আমার সঙ্গে জ্ঞানদার ঘরে গিয়াছে—হাতে পান দিয়েছে।

রাজা। জ্ঞানদা মেয়েকে দেখেছে?

রাণী। মুখটী হেঁট ক'রে পান নিয়েছে, মেয়েটীকে দেখতে আমি আনতে দেখি নাই। দেখলে তো বুঝতাম।

রাজা। তা বেশ। মেয়েটী জ্ঞানকে চিনেছে [illegible] হ'য়েছে, এখন সেই কাজ করগে।

রাণী। তা পরীক্ষা কি হবে?

রাজা। বলদেখি কি পরীক্ষা ?

রাণী। মোহর চায় কি রাজপুত্র চায়, এই পরীক্ষা নাকি ?

রাজা। না।

রাণী। তবে আবার কি ?

রাজা। মোহরের দিকে চায় কি রাজপুত্রের দিকে চায়।

রাণী। তা যদি একবার আধবার মোহরের দিকেই চায় ?

রাজা মোহরের দিকে অধিকক্ষণ চায় কি রাজপুত্রের দিকে অধিকক্ষণ চায়। রাজপুত্রের দিকে যেয়াদাবার চায় কি মোহরের দিকে যেয়াদাবার চায়।

রাণী। যদি মোহরের দিকে না চেয়ে, কেবল জ্ঞানর দিকেই চায়।

রাজা। তাহ'লেতো, তোমার পাথরে পাঁচ কিল। সুন্দরী বউ নিয়ে স্বর্গভোগ হবে।

রাণী। আর সে কপাল ক'রে আসিনি, নাম মাত্র রাজার মেয়ে রাজার রাণী হ'য়েছি।

রাণী রাজার পরামর্শে সেই পরীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন, পরদিবস আপনার ঘরের আধখানা ভাল করিয়া সাজাইলেন, ঘরের আধখানা মেজে ভাল করিয়া মখমলে আবৃত করিলেন, ঘরের অর্দ্ধেক দেয়ালে ভাল ভাল মতি ও মুক্তার মালা ঝুলাইলেন, মখমলাবৃত মেজের উপরে প্রথমতঃ চারিদিক নূতন দোয়ানিতে খানিকটা আবৃত করিলেন, যেন মখমলে দোয়ানির চটাল চারিটী পাড় হইল, সেই দোয়ানীর গায়ে গায়ে, নূতন সিকি সাজাইলেন, দোয়ানীর পাড়ের গায়ে, সিকির পাড় হইল, সিকির গায়ে গায়ে, নূতন আছুলি সাজাইলেন, সিকির

পাড়ের কোলে আধুলির পাড় হইল, আধুলির পাড়ের গায়ে নূতন টাকার পাড়, তারপরই কেবল চক্‌চ'কে মোহর, মোহরে মোহরে মণ্ডলের মধ্যস্থল আবৃত হইল, যেন মোহরেতে, টাকাতে, আধুলিতে, সিকিতে, দুয়ানিতে বোনা একখানি বৃহৎ আসন মেজের উপরে ঝক্‌মক্ করিতেছে। সেই মোহরের উপরে মাঝে মাঝে এক একখানি হীরক—হীরক জ্বলিতেছে।

ঘরের অপর অর্দ্ধেক, একবারে খালি থাকিল, কেবল ঐ মোহরাদিরদিকে মুখ করিয়া বসিবার জন্য একখানি সামান্য আসন রাজপুত্রের জন্য রাখা হইল।

ঘরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখস্থ দেয়ালে একখানি ক্ষুদ্রায়তন আর্শি রাখা হইল, আর্শিখানি কাপড়ে ঢাকা থাকিল, রাণী যখন সেইখানে উচ্চাসনে বসিবেন, তখন আস্তে আস্তে গৃহস্থিত অন্য লোকের অজ্ঞাতে কাপড় তুলিয়া আর্শি দেখিবেন, রাণীর সম্মুখে যে আর্শি আছে, দ্বারস্থ লোক সহজে জানিতে পারিবে না।

রাণী অনেক যত্নে হেমন্ত নিস্তারিণী বিনোদিনী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, ঘরটী ঐরূপ সাজাইলেন বাটীর দাসীরা তাহা আদতে জানিতে পারিল না! ঐ কয়জন স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ ঘরের সেদিকে যাইতে পাইল না, ঘর সাজান হইলে, রাণী ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া—ঘরে চাবি দিলেন, কিজন্য যে, ঘরটী এরূপে সাজান হইল তাহা রাজা ও রাণী ভিন্ন আর কেহ জানিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

পুস্তকালয়ে রাজকুমার।

রাজকুমার জ্ঞানদানন্দন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বিকালে আপনার পুস্তকালয়ে থাকেন।

একটী প্রকাণ্ড ঘর, লম্বা প্রায় আশি হাত, চওড়া প্রায় পঞ্চাশ হাত। দেয়ালে পঙ্কের কাজ—লতাপাতা ফল ফুলের কত রকমে কারিকুরি, দেখিলেই নয়ন মনের তৃপ্তি—ভোগলালসার উদ্দীপনা হয়, ঘরের দেয়ালের ধারে ধারে বড় বড় আলমারি, বড় টুলে দাঁড়াইয়া আলমারির উপর থাকের বই পাড়িতে হয়, এক একটা আলমারিতে কত টাকাই খরচ হইয়াছে, চারি দেয়ালের ধারে ধারে আলমারি, আবার ঘরের মাঝে মাঝে এরূপভাবে আলমারি সাজান, মনে হয় ঘরের ভিতর আলমারি সাজানর জন্য অনেক ছোট ছোট ঘর। দুই ধারে আলমারির শ্রেণী থাকার মনে হয় যেন আলমারি-রচিত গলি, গলিতে কার্পেট্ বিছান, আলমারিতে কেবল পুস্তক—গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি, সোণার জলে চিত্রিত পুস্তকের সারি দেখিলেই মনে হয়, স্বরস্বতী সেবকের বিলাসদ্রব্য কি অপূর্ব্ব বস্তু। এক একখানি পুস্তকে কতই জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি, ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা—আলোচনা—মীমাংসা—প্রশ্নোত্তর। পুস্তকের উপরে সোণার জলে পুস্তকের নাম—পুস্তকের নামের পরে পুস্তকের নাম—নামে নামে—সোণার জলের হরপে হরপে চাকচিক্যের দৈর্ঘ্য—সেই উজ্জ্বল

দৈর্ঘ্যের কয়েক অঙ্গুলি নীচে গ্রন্থকারের নামাবলী, সেইরূপ উজ্জ্বল অক্ষরে শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।—অতি কৌশলে সেই সব পুস্তক সাজান হইয়াছে। আলমারির গলির মাথায় ধনুবৎ কাষ্ঠ ফলকে বৃহদক্ষরে কোথাও লেখা "কাব্য," কোথাও লেখা "ইতিহাস," কোথাও লেখা "বিজ্ঞান," কোথাও লেখা "দর্শন," কোথাও লেখা "গণিত," কোথাও লেখা "প্রাচীনভাষা," কোথাও লেখা "নভেল," ইত্যাদি। "কাব্য" গলিতে আলমারির মধ্যে সেক্ষপীয়র—কালীদাস—মিল্টন—দান্তে—বর্জ্জিল—হোমর—বাল্মিকী—গেটে,—ট্যাসো—মলিয়ার—ভল্টিয়ার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের পুস্তকগুলি, অধিকতর উজ্জ্বলবর্ণে উৎকৃষ্ট চর্ম্মে বাধাইয়া বিশেষ যত্নে সাজান হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয় ঐ সকল কবিদিগকে রাজকুমার বড় আদর করেন। "দর্শন" গলিতে হিন্দু, গ্রীক, আরব, চীন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, প্রভৃতি প্রাচীন ও নব্য জাতির সমস্ত দর্শন পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে সাংখ্য, কোম্ত, হিউম, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট, ফিক্‌তে, হেগেল, প্লেটো ও কনকুসের গ্রন্থগুলি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। "সমালোচনা" গলিতে আশ্চর্য্য সংগ্রহ, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে জনসনের "সমালোচনা," জারভাইনসের "সেক্ষপীয়র সমালোচনা," শ্লেগেলের "নাটক সমালোচনা," এবং জন রস্কিনের "আধুনিক চিত্রকর" নামক পুস্তক বিশেষ যত্নে রক্ষিত। "ইতিহাস" গলিতে পুস্তকের সংখ্যা করা কঠিন। পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, কাটাকাটি, মারামারি, ধর্ম্মোন্নম, আত্মোৎসর্গ, সবই সেই পুস্তক গুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর, ব্যাবিলন, কাল্ডিয়া, স্পেন, চীন, আরব, পারস্য জাতির প্রকাণ্ড জীবনের উত্থান ও পতন সবই জীবন্তভাবে

সেই সকল পুস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে। বীর আলেকজন্দারের অপূর্ব্ব দিগ্বিজয়ী ভ্রমণে, বিচিত্রদেশ, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, ও জীবজন্তু দর্শনে উরোপের জ্ঞানদেহ কি প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়া, আলেকজেন্দ্রিয়া-নগরে অদ্বিতীয় পুস্তকাগারে নবীন বিজ্ঞান দর্শনের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছিল;—খ্রীষ্টানদিগের দৌরাত্মে স্বরস্বতী হাইপেশিয়ার রাজপথে প্রাণত্যাগের সহিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কিপ্রকারে প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছিল;—সে সব কাহিনী সেই সব গ্রন্থে পাঠ করিলে, মানব সমাজে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া, ভয়, উল্লাস, ও ভক্তিতে অধীর হইতে হয়। আবার শত শত বৎসরের বিঘ্ন বাধা, নির্য্যাতন, ও প্রাণনাশের ভিতর দিয়া, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ভীষণ যুদ্ধের পর, পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী এরিষ্টটলের বুদ্ধিজ্যোতিঃ কি প্রকারে বেকনের বুদ্ধিজ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া, প্লেটোর কাল্পনিক বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া, জড়শক্তি হইতে মানবমণ্ডলীর হিতকর শত শত ব্যাপারের আবিষ্কার করিল,—সে সমস্ত ঐ সব গ্রন্থে যে অবগত না হইল, তার মানব জন্মের গৌরব করিবার কিছুই নাই।

তারপরই "নভেল গলি।" সে এক বিরাট ব্যাপার। হলের আধখানি, তাহাতেই পূর্ণ। সেই খানে অনেকগুলি গলি, কোন গলিতে "সার ওয়াল্টর স্কটের" অর্দ্ধপ্রস্তর মূর্ত্তি—বালকের স্বর্গীয় ভাব প্রাণে চাপিয়া, সরল চাহনিতে যেন মানব প্রকৃতি আলোচনা করিতেছেন। কোন গলিতে "ভিক্টর হুগোর" প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যেন, কল্পনাবলে পৃথিবীর দুঃখ মোচন করিতে ব্রতী হইয়া' স্বরস্বতীর কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। কোন গলিতে চার্লস্ ডিকেন্স হাস্যপূর্ণ প্রাণে জগতে বিশুদ্ধ হাসির অবতরণের জন্য স্বরস্বতীর

পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। পাশে অন্য গলিতে "থ্যাকারে" ও "ষ্টার্ন" পবিত্র হাসিতে মানুষকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য গম্ভীর ভাবে মুচকিয়া হাসিতেছেন।

পুস্তকাগারের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড খাট। খাটে স্প্রিংএর গদি। যুবরাজের শয়ন শয্যা। শয্যার একটু দূরে প্রকাণ্ড মার্ব্বেল পাথরের টেবিল—সেই টেবিলের কাছে আরো দুখানি মেহগিনির টেবিল। টেবিলের চারিদিকে প্রায় কুড়ি কি বাইশ খানা সুন্দর চেয়ার। কিছুদূরে এক প্রকাণ্ড বিছানা। বিছানায় মখমলের চাদর। রাজকুমারের টেবিলের চারিপার্শ্বে কয় জন মহাপুরুষের প্রস্তর মূর্ত্তি। দক্ষিণে প্রকাণ্ড ললাট, লম্বিত-কুঞ্চিতকেশ, দীর্ঘগুম্ফ-শ্মশ্রুশোভিত, মানবচরিত্র চিত্রকর "সেক্সপীয়র"; "সেক্সপীয়রের" পাশে, চিরদুঃখী অদ্বিতীয় চিত্রকর "টার্ণার", এবং টার্ণারের পাশে, প্রকৃতির রহস্যমর্ম্মজ্ঞ স্বর্গীয় চিত্রকর "বেরুলম" এই তিন মূর্ত্তি যেন কাব্যামৃতপানে বিভোর হইয়া পরমানন্দে ভীষণ দরিদ্রতাকে বক্ষে ধরিয়া প্রকৃতির অমর সন্তান দিগের অমর উদ্যমকে উৎসাহিত করিতেছেন। এই তিন মূর্ত্তির মধ্যে টার্ণারের মূর্ত্তি যেন, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞানের উপরে কাব্যের জয়পতাকা তুলিয়া, মহাগর্ব্বে জগতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিগকে বিস্মিত করিতেছেন *।

* ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গত পঞ্চাশ বৎসরে, কঠিন পরিশ্রমে পর্ব্বতের গঠন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, অনেক বৎসর পূর্ব্বে টার্ণার বালক কালে আপনার তুলিকায়, পর্ব্বতচিত্রে সে সব তত্ত্ব অঙ্কিত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকেরা টার্ণারের সেই পর্ব্বত চিত্রে কবির আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। ধন্য কবিত্ব শক্তি! তুমি মানব মনের সকল শক্তির শীর্ষস্থানীয়!

রাজকুমারের বামপার্শ্বে "হিউমের" সংশয় পূর্ণমূর্ত্তি; হিউমের পার্শ্বে ক্যাণ্ট ও হেগেলের আনন্দপূর্ণ বিশ্বাস মূর্ত্তি।

এই পুস্তকাগারে রাজপুত্র রাত্রে শয়ন করেন। দিবসে অধ্যয়ন করেন। কেবল সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা কি এগারটা (কদাচিৎ অনন্ত রাত্রি) পর্য্যন্ত সেই বকুলতলে থাকেন।

এইরূপ পুস্তকাগারে চেয়ারে বসিয়া রাজকুমার কি চিন্তা করিতেছেন—সম্মুখে এক খানি ইংরাজী পুস্তক খোলা রহিয়াছে, এমন সময়ে রাণীর দাসী আসিয়া রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ পরে চাহিলেন। দাসীকে জিজ্ঞাসিলেন "কি"?

দাসী। রাণীমা একবার ডাকছেন,—

রাজকুমার। এখনি যেতে হবে?

দাসী। আমার সঙ্গেই যেতে হবে।

তখন প্রাতঃকাল. বেলা আটটা, রাজকুমার তখনি দাসীর সঙ্গে মার কাছে গেলেন, গিয়াই মাকে প্রণাম করিলেন। পুত্র মার ঘরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ডে.কছেন কেন?"

রাণী। বাবা! একটী কথা শুনতে হবে।

রা। কবে কোন কথা শুনিনি।

রাণী। তাতো শুনেছ গো, এখন শাশুড়ির কথা হ'লেই

"The labour of the whole Geological society, for the last fifty years, has but now arrived at the ascertainment of those truths respecting mountain form, which Turner saw and expressed with a few strokes of a camel's hair pencil, fifty years ago, when he was a boy."—(*Ruskin.*)

অমনে যাও যে বাবা ! বউএর মুখ যদি না দেখতে পেলাম, তো, তোমার মার চক্ষু দুটী উপড়ে ফেল। এই জন্য ডেকেছি।

রা। কি কথা বলুন ?

রাণী তখন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া, সেই মণিমুক্তা সজ্জিত গৃহে চুপে চুপে লইয়া গেলেন, সেখানে আর কেহ নাই, পুত্র সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়া, ঘরের ইন্দ্রালয়বৎ দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া, জিজ্ঞাসিলেন "মার কি কোন ব্রত হবে নাকি ?"

রাণী। হাঁ বাবা ! ব্রতই হবে, তোমাকে এক কাজ ক'রতে হবে।

রা। কি ?

রাণী। এইযে আসন দেখছ, এই আসনে ব'সে এক খানি বই নিয়ে, কাল সকালে ঘণ্টাদুই চুপে চুপে প'ড়বে, আমি আর এক জন এই ঘরে তোমার কল্যাণে কিছু ক'রব। তুমি আমাদের দিকে চাইবেনা। কেবল কেতাবের দিকে চেয়ে থাকবে। এই কথাটী রাখতে হবে। কাল সকালেই তুমি এই ঘরে কেতাব ল'য়ে আসবে।

রাজপুত্র তখন হাসিতে হাসিতে মার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা ! তোমার এ কি রকম ব্রত বুঝছিনা। আমাকে কি খাওয়াবে ?

"তুমি যা চাইবে তাই খাওয়াব !" কাল আমার বাবার মত এই আসনে এক বার বোসতে হবে।

রা। তা ব'সবো, কিন্তু তোমার বাবা হ'তে পারবোনা।

রাণী। শ্বশুর হ'তে পারবে ?

রা। তা পারবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

সাজ-সজ্জা।

একটী ক্ষুদ্র মনোহর ঘরে দুটী সুন্দরী বসিয়াছেন। একটী নিস্তারিণী অপরটী হেমন্তকুমারি। নিস্তারিণীর বয়স পঁচিশ, সন্তান না হওয়ায় ষোড়শীবৎ বোধ হয়। রং চাঁপাফুলের মত, মুখখানি পানপানা, পানপানা মুখে নাক দোষ শূন্য পূর্ণায়তন হয়। নিস্তারিণীর নাক পূর্ণায়তন—লাবণ্যময়। নাকের পাশের ছিদ্রদ্বয় স্বল্পোচ্চ। তাহাতে স্ত্রীভাব ফুটিতেছে। স্ত্রীসৌন্দর্য্যকে সেই ছিদ্র যেন সজীব রাখিয়াছে। সেই ছিদ্রাবলম্বনে সোণার নত বড় বড় মুক্তার সহিত দুলিতেছে। চক্ষুদুটী আকর্ণ বিস্তারিত নহে, আকর্ণ বিস্তারিত চক্ষু বড়ই ভয়ানক, কোনকালে স্ত্রীলোকের যেন সে চক্ষু না হয়। যে চক্ষে রমণীমুখে সতীত্বতেজ বিকীর্ণ হয়, নিস্তারিণীর সেই চক্ষু। নাসিকা ও চক্ষুর উপযুক্ত, নিটোল, গম্ভীর, লাবণ্যময়, প্রশস্ত ললাট। নাসিকা ও চক্ষুর দুই পাশে নিখুঁত কোমল দুখানি গণ্ড, গণ্ড দুখানি যেন চাঁপাফুলের ভিতরের পাপড়ির লাবণ্য দিয়া পালিশ করা।

সেই কপাল, গাল, নাসিকা কখনও ব্রণ বা ক্ষত অনুভব করে নাই। নিস্তারিণীর কণ্ঠে শঙ্খের গ্রীবার মত খাঁজ নাই বটে কিন্তু

সে গ্রীবা সুবর্ণহারের উপযুক্ত। নিস্তারিণীর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মাধুরি বজায় রাখিয়া, রমণীসৌন্দর্য্যে এক আশ্চর্য্য কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে।

হেমন্তকুমারী ষোড়শী যুবতী, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, মাধুরির সরোবর, সে দেহ যেন দুধে আলতায় মিশিয়া মাংস হইয়াছে। সেই মাংস জ্যোৎস্নাদিয়া পালিশ করা হইয়াছে। চক্ষুদুটী দীপ্তি-পূর্ণ, বিস্তৃত, চক্ষের পাতা সুকৃষ্ণ, ভ্রূদুটী যেন তুলিদিয়া আঁকা। মুখ গোল নহে, লম্বাও নহে, গোলে লম্বায় মিশিয়া যা হয় তাই। একটু কম লম্বা হইলে গোল হইত; একটু কম গোল হইলে লম্বা হইত, চক্ষুদুটী বড়ই চঞ্চল, আনন্দপূর্ণ, কপাল, গাল, চিবুক নিস্তারিণীর অপেক্ষা সুন্দর, বালিকাভাবে যুবতীভাবের এক চতুর্থাংশ মিশিয়াছে, চাঞ্চল্যে গাম্ভীর্য্যের অল্প ভাবই মিশিয়াছে। নিস্তারিণীর একপোয়া হাসিতে হেমন্তের একসের হাসি, নিস্তা-রিণী যে কথায় মুচকিয়া হাসে হেমন্ত সে কথায় হাসিয়া আকুল হয়, কিন্তু যুবা দেখিলে সে হাসি গম্ভীর হয়, হেমন্ত কেবল আনন্দ কৌতুক ও সম্পদপ্রভায় আত্মহারা, স্বামীর কাছে যখন যৌবন কান্তিতে হাসির কীরণ ফোটে, তখন এই নশ্বর জগতে মায়ার মূর্ত্তি যে কিরূপ কঠিন কোমলমোহন রজ্জুতে মানুষকে আবদ্ধ করে, হেমন্তের মত স্ত্রী যাহার আছে সেই বুঝিয়াছে।

আর আমাদের প্রমদা? এই পঞ্চদশ বর্ষীয়ার রূপের কাছে নিস্তারিণী ও হেমন্তের রূপ কিছুই নহে। প্রথমতঃ রং—তা হেমন্তের এক রকম, নিস্তারিণীর আর এক রকম; কিন্তু প্রমদার যেন অপার্থিব। অন্ধকারে তিনজন বসিলে, প্রেমদাকে বেশ ধরা

যায়, ভস্মের ভিতরে আগুণের রংএর মত, ঝোঁপের ভিতরে গোলাপের বর্ণের মত, অন্ধকারে প্রেমদার রূপের আভা বেশ বোঝা যায়, রাণী স্বচক্ষে এই রূপের আভা অন্ধকারে দেখিয়া বিমোহিত হন। জ্যোৎস্না জলে পড়িলে যে রং হয় প্রেমদার সেই রং। মুখ চক্ষু নাসিকার তুলনা কোথায় পাই? ঠোঁটদুটী ঠিক রাঙা গোলাপের দুখানি পাপড়ি, ভ্রুদুখানি স্বর্ণপদ্মের ভ্রমরের বক্র পংক্তিরমত, দেহখানি মাংসময় বোধ হয় না—যেন লাবণ্যময়, পারতলা দুখানি লোহিতাভ, নখগুলি যেন শাদা মার্ব্বেল পাথরে কুঁদিয়া বাহির করা; নখের মুখে মুখে যেন লাল ফুল ফুটিতেছে। প্রেমদা বালিকা না যুবতী? যুবতী নহে—বালিকা যৌবন সীমায় পদার্পণমাত্র করিয়াছে। এখনও বাল্যলীলার সমবয়স্কদিগকে দেখিলে, তাহাদের সহিত খেলিবার ইচ্ছা প্রবল হয়; কিন্তু গুরুজনদের তিরস্কার-ভয়ে সে ইচ্ছাকে দমন করে। যেমন কুঁড়ি ফুলে ফুটু ফুটু হয়,—তৃতীয়ার চাঁদ পঞ্চমী ও অষ্টমীতে ফুটু ফুটু, গ্রীষ্মশেষে প্রথম বর্ষায় নদী বাড় বাড় হয়, প্রেমদার পনের বৎসরের দেহে সেইরূপ যৌবনের ফুটু ফুটু ভাব। প্রেমদা যুবা দেখিলে এখন মুখ নত করে, উচ্চস্বরকে মৃদু করে, দ্রুতগতিকে মন্থর করে, হাসিকে সংযত করে। এই রূপবতী যখন রাণীরসঙ্গে সেই সাজসজ্জার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন হেমন্ত ও নিস্তারিণীর রূপকে যেন চন্দ্রালোকে প্রদীপের আলোর মত নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিল।

হেমন্ত ও নিস্তারিণী প্রেমদাকে সাজাইবার সময়, সেই অতুল-স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সাজাইতে ভুলিয়া যায়। চক্ষু আর সে রূপ হইতে পৃথক হইতে চায় না। মুখেরদিকে চাহিলে—

দৃষ্টি সে সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়। অঙ্গের এক একটী অংশ যেন দৃষ্টিপাখী বাঁধিবার ফাঁদ। আর সেই পঞ্চদশ বর্ষীয়ার বুকে যে দুটী গোলাপের ডাগর ডাগর কুঁড়ি রূপসীর পনের বৎসর ঠেলিয়া উঠিতেছে, তেমন কুঁড়িফুল বিধাতার কোন উদ্যানে নাই। সেই বক্ষদেশে যখন মুক্তারমালা পরাইতে লাগিলেন, সেই প্রশস্ত চন্দ্রমা-দেহ সদৃশ বক্ষের কোমল কঠিন স্তনের উপরে নীচে পাশে যখন মুক্তার পংক্তি আত্মোৎসর্গ করিল; শ্বেত ভ্রমরদলের মত সেই স্তনকোরকে মধুপানের জন্য বিভোর হইল; তখন সুন্দরীদ্বয় প্রেমদাকে সাজাইতে সাজাইতে আনন্দে বিগলিত হইয়া আপনা-দের বক্ষ কাটিয়া সেস্থলে প্রেমদার বক্ষঃ সংযোগ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন *"এই বুকখানি তোমার কেটে নিয়ে আমাদের বুকে বসাতে দিবে ভাই।"* বলিয়াই *নিস্তারিণী* প্রেমদার কচি স্তন টিপিতে টিপিতে বলিতেছেন "আহা! আমার টেপায় কে আর মধু ঝ'রবে?" *

---

* Those, however, from a childish nicety would find fault with the truth of nature, the poet would have set to right as Bacon did the fastidious persons who turned away from what was naked and ugly in natural Science, testifying that the sun of art shines on the cloaca as well as the palace without being soiled by it, that what is worthy of existence may also be worthy of art &c.—(*Gervinus.*)

প্রেমদা সে কথার অর্থ বুঝিল না, হেমন্ত বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। প্রেমদা ভাবিতেছে "হাসে কেন?" প্রেমদাকে পিতা মাতা এমনি সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছিল যে পঞ্চদশ বর্ষেও সে কথার কদর্থ বুঝিল না। হাত, পা, মাথা যেরূপ, প্রেমদার স্তনও সেইরূপ; তবে পুরুষ দেখিলে মার ভয়ে খোলা স্তন আবৃত করে, ঢাকিয়া মনে মনে ভাবে "ঢাকিতে বলে কেন? দুই সুন্দরী অনেক হাস্য পরিহাসের সহিত প্রেমদাকে সাজাইতেছেন। কিন্তু কেন সাজাইতেছেন তাহা কেহই জানেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

প্রেমদাকে সাজান হইল, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সে রূপ দেখিলে চিত্তচাঞ্চল্য যদি কোথাও না হয়, তো, সেখানে চিত্ত নাই। চিত্তচাঞ্চল্য নানাভাবে হইয়া থাকে, বালক বালিকা মার কোল হইতে উর্দ্ধমুখে যে চাঁদ দেখিয়া চাঁদের জন্য আবদার করে তাহা একপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্য। যুবা সে চাঁদ দেখিতে দেখিতে যে তার প্রণয়িনীর মুখের সহিত সেই চাঁদের তুলনা করে তাহা একপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্য। আর সাধু সে চাঁদ দেখিয়া সেই চাঁদে যে ভগবানের রূপ দেখিতে পাগল হয় তাহাও একপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্য। প্রেমদার রূপে এই সব ভাবের চিত্তচাঞ্চল্য এবং আর এক ভাবের চিত্তচাঞ্চল্য হয়—যাহাতে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষিত, এই সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার চিত্তচাঞ্চল্য কখনও কাম কখনও প্রেম নামে অভিহিত হয়।

প্রেমদার সেই অলঙ্কার ভূষিতা রূপ দেখিয়া রাণী ভাবিতেছেন "জ্ঞানদা যাতে ভালক'রে প্রেমদাকে দেখে তা ক'রতে হবে। এ দেখে মুনি ঋষি স্থির থাকতে পারে না আর জ্ঞানদা তো সমস্ত-ছেলে।" রাণী, নিস্তারিণী ও হেমন্তকে অন্য ঘরে যাইতে বলিলেন, প্রেমদাকে সঙ্গে লইয়া রাণী পরীক্ষার ঘরে চলিলেন, তখন প্রেমদার পায় গায় গহনার ঝম্ ঝম্ ঝুন্ ঝুন্ ঝন্ ঝুন্ শব্দে,

অলঙ্কারের চাকচিক্যে প্রেমদার রূপের আভা মিশিয়া মানবমনের বজ্রকে গুঁড়া করিবার মোহিনীশক্তি প্রকাশ করিল, প্রেমদা সেই শক্তিতে আপাদমস্তক পূর্ণ হইয়া পরীক্ষা ঘরে অলঙ্কার শব্দের তালে তালে, মন্থর গতিতে চলিলেন, রাণীর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন যুবরাজ আপনার আসনে বসিয়া পড়িতেছেন, অধ্যয়নে এমনি নিমগ্ন যে, সুন্দরীর ঝুম্ ঝুম্ ঝন্ ঝন্ শব্দে তাঁর কাণের চৈতন্য জাগিল না, প্রেমদা ঘরের ভিতরে গেলেন কিন্তু রাজপুত্রকে দেখিলেন না। রাণীর প্রকাণ্ড দেহের আড়ালে থাকিয়া রাণীর বাম পাশে পাশে যাইতেছেন; তাই রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, রাণী সেই মোহরাদির আসনের কাছে লইয়া বলিলেন "মা! তোমাকে একটী কাজ ক'রতে হবে, এই সব মোহরের মাঝখানে যে ফাঁক এই ফাঁকে বসিয়া এই সোণার থালে এক একটী মোহর গণিয়া তুলিতে হবে, সব মোহরগুলি গণিয়া তুলিবে যত মোহর হয় বলিবে; প্রতি দশ মোহরে তোমার বাপের এক মোহর আর তোমার এক মোহর, কিন্তু হিসাব ঠিক রাখতে হবে, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি যেমন আছে থাকুক।

ঘরের অন্যদিকে যে রাজপুত্র বসিয়া পড়িতেছেন, প্রেমদা তখনও জানিতে পারেন নাই। রাণী প্রেমদাকে বসাইয়া, আপনি আর্শির কাছে বসিলেন। আর্শির ভিতর হইতে ঘরের সবই দেখিতে পাইলেন, প্রেমদা তাহা জানিলেন না।

প্রেমদা প্রথমতঃ সেই টাকা আধুলি সিকি দোয়ানি মোহরের শোভা কিয়ৎক্ষণ নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন, তারপর দেয়ালের মণিমুক্তারদিকে চাহিতে চাহিতে ধাঁ করিয়া সম্মুখে সেই রূপের

আলো, সুখের মূর্ত্তি, আনন্দের আকৃতি দেখিবামাত্র আকস্মিক আনন্দবিদ্যুতে চমকিয়া উঠিলেন! একবার রাণীরদিকে ভয়ে ভয়ে চাহিলেন। রাণী দেয়ালেরদিকে মুখ করিয়া, প্রেমদা ও রাজপুত্রের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছেন, প্রেমদার বড় সুবিধা হইল প্রেমদা তখনি চক্ষু ফিরাইয়া যুবরাজেরদিকে চাহিলেন, অমনি চুম্বুক লোহ আকর্ষণ করিল, চাহনি অমনি সে রূপে ডুবিয়াগেল, চাহনি স্থির—বজ্রময়ী—প্রস্তরময়ী সে চাহনি রাজপুত্রের রূপের সঙ্গে এককার হইল, তখন প্রেমদার জীবনস্রোত রাজপুত্রের রূপ হইতে প্রেমদার অচঞ্চলা দৃষ্টি ধরিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রেমদার নিশ্বাস রক্ত মন প্রাণ সেই রূপে যেন সজীব হইল। যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়, সেইরূপ যুবরাজকে দেখিবামাত্র প্রেমদার জীবনস্রোত ফিরিয়াগেল। প্রকৃতির যেস্থলে প্রেমদার জীবনের মূল ছিল জীবনের সে মূল সেস্থল ছাড়িয়া যুবরাজের অস্তিত্বে স্থান পাইল। প্রেমদার পাঁচ ইন্দ্রিয় জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পার্শ, ছাড়িয়া, যুবরাজের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শে আপনার আরামের স্থান পাইয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপ মহাভাবে প্রেমদা আপনাকে আহুতি দিয়া, সে ঘর টাকা মোহর মণি মুক্তা ভুলিতে ভুলিতে যুবরাজের মূর্ত্তিতে আপনার চৈতন্যকে ডুবাইতে থাকিলেন। প্রেমদা অপলক নির্ভয় সুখপূর্ণ প্রাণদ প্রণাকর্ষক প্রেমপোষক প্রেমবর্ষক বাহ্যজ্ঞানরহিত দৃষ্টিতে রাজপুত্রকে দেখিতেছেন।

রাণী আর্শির ভিতরে অনেকক্ষণ, রাজকুমারের দিকে প্রেমদার স্থির ধীর কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আনন্দিতা হইতেছেন। রাণী ভাবিতেছেন প্রেমদা এইবার হয়তো দৃষ্টি স্থানান্তর করিবে, কিন্ত

দৃষ্টি সমভাবে স্থির, এই প্রকারে প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইল' রাণী দেখিলেন প্রেমদার চক্ষু লাল হইয়াছে লাল চক্ষু জলে ভারি হইতেছে, জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে, রাণী তখন অপত্যস্নেহে প্রেমদার মুখখানি দেখিতে দেখিতে পুত্রবধূ ভাবিয়া চক্ষে জল ফেলিলেন, রাণী কিয়ৎক্ষণ পরে গলার শাড়া দিলেন, প্রেমদার কর্ণ তখন রাজপুত্রে—সুতরাং শব্দ শুনে কে? রাণী "মোহর তোলা হ'লমা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "মা! প্রেমদা!" প্রেমদা তখন চমকিতা হইলেন। অপ্রতিভের মত লজ্জায় জড়সড় হইয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাড়াতাড়ি এক আঁচলা মোহর থালে তুলিলেন। রাণী কাছে আসিয়া বলিলেন "কটা মোহর তুলেছ?"

প্রে। গোটা দশ বার।

রা। আচ্ছা গুণ দেখি।

প্রেমদা গণিতেছেন। এবড় আশ্চর্য্য গণিত, প্রণয়ভারাক্রান্ত মনের আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রকাশ! প্রেমদা গণিতেছেন—এক, দুই, তিন, চার—রাজপুত্রের রূপে স্মৃতি ভরা রহিয়াছে—সেখানে এক, দুই এর স্থান কোথা? তাই চার অবধি গণিয়া সন্দেহ হইল। ভুল হইল ভাবিয়া প্রেমদা আবার গণিতেছেন, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এই কত হ'ল—ভুলে যাই কেন? এই এক, দুই, এই তিন, এই পাঁচ। অমনি রাণী কৃত্রিম ধমকে বলিতেছেন, কি? কি? পাঁচ না ছয়। তখন প্রেমদা বোকার মত "তাই" ছয়ই হবে বুঝি,—এই দেখনা—এক, দুই, তিন' চার, পাঁচ।

রাণী। কই ছয়তো হ'লনা। আবার গোণ—ভুলেছ।

প্রেমদা আবার গণিতেছেন, এই এক, এই দুই, এই তিন—তিন—তিন—তিন, এই চার—চার—চার—চার, এই পাঁচ—

রাণী। আচ্ছা মা! হ'য়েছে। এই রকমে গুণে গুণে তোল।

এই কথা বলিয়া রাণী পূর্ব্ববৎ আপনার স্থানে বসিলেন। প্রেমদা আবার ভুলিলেন। রাণীর দিকে চাহিয়া, সুবিধা বুঝিয়া, আবার রাজকুমারের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া, হাতে করিয়া অন্ধের মত মোহর তুলিতেছেন, মোহর ভ্রমে টাকা তুলিতেছেন, চক্ষু মনকে হাত হইতে টানিয়া রাজকুমারে ডুবিল, মোহর তোলা বন্ধ হইল। এক একবার চমকিত হইয়া মন হাতে গিয়া মোহর তোলে, আবার হাত হইতে পলাইয়া চক্ষুতে আসিয়া রাজপুত্রে সুধাপান করে, মন এই প্রকারে হাতকে একবারে বঞ্চিত করিয়া, রাণীর অবাধ্য হইয়া—প্রেমদার অবাধ্য হইয়া রাজকুমারের রূপে তন্ময় হইলেন, খানিক পরে মন চক্ষুর ভিতর দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাণী অনেকক্ষণ তাহা দেখিয়া বুঝিলেন, প্রেমদা বাস্তবিকই জ্ঞানদায় মজিয়াছে। এইরূপে বিষয় প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া চক্ষুর যে পুরুষের দিকে ঘন ঘন চাহনি—অচঞ্চল চাহনি ইহা প্রকৃত প্রণয়ের চিহ্ন। আর কেন? চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়াছে। তখন রাণী "কিমা! মোহর গুলো সব, তোলা হ'ল? এই কথা বলিবামাত্র, প্রেমদা আরো চমকিতা হইলেন; লজ্জায় আরো জড়সড় হইলেন; থালের দিকে অনেক কষ্টে চাহিলেন। রাণী প্রেমদার কাছে আসিয়া দেখেন থালে গোটা কয়েক মোহর, তার সঙ্গে দুটা টাকাও উঠিয়াছে। তখন রাণী প্রেমদাকে সেই খানে বসিয়া, মোহর তুলিতে বলিলেন। ছেলেকে বলিলেন "বাবা! আমি একবার ওঘর হ'তে আসি। প্রেমদার মোহর তোলা হ'লে তোমার কাছে মোহরের থালা দিয়ে ও চলে যাবে।" রাণী চলিয়া গেলেন। রাজপুত্র একবার প্রেমদার দিকে চাহিলেন, পলকে

দৃষ্টি নত করিয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রেমদা এখন নির্ব্বিরোধে নির্ভাবনায় আবার রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন—দৃষ্টির উৎসবে আপনার অপার আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।

রাণী আধঘন্টা পরে আস্তে আস্তে আসিলেন। দেখিলেন প্রেমদা অচলা দৃষ্টিতে রাজকুমারের তপস্যা করিতেছেন, আর রাজকুমার আপনার পুস্তকের তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ছেলের ভাব দেখিয়া রাণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, দুঃখে চক্ষে জল ঝরিল। রাণী প্রেমদার হাত ধরিয়া স্নেহে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "তুমি যেন আমার ঘরের লক্ষ্মী হও মা!" এই কথার ভিতরে প্রেমদা তার সুখের স্বর্গ লুকান দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিল। রাণী আবার বলিলেন "এই থালে যে মোহর টাকা তুলেছ এ গুলি আঁচলে বেঁধে তোমার বাপকে দেবে, আজ আমার ঘরে থাকবে, সন্ধ্যাবেলা ও বাড়ীতে যাবে।"

রাজকুমারের কাণে এসব কথা কিছুই স্থান পায় নাই—এমনি অন্যমনস্ক। রাণী জ্ঞানদার কাছে গিয়া বলিলেন "বাবা! একটু বোস! নিস্তারিনী জলখাবার আনছে"। রাণী তারপর প্রেমদাকে লইয়া অন্য ঘরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আবার পরীক্ষার প্রস্তাব।

সেই দিন রাত্রে রাণী স্বর্ণসুন্দরী, রাজার কাছে বিছানায় বসিয়া বড় আনন্দে সেই সব কথা নিবেদন করিলেন। প্রেমদা কর্ত্তৃক মোহর গণিবার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন। যুবা হইলে হাসিয়া আকুল হইতেন। রাজা বলিলেন "এ পরীক্ষায় প্রেমদার প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে, অথাপি আর এক বার অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিতে হবে।"

রাণী। ছেলে মানুষ আবার কত পরীক্ষা দেবে!

রাজা। পরীক্ষার সময়ে ছেলে মানুষ থাকবেনা। তখন বীরপুরুষের শক্তি আসবে।

রাণী। লড়াই ক'রতে হবে নাকি?

রাজা। লড়াইএর অধিক, এমন শক্ত লড়াই আর নাই। যা শুনছি তাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে, অমন বড় পাওয়া চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য। আর আমার বিশ্বাস, প্রেমদাকে যে পরীক্ষায় ফেলবো, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

রাণী। জানই যদি তো আবার পরীক্ষা করা কেন?

রাজা। স্ত্রীচরিত্র বোঝা বড় শক্ত, দেবতারা বুঝতে পারেন না, তা সামান্য মানুষে বুঝবে কি? আমি যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া তবে প্রেমদাকে গৃহলক্ষ্মী ক'রবো।

রাণী। আবার কি রকম পরীক্ষা শুনি।

রাজা। এসব বড় গুপ্ত কথা। খবরদার প্রকাশ না হয়।

রাণী। পরীক্ষাটা দুই তিন দিনের মধ্যে শেষ হ'লে পেটের কথা পেটে থাকবে, আর দুই এক মাস দেরি হ'লে কিজানি যুধিষ্ঠিরের সাঁপ হয়তো ফ'লবে।

রাজা। দুই তিন দিনের মধ্যেই হবে। আর তোমার ছেলেরই মঙ্গলের কথা।

রাণী। তবে ভয় নাই। আমি গুপ্ত রাখবো।

রাজা। কাল সকালে আমি প্রেমদার বাপকে চুপে চুপে বলিব—কি ব'লব বলদেখি?

রাণী। তোমার মেয়ের বে হবেনা, এই নাকি?

"আরে না না" বলিয়াই রাজা রাণীকে আধঘন্টা ধরিয়া কত কি বলিলেন।

রাণী। ভাল কথাইতো। নহিলে আবার রাজার বুদ্ধি। তা আমাকে তো এত পরীক্ষা করনি।

রাজা। তোমাকে ভগবান রাজার রাণী ক'রবেন ব'লেই রাজার মেয়ে ক'রেছিলেন।

রাণী। তা কাল সকালেই এই কথা ব'লতে চাও।

বলিয়াই রাণী মনে মনে ইষ্টচিন্তা করিতেছেন "হে হরি! প্রেমদার মন যেন অচলা থাকে।"

পর দিবস প্রাতে রাজামহাশয় রাজসভায় গিয়াই শ্রীমতী প্রেমদার পিতা শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পেয়াদা দিয়া ডাকাইলেন। একঘণ্টা পরে নারায়ণ মুখোপাধ্যায় আসিয়া

সাজে। অমন মেয়েকে রাজার রাণী ক'রব ব'লেইতো এক বৎসর এখানে প'ড়ে রয়েছি, নহিলে পাঁচ ছয় শত টাকা মাহিনার কত ডেপুটির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়; সে সব দূর ক'রে দিয়েছি। আপনার বউ ক'রে মনের আনন্দে থাকবো এই আমার সাধ, তা ভাগনাকে যখন পুত্রের যায়গায় বসাচ্ছেন, তখন আপনার ভাগনার সঙ্গেই আমার মেয়ের বে দেব, আর জ্ঞানদার যে ভাব ও সন্ন্যাসীর ভাব—দেবতার ভাব, ওঁর বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁর বিবাহে আপনি আর মত দেবেননা।

রা। তা বটে। কিন্তু শুনছি তার নাকি প্রেমদাকে বে করবার ইচ্ছা।

নারায়ণের মনটা তখন একটু বিরক্তির সহিত ভীত হইল। নারায়ণ ভাবিলেন "কিজানি। জোর করিয়াই যদি হতভাগার সঙ্গে বে দেয়! ভগবান রক্ষা করুন।"

রা। তা সে আপনার ইচ্ছা আর আপনার মেয়ের ইচ্ছা।

না। হিন্দুর ঘরে আবার মেয়ের ইচ্ছা কি? স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

রা। বড় মেয়ে কিনা! জোর জবরদস্তি ভাল নহে।

না। বড় নয় বড় নয়! দেখতে অমন! কলাগাছের বাড়। বয়স এই সবে বার বৎসর তিন মাস।

রা। আপনার ব্রাহ্মণী বলেন পনের।

না। রাধামাধব! মেয়ে মানুষের হিসাব ঠিক থাকে? আমার স্ত্রীর কথা আর কবেননা। দশের উপর গুনতে জানেনা।

রা। যাহ'ক, আমার ভাগনার সঙ্গে বেটা আপনার মেয়ের যদি মত না হয়, আপনার মতে তো হবেনা, আপনার মেয়ের

মতই চাই, রাজারাজড়াদের ধরণ ব্যবস্থা গৃহস্থ লোকের মত তো নয়।

না। আমার মেয়ে তত বোকা নয়, আমি যা ব'লবো তাই শুনবে, বাপরে তার পিতৃমাতৃভক্তি দেখে কে? আপনার ভাগনাবউ যখন হবে, তখন বুঝবেন।

রা। যাহ'ক, আজ আপনি এখনি গিয়ে, স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাত্রে এসে আমায় বলবেন "আমার ছেলের সঙ্গে বে দেওয়া মত, কি ভাগনার সঙ্গে বে দেওয়া মত।"

না। তা আজ রাত্রেই আপনি জানতে পারবেন। মেয়েকে রাজরাণী ক'রতে কার না ইচ্ছা হয়, তবে কপাল, নারায়ণ তখন রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বাপ ও মেয়ে।

রাজবাটী হইতে কিছু দূরে একটী দ্বিতল বাটীতে নারায়ণ মুখোপাধ্যায় স্ত্রী, কন্যা ও একটী চাকর লইয়া রাজার খরচে থাকেন। দ্বিতল বাটীর চারিদিকে ইটের প্রাচীর। বাড়িটী দক্ষিণ দুয়ারি, বাটীর ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান, উঠানে দুটা আমগাছ, দুটা কাঠাল গাছ, কয়েকটা পেঁপে গাছ, একপাশে কয়েকটা জুঁই ও বেল ফুলের ঝাড়। বর্ষাকাল, বেল জুঁই ফুটিয়া বাড়ী আমোদিত করিতেছে।

নারায়ণচন্দ্র রাজবাটী হইতে বেলা দশটার সময় ফিরিলেন। ব্রাহ্মণী তখন রান্নাঘরে রাধিতেছেন, প্রেমদা রোয়াকে বসিয়া বেগুণ, আলু কুটিতেছেন। রান্নাঘরের দরজার কাছে একখানি বড় টুলে নারায়ণচন্দ্র বসিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসিলেন "রাজ-বাটীতে ডেকেছিল কেন?

না। আর ডেকেছিল কেন? জ্ঞানদাটার মাথা খারাপ হ'য়েছে, রাজার তার প্রতি আর মমতা নাই।

ব্রা। কি ক'রে জানলে?

না। সেই জন্যই রাজা ডেকেছিলেন।

ব্রাহ্মণী তখন এক হাতে ডালে কাটি দিতে দিতে, বক্রগ্রীবায়, উৎসুক নয়নে চাহিয়া বলিলেন "কি কথা হ'লো?"

না। রাজা ভাগনেকে বিষয় সম্পত্তি উইল ক'রে দেবেন, জ্ঞানদাটার মাথা খারাপ কিনা তাই।

প্রেমদ কুটনা কুটিতে কুটিতে দুইবার "জ্ঞানদাটা, জ্ঞানদাটা, শুনিয়া মনে মনে বড় দুঃখিতা হইলেন।

না। রাজা ছেলেকে অতবড় বিষয়ের ভার দিতে চায়না, বিষয় রক্ষা করা তো চাই, রাজার ভাগনা সতীশ বড় বুদ্ধিমান্; বড় লায়েক। রাজা সতীশকেই বিষয় লেখা পড়া ক'রে দেবেন। জ্ঞানদাটাও নাকি তাতে রাজি, ওটা রাজার ছেলে কেন্ হ'য়েছিল?

আবার "জ্ঞানদাটা" শুনিয়া, প্রেমদার মন বড় ভারি হইল অনিচ্ছায় কুটনা কুটিতে লাগিল।

ব্রা। এই জ্ঞানদার সুখ্যাতি মুখে ধরেনা, কাল রাত্রে কত সুখ্যাতি যে ক'রছিলে! রাতারাতি খারাপ হয়েগেল!

না। সুখ্যাতি তো এখনও ক'রছি। খুব পণ্ডিত, খুব বিদ্বান, খুব সচ্চরিত্র, সে সুখ্যাতি বরাবরই ক'রবো। এখন আমাদের যা ইচ্ছা তাতো শুধু পণ্ডিতে হবেনা, অমন মেয়েকে রাণী ক'রতেই হবে।

সে কথা শুনিয়া প্রেমদার মন বলিল "রাজরাণী না হ'লাম তো ব'য়ে গেল।"

ব্রা। কি কথা হ'ল খুলে বল।

না। রাজা বল্লেন "তা আমার ভাগনার সঙ্গে মেয়ের বে দিতে পার।"

প্রেমদার মন সে কথা শুনিয়া চুপে চুপে বলিল "আমার গলায় দড়ি।"

না। তা তোমার, তোমার স্ত্রীর যা মত তাই হবে, এখন বাড়িতে পরামর্শ ক'রে রাত্রে আমায় বলবেন।—আপনার সঙ্গে বে দেওয়া মত, কি রাজপুত্রের সঙ্গে বে দেওয়া মত। আঁটকুড়ির ব্যাটা আবার রাজার কাছে মাসে ২০৲ চেয়েছে, তাই না হয় দুহাজার চার হাজার চা।

স্ত্রী। হাঁগা! তা গালাগালি দাও কেন?

না। দি সাধে, আমার সব আশা নষ্ট ক'রতে ব'সেছে।

এই গালাগালির কথাটা সাপের মত প্রেমদার অন্তরে দংশন করিল, প্রেমদার চক্ষু দিয়া জল ঝরিল, কুটনা ফেলিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিল।

না। জ্ঞানদা গোল ঘরে থাকবেন।

ঘরের ভিতরে প্রেমদার মন বলিল "আমার গোল ঘরই সোনার ঘর।"

না। এখন তোমার কি মত বল?

স্ত্রী। মেয়ে রাজরাণী হবে, আমি রাজার খাশুড়ি হব, তুমি রাজার শ্বশুর হবে—এই মত; আবার কি? এখন কপাল।

প্রেমদার মন ঘরে বলিল "রাজরাণী হ'য়ে দশটা হাত বেরুবে কিনা।"

না। আবার রাজা বলেন তোমার মেয়ের কি মত শুনতে চাই

স্ত্রী। আমাদের মতেই মেয়ের মত।

প্রেমদার মন বলিল "তোমাদের মতের শ্রাদ্ধ।"

না। আজ রাত্রে রাজাকে আমাদের তিন জনের মত জানাতে হবে।

আহারাদির পর ব্রাহ্মণী কুসুমকুমারীকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! তুমি প্রেমদাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করদেখি! রাজার ছেলেকে বে ক'রবে কি, রাজার ভাগনাকে বে ক'রবে। ভাগ-নাকে রাজা বিষয় দেবে আর ছেলেকে তাড়িয়ে দেবে। রাজার ভাগনার সঙ্গে বে হ'লে রাজরাণী হবে, রাজার ছেলের সঙ্গে বে হ'লে ভিখারিণী হ'তে হবে। মা! চুপে চুপে এইসব জিজ্ঞাসা ক'রবে। প্রেমদার ভাবটা কি আমায় জানাবে। তোমার সঙ্গে তার বড় ভাব, প্রাণ খুলে কথা কয় তাই।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।

বিকালে কুসুমকুমারী সেই বাটীতে আ[illegible]লেন, প্রে[illegible] মা পাশের বাড়িতে এবং নারায়ণচন্দ্র অন্য বাটীতে [illegible]লেন। কুসুম ও প্রেমদা নির্জ্জনে কথোপকথনে নিমগ্না হইলেন।

কুসুমকুমারী নিকটের বাটীর ঝিউড়ি, ব্রাহ্মণ কন্যা। বয়স ষোল বৎসর, একটি দুই বৎসরের মেয়ে, মেয়েটীকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছেন, প্রেমদার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।

কুসুম প্রেমদার কাছে বসিয়া বলিলেন "প্রেমদা! শুনেছিস?"

প্রে। কুটনো কুটতে কুটতে শুনেছি।

প্রেমদার চক্ষু লাল হইল, বুক টিপ্ টিপ্ করিল।

কু। রাজপুত্রকে রাজা বিষয় দেবেন না।

প্রে। বিষয়ের মুখে আগুণ লাগুক।

কু। ওকি কথা ভাই! তুমি রাজরাণী হবে, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে?

প্রে। রাজরাণী হ'তে চাইনা।

কু। তবে কি রাজপুত্রকে বে করতে ইচ্ছা নাই?

প্রে। ভাই! অমন কথা ব'লনা।

কু। রাজপুত্রকে বে করবার ইচ্ছা তাহ'লে আছে।

প্রে। না থাকবে কেন?

কু। রাজা তো তাঁকে তাড়িয়ে দেবেন। তাঁকে বিষয় দেবেন না।

প্রে। বিষয়কে কি বে ক'রব নাকি? যাঁকে বে ক'রব তিনি ভাল থাকুন।

প্রেমদার দুর্গাপ্রতিমার মত মূর্ত্তিতে প্রেমের রং ফুটিয়া কুসুমকে বিমোহিত করিল, কুসুম প্রেমদার মুখের সেই রংএর দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবিলেন "এ মানবী না দেবী?"

কু। রাজার ভাগনার সঙ্গে তোমার বে হবে।

প্রে। কলসী, দড়ি আর জলের সঙ্গে বে হবেনা?

কু। ওমা! ওকি সব কথা? জ্ঞানদাকে দেখে মজে গেছিস বুঝি?

তখন প্রেমদার অস্তিত্বে একটা কোমল ভাবের তেজ উঠিল। সেই তেজে ফুলিতে ফুলিতে প্রেমদা আপনাকে রাজপুত্রের দরিদ্রতা, কারাবাস, নির্ব্বাসন প্রভৃতি দুরাবস্থার সঙ্গিনী হইবার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং প্রতিজ্ঞার সময়ে আপনার জীবনে সুখের অনন্ত সমুদ্র স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। বিষয় সম্পত্তি মণিমুক্তা প্রভৃতি অসার বোধে শ্মশানে বনে লোকের দ্বারে দ্বারে জ্ঞানদার ছায়ার মত থাকিতে আপনাকে ভাগ্যবতী বোধ করিলেন, সেই সব ভাবে পূর্ণ হইয়া বলিলেন "আমি সব শুনেছি, বাবা আমাকে রাজরাণী ক'রতে চান। যাকে তুই বলিস, আমার দেহ প'ড়ে থাকবে, তার সঙ্গে যেন রাজার ভাগনার বে দেয়। আমি যাঁকে মনে মনে বরণ ক'রেছি, তিনি যদি আমায় পরিত্যাগ করেন, তাহা আনন্দে সহ্য করিব; কিন্তু মা বাপ যদি

রাজার ভাগনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেষ্টা পান, তো, বিষ খেয়ে কি জলে ডুবে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।" বলিয়াই প্রেমদা উন্মাদিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে গিয়া খিল দিলেন।

কুসুম ভয় পাইয়া ছুটিয়া প্রেমদার মাকে খবর দিল। প্রেমদার মা ত্রস্ত আসিয়া, প্রেমদাকে ডাকিলে প্রেমদা হড়াৎ করিয়া খিল খুলিয়া দিলেন, রক্তিম সজল চক্ষে ঘরের মেজেতে শয়ন করিলেন। মা মেয়ের ভাব দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নারায়ণচন্দ্র আসিলে ব্রাহ্মণী কুসুমের মুখে যা শুনিয়াছিলেন সব খুলিয়া বলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "রেখে দাও ও সব জ্যাটামি। ছেলে মানুষকে ও সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তুমিই তো গোল বাধিয়েছ। ঋষিরা সাধে ব'লেছেন "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" স্ত্রীলোকের কথায় কোন কাজ ক'র্‌বো না। রাজার ভাগনার সঙ্গে বে দেব দেব দেব।

ব্রা। ভাগনা আগে বিষয় পাগ তবে বিয়ে।

না। তাতো ঠিক—আমি এত বোকা নই।

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে প্রেমদা আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণয়োদ্যানে জলসেক করিতেছিলেন।

রাত্রে নারায়ণচন্দ্র রাজাকে বলিলেন "আপনার ভাগনাকে যদি বিষয় দেন, তো, ভাগনার সঙ্গে বে দেব, আর যদি জ্ঞানদা বিষয় পায়, তো, জ্ঞানদাকে মেয়ে দেব।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন "আপনার স্ত্রীর মত কি?"

না। ঐ মত।

রা। মেয়ের মত।

না। মা বাপের কাছে মেয়ে কি মনের ভাব বলবে। তা আপনাদের বাড়িতে যখন যাবে আপনারা চেষ্টা ক'রে এবং মেয়ের মত বুঝতে পারবেন। আমি মেয়ের মত ঠিক বুঝতে পারছিনা।

বলিয়াই নারায়ণচন্দ্র ভাবিতেছেন "কি ব'লতে কি ব'লাম।'



দশম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

চূড়ান্ত পরীক্ষা।

কয়েকদিন পরে প্রাতে পাল্কি করিয়া রাজবাটীতে প্রেমদাকে আনান হইল, প্রেমদা গিয়া দেখেন রাজরাণীর আগের সাজসজ্জা নাই। একখানি চওড়াপেড়ে বিলাতী শাটী পরিধান, হাতে দুগাছি লোহা আর শাঁখা। রাণী আপনার ঘরের মেজেতে রহিয়াছেন। প্রেমদা হেমন্ত ও নিস্তারিনীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলে, রাণী প্রেমদাকে আপনার কাছে বসিতে বলিলেন। নিস্তারিনী ও হেমন্ত রাণীর সঙ্কেতে চলিয়া গেল, সে ঘরে আর কেহ নাই। রাণীর সেই সামান্য বেশ দেখিয়া প্রেমদা বিস্মিতা হইলেন। প্রেমদা রাণীর বেশের দিকে বার বার তাকাইতে থাকিলেন। রাণী কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন "আর মা! একশবার দেখছ কি? কপাল ভাল নয়। ছেলের সঙ্গে আমাকেও রাজ্য সম্পত্তি ছাড়তে হ'লো।

প্রেমদা বিস্মিতা ও দুঃখিতা হইয়া অতি কাতরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন "কেন?"

প্রেমদার চক্ষে জল আসিল, রাণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "ছেলে রাজ্য সম্পত্তির উপর চটা, সে একলা সামান্য একটী ঘরে থাকতে চায়, পড়াশুনা আর চক্ষু মুদে ভাবা এতেই তার স্বর্গ। পুরাতন গোল বাড়িটী পসন্দ ক'রেছে। তা তোমার বে? তোমার

বাপ মা যদি আমার ছেলের সঙ্গে দেন তো ভালই, চাকর চাকরাণী রাজা আমাদের দেবেন না। আমি তুমি দুজনে ছেলের সেবা ক'রবো, আর আমার ভাগনার সঙ্গে যদি তোমার বে হয় তা সে তোমার মা বাপের ইচ্ছা। রাজা তোমার সঙ্গে আমার ভাগনার বে দিতে চান, তোমার বাপের তাই ইচ্ছা, পরশু রাত্রে তোমার বাবা রাজাকে সে কথা ব'লেছেন। একবার গোলবাড়িটা দেখতে যাব, পরিষ্কার টরিষ্কার তো ক'রতে হবে, তাই একবার দেখে আসি মা! মানুষের দশদশা, এখন গরিবের চালে চ'লতে হবে, তা তুমি নিস্তারিণীর কাছে থাক, আমি হেমন্তকে ল'য়ে গাড়ি ক'রে একবার গোলবাড়িটা দেখে আসি। প্রেমদা অমনি তাড়াতাড়ি অতি কাতরভাবে বলিলেন "আমি সঙ্গে যাব।"

রা। সে সব কি আর তোমার ভাল লাগবে, তুমি কয়দিন পরে এই সব ঘর বাড়ি বাজন্ত দখল ক'রবে—রাজরাণী হবে।

প্রে। না মা! আমি সঙ্গে যাব।

প্রেমদা হঠাৎ আজ রাণীকে "মা!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, যেন রাজকুমারের সঙ্গে প্রেমদার বাস্তবিক বিবাহ হ'য়েছে। মনের ভিতরে যা ভাব তা আপনি ব্যক্ত হয়।

রা। তবে আর হেমন্তর যাবার দরকার কি? দুজনেই যাব, কিন্তু এ সব গহনা তো খুলতে হবে, আমার মত কাপড় প'রে যেতে হবে।

প্রেমদা মহা আনন্দে গহনা খুলিতে লাগিলেন, গহনা খুলিলে রাণী একখানি বিলাতী শাটী পরিতে দিলেন। প্রেমদার রূপ আর কোথায় লুকাবে, গহনাতে রূপ যেন চাপা পড়িয়াছিল, এখন রূপ ষোল কলায় ব্যক্ত হইল, রাণী একদৃষ্টে সেই রূপ দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়া, রাণী ও প্রেমদা গোলবাড়িতে চলিলেন, সেখানে কুড়ি বাইশটী হাতীর মত গাভী, দশবারটী বাছুর, পনের ষোলটী বলদ, তত বড় গোরু প্রেমদা জীবনে দেখে নাই। এক একটী গাভীর ৭।৮ সের দুগ্ধ হয়, গাভীর বড় বড় নধর রসাল বাঁট, গোরুর এত বড় বাঁট প্রেমদা জীবনে দেখেন নাই। গোয়ালবাড়িটীও অতিশয় প্রকাণ্ড, যেন একটী মাঠ, প্রকাণ্ড একতলা কোটাবাড়ী, এক একটা কুটারি অতিশয় বড়। বারটা বড় বড় কুটারি, ছয়টাতে গোরু থাকে, একটায় চাকররা থাকে, একটায় গোরুর খড় খোল প্রভৃতি আহার দ্রব্য থাকে, আর চারটী ঘর খালি।

রাণী সেই চারটী ঘর প্রেমদাকে দেখাইয়া বলিলেন "মা! এই চারটী ঘরের তিনটীতে জ্ঞানদার কেতাব থাকবে, আর এই ঘরটীর আধখানা ঘিরে রান্নাঘর হবে—আর আধখানায় আমি থাকবো; যদি জ্ঞানর বে হয়, তো, জ্ঞান আর "বৌমা" ঐ লাই-ব্রেরির একযায়গায় থাকবে।

গোয়ালবাড়ির চাকরেরা রাণীর সে পোষাক দেখিয়া বুঝিতে পরে নাই, তাই তাহারা আপন আপন খেয়ালে, কাজে অন্যমনা ছিল, কিন্তু দাসীকে তাহারা চিনিত। তার মধ্যে রাণীর পরিচয় পাইবামাত্র, তাড়াতাড়ি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে, একে একে আসিয়া, রাণীকে ও প্রেমদাকে ষাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিতে লাগিল। তারপর করযোড়ে কাতর ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, হুকুমবাহাল করিবার জন্য করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিল। রাণী তাহাদিগকে আপাততঃ নিজ নিজ পূর্ব্বকাজে যাইতে অনুমতি দিলে, তাহারা [illegible] প্রণাম করিয়া চলিয়াগেল।

রাণী দাসীকে বলিলেন "একটা বড় ঝাঁটা আন"। দাসী ঝাঁটা আনিয়া দাঁড়াইল, রাণী দাসীর হাত হইতে ঝাঁটা টানিয়া লইলে দাসী "করেন কি? করেন কি?" বলিয়া লজ্জিতা ও ভীতা হইলেন। রাণী দাসীকে একটা দাবড়ি দিলে, দাসী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। রাণী দাসীকে বলিলেন "আমাদের একটা ব্রত আছে, তুই ঝাঁট দিলে সে ব্রত হবেনা, তুই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।"

দাসী অপ্রতিভের ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রেমদা রাণীর হাত হইতে ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইলেন। রাণী বলিলেন "তুমি কি পারবে?" প্রেমদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি খুব পারবো, ওসব আমার অভ্যাস আছে।" বলিয়া প্রেমদা তাড়াতাড়ি ঘর ঝাঁট দিতে লাগিলেন। দাসী মনের কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিল। সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ শব্দে প্রেমদা এমনি ঝাঁট দিলে যে, ঘরে একটী কুটা কোথাও থাকিল না। দাসী বলিল "এমন ঝাঁট আমরা দিতে পারিনা।"

রা। "ঐ কলসী ক'রে এক কলসী জল আন দেখি!" দাসী তাড়াতাড়ি যাইতেছিল, রাণীর ধমক খাইয়া নিরস্ত হইল। প্রেমদা আনন্দে উৎসাহে কলসী লইয়া গোয়ালবাড়ির পুকুর হইতে জল আনিল। কয়েকটা চাকর প্রেমদাকে জল আনিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; রাণীর ধমক খাইয়া তাহারা পলায়ন করিল।

রা। ঐ থান থেকে গোবর আন।

দাসী তাড়াতাড়ি ছুটিল, রাণী ধমক দিলে নিরস্ত হইল। প্রেমদা আনন্দে উৎসাহে গোবর আনিল, প্রেমদা যেন মহা উৎসবে উন্মত্ত।

রা। গোবর কলসীর জলে গোল।

প্রেমদা তাহাই করিল।

রা। বেশ করে ঘরে ঢেলে দিয়ে ঝাঁট দাও।

প্রেমদার মোহর তুলিতে যে আনন্দ, গোবরজল দিয়া ঘর ঝাঁট দিতেও সেই আনন্দ। প্রেমে সোনা গোবরের এক দর। রাণী তখন প্রেমদার ব্যবহারে আনন্দিতা হইয়া, প্রেমদাকে বাহিরে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া চুপে চুপে বলিলেন "তুমি কিছু দিন পরে রাণী হবে, তখন ঘর ঝাঁট দেওয়ানর জন্য আমি তোমার বিষদৃষ্টিতে পড়িব।"

কথা শুনিয়া প্রেমদা আকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকিলেন। যেন কাল সাপের মত, সে কথা, প্রেমদার অন্তরে দংশন করিল। রাণী জিজ্ঞাসিলেন "মা! তুমি কাঁদ কেন? কয় দিন পরে রাণী হবে—তুমি কাঁদ কেন?

প্রেমদা তখন আপনার ভাবে উন্মাদিনী হইয়া, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া, পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ভুলিয়া, রাজকুমারের পাদপদ্মে আপনাকে বলী দিবার জন্য বলিলেন "মা!—"

ভাবে প্রেমদার কথা আর বাহির হয়না;—ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রেমদা রাণীর বুকে মুখ গুঁজিয়া প্রবল বেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। রাণী প্রেমদার সে ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আঁচলে প্রেমদার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন "প্রেমদা! কাঁদ কেন মা! রাণী হবে—এর চেয়ে সুখ আর কি আছে?

রাণীর সে কথা বিষাক্ত তীরের মত প্রেমদাকে আরো কাতর করিল। রাণীর বুকে মুখ গুঁজিয়া অশ্রুজলে প্রেমদা রাণীর বুক

ভাসাইলেন। যখন প্রেমদা এই ভাবে কাঁদিতেছিলেন, তখন তাঁর চক্ষের জলে ভিজিয়া পৃথিবীর পাথর কাঁটা নরম হইতেছিল, বিষ অমৃত হইতেছিল, অসম্ভব সম্ভব হইতেছিল। কান্নার বেগ কমিলে প্রেমদা গদগদ ভাষায় বলিলেন "মা! আমি রাণী হবনা, সে সাধ আমার নাই।"

রা। কি সাধ তবে মা?

প্রে। আপনার পুত্রবধূ—

আর কথা বাহির হইলনা।

রা। তা বেশ, কিন্তু এই গোল ঘরে থাকতে হবে।

প্রে। ইহাই আমার স্বর্গ।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমদার হৃদয় মহাশক্তিতে পূর্ণ হইল।

রা। এ আশ্রয়ও যদি বিধাতা ঘুচান?

প্রে। আমার স্বর্গ তাহাতে ঘুচিবেনা।

তখন প্রেমদার মুখে চক্ষে রূপে আশ্চর্য্য শক্তি ফুটিল। রাণী প্রেমদার মূর্ত্তি, কথার সুর' অশ্রুজল, এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্নেহভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। "মা! তুমি আমার সাবিত্রী. কলিতে এমন হ'তে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিলনা। তা রাজাকে জিজ্ঞাসা করি।"

তারপর রাণী, প্রেমদা, ও দাসী গাড়ি করিয়া ফিরিয়া গেলেন। পর দিবস রাজার ভাগিণের সতীশচন্দ্রের ঘরটী রাণী ভাল করিয়া সাজাইলেন, সতীশকে সেই ঘরে চেয়ারে বসাইলেন। নানাবিধ আসবাবের মধ্যে, ততবড় ঘরের ভিতরে, সতীশ কোথায় বসিয়া আছেন, হঠাৎ ধরিবার যো নাই। রাণী প্রেমদাকে সামান্য বেশে হেমন্তের সঙ্গে সেই ঘরে পাঠাইলেন। প্রেমদা সতীশকে সে ঘরে

দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে সতীশের কথা কেহ বলে নাই। তাই প্রেমদা হেমন্তের সঙ্গে সে ঘরে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতেছে।—

হে। আমার দাদার সঙ্গে যদি তোমার বে হয়?

প্রে। কে দাদা?

হে। আমার আপনার দাদা, জাননা? সতীশ।

প্রেমদা গম্ভীর হইলেন, সে কথা বিষবৎ বোধ হইল। প্রেমদা মুখ বিকৃত করিলেন—হেমন্ত তাহা বুঝিলনা।

হে। আমার দাদা বিষয় পাবে, রাজা হবে, তুমি রাজরাণী হবে।

প্রে। ভাই! আর কি কোন কথা নাই? ওসব ভাল লাগেনা।

হে। কি কথা ভাল লাগেনা?

প্রে। বের কথা কি একশবার ভাল লাগে?

হে। জ্ঞানদা দাদার সঙ্গে বে হ'লে, তোমাকে গোয়াল ঘরে থাকতে হবে—তাই ভাই তোমাকে সেয়ানা ক'রছি। তোমারই ভালর কথা।

প্রে। তা গোয়াল ঘর কি পরিষ্কার করা যায় না?

হে। আর সতীশ দাদার সঙ্গে বে হ'লে এই ঘরে থাকবে—কেমন ঘর দেখদেখি?

প্রে। আবার ঐসব কথা কবেতো আমি যাই।

হে। আচ্ছা ভাই! ওসব কথা থাকুক। জ্ঞানদা দাদার কথা কই?

প্রে। কি কথা?

হে। তাঁর কি দুর্মতি!

প্রে। অত লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁর কি দুর্মতি হ'তে পারে?

হে। দুর্মতি না হ'লে বিষয় ছাড়তে চায়।

প্রে। ভাল বুঝেছেন তাই বিষয় ছাড়তে চাচ্ছেন। তাঁর বুদ্ধি কি তোমার আমার মত হবে? রাজা যুধিষ্ঠির কি ক'রেছিলেন? রামচন্দ্র কি ক'রেছিলেন?

হে। সতীশ দাদাও অনেক লেখাপড়া শিখেছেন—কত বুদ্ধি। বুদ্ধি দেখেইতো মামা সতীশ দাদাকে বিষয় দেবেন।

প্রে। ভাই বার বার ওসব কথা কেন? ধর্ম্মবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধির উপরে।

এই প্রকারে কথা কহিতে কহিতে, ঘরের এ জিনিস ও জিনিষ দেখিতে দেখিতে, অকস্মাৎ প্রেমদা দুর হইতে ঘরে পুরুষ দেখিয়া, মাথায় কাপড় দিয়া, লজ্জাতে ভয়েতে জড়সড় হইয়া, চুপে চুপে জিজ্ঞাসিলেন "ঘরে ও কে ভাই? শিগ্র পালাইচ।"

ওমা! ওইত আমার দাদা, তোমার বর—"এই কথা শুনিবা মাত্র, প্রেমদা লজ্জায় ঘৃণায় দ্রুত সে ঘর হইতে পলায়নোদ্যতা হইলেন; এমন সময়ে রাণী সামান্য বেশে সেই ঘরে আসিয়া প্রেমদার মাথায় হাত দিলেন। প্রেমদা আবৃত মুখে রাণীর অঞ্চল ধরিলেন। সতীশ তখন গলার শাড়া দিয়া চলিয়াগেলেন। দুই মিনিট পরেই জননীর আহ্বানে জ্ঞানদা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। চেয়ারে বসিয়া ডাকিলেন "মা! ডেকেছেন কেন?"

কোকিলের ঝঙ্কার অন্ধকারেই হউক, আর আলোকেই হউক, দিনেই হউক আর রাত্রেই হউক, সব সময়েই সুমিষ্ট। হঠাৎ জ্ঞান-

স্বর আওয়াজ পাইয়া-মাত্র, প্রেমদার সমস্ত অস্তিত্ব আনন্দে ফুটিয়া উঠিল। আনন্দে স্থির হইয়া জ্ঞানদার কথা আরো শুনিবার জন্ত কাণ সতর্ক করিলেন—ঘোমটার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সে রূপ দেখিতে লাগিলেন। আর রাণীর সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতে জ্ঞানদার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী জ্ঞানদার কিছু দূরে একটী টেবিলে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেমদাও মুখ নত করিয়া রাণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, প্রেমদার পাশে হেমন্তকুমারী। রাণী জ্ঞানদার সঙ্গে কত কথা কহিতেছেন, জ্ঞানদাও মাঝে মাঝে মার কথার উপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। সেই সব কথা যেন সপ্তস্বরা বীণার মত প্রেমদার কাণে অমৃত ঢালিতেছে, প্রেমদা প্রলুব্ধ হইয়া জ্ঞানদার এক একটী কথা গিলিতেছেন। ঘোমটার ভিতর দিয়া দেখিতে দেখিতে প্রেমদার দৃষ্টি হঠাৎ সেই রূপে স্থির হইল, হাত রাণীর আঁচল হইতে খসিয়া পড়িল। প্রেমদা অজ্ঞাতে সে ঘর, সে রাণী, সে হেমন্তকে ভুলিয়া, সেই রূপের দিকে ধ্যাননিরতা যোগিনীর মত চাহিয়া থাকিলেন। জ্ঞানদা আপনার পুস্তকে ধ্যানস্থ হইলেন, ঘর, মা; হেমন্ত, প্রেমদাকে ভুলিয়া আপনার অধ্যয়নে ধ্যানস্থ হইলেন। রাণী প্রেমদার ভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে অতি ধীরে এক পা এক পা করিয়া স্থানান্তর হইতেছেন। হেমন্তও রাণীর সঙ্কেতানুসারে ধীরে ধীরে স্থানান্তর হইতেছেন, আর প্রেমদা সেই রূপমোহে আত্মহারা হইতেছেন। ঘর হইতে রাণী ও হেমন্ত অদৃশ্য হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞানদা অধ্যয়ন হইতে অন্যমনস্ক হইয়া মুখ তুলিয়া ডাকিলেন "মা!"

শাড়া না পাইয়া—মাকে না দেখিয়া, সেই অবগুণ্ঠনবতীকে একলা দেখিয়া ভাবিলেন "একি?" তখনও প্রেমদার হুঁস হইলনা।

তারপর যখন জ্ঞানদা উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, তখন প্রেমদা দুই দিকে চাহিয়া দেখেন কেহই নাই। লজ্জিতা হইয়া মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমদা দ্রুত ঘর পরিত্যাগ করিলেন।

রাণী প্রেমদার চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া রাজাকে সব নিবেদন করিলেন। প্রেমদা কর্ত্তৃক গোয়াল ঘর পরিষ্কার ও রাণীর সহিত সেই সব কথোপকথন, শুনিতে শুনিতে রাজার চক্ষে জল আসিল। রাজা আনন্দে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "এই মাসেই বে দেব, ঐ পাঁজি খানা দাও দেখি।" রাজা ২৫ শে আষাঢ় জ্ঞানদানন্দনের সহিত প্রেমদার শুভ বিবাহের দিন স্থির করিলেন। তোমরা এক বার সব দুর্গা দুর্গা বল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•⁂•—

বিবাহ।

রাজা যশোদানন্দনের পুত্রের বিবাহ। গ্রামে হৈঃ হৈঃ রৈঃ রৈঃ পড়িয়াগেল। বালকে বালকে, বালিকায় বালিকায়, যুবায় যুবায়, যুবতীতে যুবতীতে, বৃদ্ধে বৃদ্ধে, বৃদ্ধায় বৃদ্ধায় সেই বিবাহের আলোচনা হইতেছে। গ্রামের তাসখেলা, দাবাখেলা, গল্পকরার আড্ডায়, পুকুরের ঘাটে, নদীরতীরে, কাছারিবাড়ির আমলাখানায়, দম্পতীরশয্যায়, গৃহস্থের রান্নাঘরে, হারুপিসীর নাউতলায়, গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, স্কুলের লাইব্রেরি ঘরে যেখানে সেখানে সেই কথার আলোচনা। কেহ বলিতেছে, চার লক্ষ টাকা খরচ হইবে। কেহ বলিতেছে আমি কাল ফর্দ্দ দেখিয়া আসিয়াছি, পাঁচ লক্ষটাকা দান হবে, আর চার লক্ষ টাকা খরচ হবে। কোথাও সেই কথা লইয়া ঝগড়া বিবাদ, ছেলেতে ছেলেতে মারামারি, বৃদ্ধাতে বৃদ্ধাতে ভাতার পুত্রের মাথা খাওয়াখায়ি। কেহ বলিতেছে মেয়ে চারটা পাশ করা; কেহ রাগিয়া প্রতিবাদ করিতেছে, পনের বৎসরের মেয়ে চারটা পাশ করিল কবে?—মার পেটে বুঝি একটা পাশ করে বেরয়েছিল। কেহ বলিতেছে, নারাণ মুখুজ্যের কি কপাল গা! হাতে হাতে রাজ্যলাভ! কোন ছুষ্টা অন্য

ছুষ্টাকে বলিতেছে রাজকুমার মেয়ে টার ধর্ম্ম নষ্ট আগে করে তবে বে করছে। কেহ পাশ হইতে নাক কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছে, অমন কথা বলনা, জানতে পারলে জান থাকবেনা। আর একজন উত্তর করিতেছে, ওরে বাপরে! কেলে হাঁড়িতে লুকুবো না কি? এই প্রকারে নিন্দাতে, সুখ্যাতিতে, সমালোচনাতে, ভবিষ্যদ্বাণীতে পাড়া গুলজার হইতেছে।

কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ জন রাধুনে বামুন, চল্লিশ জন হালুইকর বামুন, দল বাধিয়া রাস্তাদিয়া রাজ বাটিরদিকে গেলে, অনেকেই বলিল, এইবার লুচি মণ্ডায় গ্রাম ভরিয়া যাইবে, ওলা উঠায় দেশ উচ্ছন্ন যাবে, ডাক্তার কয় জনের কোটা হবে। অনেকে বিবাহের দিন গণিতেছেন, অনেকে ধোপাকে ভাল ভাল কাপড় কাচিতে দিতেছেন, কেহ শেলাই করাইবার জন্য ছেঁড়া জুতা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। কয়েক দিন কেবল রাস্তায় গোরুর গাড়ির ভিড়। গাড়ি গাড়ি ময়দা, গাড়ি গাড়ি চাল, গাড়ি গাড়ি আলু বেগুণ কুমড়া কলা নারিকেল কলাই কাপড়। গোরুর গাড়িতে গ্রামের বড় রাস্তা বন্ধ হইল, লোকের চলাচলের কষ্ট হইল, দেশের দোকানদারেরা নানা খাদ্যে দোকান পূর্ণ করিল। এদিকে রাজ-বাটী সাজান হইতেছে, বাঁসের বড় বড় গেট রাস্তার মাঝে মাঝে বিচিত্র পতাকায় শোভিত হইতেছে। গেটের মাথায় নবদ বাজিতেছে। বিবাহের দিন যত সন্নিকট হইতেছে, ততই গ্রামে, রাজ-বাটীতে, স্নানের ঘাটে কোলাহল লোকজন বাড়িতেছে। রাজ-বাটীতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। রাজবাটীর ফটকে ফটকে, দ্বারে দ্বারে, ভোজপুরে দাড়ি-ভুড়িওলা দ্বারবানের উগ্রমূর্ত্তি নানা ভঙ্গিমায় দ্বার রক্ষা করিতেছে। লোকজনকে চিনিয়া বিশেষ পরিচয় লইয়া

বাটীর ভিতরে যাইতে দিতেছে। গোরুর গাড়ির শ্রেণী রাজবাটীর ফটক হইতে গ্রামের বাহির রাস্তার অনেকদূর পর্য্যন্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এক একখানা গাড়ির মাল ফটকের কাছে নামিতেছে আর তৎক্ষণাৎ সেই খালি গাড়ি হড়্ হড়্ শব্দে অতিক্রান্ত অন্য ফটক দিয়া বাহির হইতেছে, গাড়োয়ান হ্যাট্ হ্যাট্ শব্দে গাড়ি সামলাইতেছে। বর্ষাকালে রাস্তা গাড়ির হাঙ্গামায় একবারে দুর্গম হইয়া উঠিতেছে, পথিকগণ অনেক কষ্টে গালি দিতে দিতে পথ অতিক্রম করিতেছে, সেই গালির অধিকাংশ রাজার উপরে পড়িতেছে। বিবাহের দিন যত সন্নিকট হইতেছে ততই রাজবাটীতে রাস্তাতে গ্রামেতে কোলাহল বাড়িতেছে। নবদের বাদ্য, ব্যাণ্ডের বাদ্য, কতরকমের বাদ্য, শঙ্খের বাদ্য গ্রামকে তোলপাড় করিতেছে। গ্রামের সমস্ত বাড়ি, পথ, ঘাট, রাজার খরচে পরিষ্কার হইল। রাস্তার ধারের কত পুকুরের পুরাতন ঘাট মেরামত করা হইল। রাজবাটীতে লোকে লোকারণ্য—রাজার কুটুম্ব, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য তস্য কুটুম্বে রাজবটীতে আর যায়গা হয়না। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাহির বাটীতে রাজবাটীর দুই তিন জন লোক বিরাজ করিতেছেন। এক মাস যাবৎ গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে নিয়মিত সিঁদা যাইতেছে। বিবাহের পনের দিন আগে হইতে রাজবাটীর বাহিরের প্রকাণ্ড মাঠে, প্রকাণ্ড সামিয়ানার তলে, বেলা আটটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত কেবল কাঙ্গালী খাইতেছে। বিবাহের চার দিন পূর্ব্ব হইতে কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ হইয়াছে। সেই সামিয়ানার তলে ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোক রোজ বিদায় হইতেছে। সেই লোকারণ্য, কোলাহল, গণ্ডগোল, চেঁচাচেঁচি, মারামারি, ঠেলাঠেলি. মুতোমুতি, হাগাহাগি যেন জীবন্ত নরকের

মূর্ত্তি ধরিয়াছে। সেই ভিড়ের চাপে কেহ কেহ হাঁপাইয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে, কাহারও ছেলে চেপটিয়া মরিতেছে, কোন স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হইতেছে। রাত্রে রাজবাটীর কোথাও যাত্রা, কোথাও নাচ, কোথাও নাটক, কোথাও চুরি, কোথাও ব্যাভিচার হইতেছে।



ঘাটে রাজকুমার দাঁড়াইলেন, জলের ভিতরে গাছ পালার প্রতিবিম্ব সকলের কাছে রাজকুমারের প্রতিবিম্ব দাঁড়াইল। রাজকুমার রাত্রের সেই সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত একখানি মুখের কথা ভাবিতে-ছিলেন। সেই মুখ—সেই মুখের ভাষা, রাত্রির ভাষার সহিত স্বর চড়াইয়া, তাঁর স্মৃতিকে উন্মত্ত করিতেছিল। সেই চাঁদমুখের কাতর প্রণয়ের ডাক, পাথরগলান কথা,—দুঃখের শেষে সুখের আলোক সদৃশ, দুরাশার বুকে আশার কুহক সদৃশ, মৃত্যুশয্যায় প্রেমের শেষ সুখস্বপ্ন সদৃশ, তাঁর স্মৃতিতে বাজিয়া সেই সৌন্দর্য্যময়ী রজনীর প্রেম-গীতের সহিত সুরে সুরে তালে তালে মিলিত হইল। আকাশে কয়েকটা পাখী মধুর শব্দ তুলিয়া অদৃশ্য হইল; গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখী হঠাৎ কলরব করিয়া উঠিল। সেই পাখীদিগের শব্দ ও কল-রব যেন তাঁর সেই চাঁদমুখের প্রেমপূর্ণ কথায় মিশিয়া গেল। আক-স্মিক বায়ুপ্রবাহে গাছের পাতায় চুপে চুপে কি কথা হইল, আর রাজকুমার সেই চুপি চুপি কথার সুরে তালে তাঁর প্রণয়িণীর কথা জড়িত দেখিয়া, রাত্রির সেই সৌন্দর্য্যে আপনাকে বিন্দু বিন্দু হারাইতে থাকিলেন। যতই আপনাকে হারাইতে থাকেন, ততই যেন সেই মধুর ধ্বনি তাঁর প্রাণ হইতে বিশ্বপ্রাণে বাজিয়া, তাঁহাকে সুখের এক নবীন রচনায় একাকার করে। প্রকৃতিতে এইরূপে আপনাকে হারাইতে হারাইতে হঠাৎ চমকিত হইলেন; আপনার যাহা প্রকৃতিতে মিশিয়াছিল, তাহা একত্র করিয়া নবগুণে শক্তিশালী হইলেন—বজ্রসম কঠিন এবং কুসুমসম কোমল হইলেন। তদ্গত-ভাবে চিন্তা করিলেন "পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কি? এই কর্ত্তব্যের বন্ধন প্রাকৃতিক। ঐ মাথার উপরে নক্ষত্র খচিত আকাশ, পিতা-মাতার মত সমস্ত জীবজন্তু বৃক্ষলতা গ্রহ উপগ্রহকে ধরিয়া আছেন।

আকাশের সহিত যেমন সকলের এক বন্ধন,—এবন্ধন ছিঁড়িলে সব নষ্ট হয়; সেইরূপ তাঁর সহিত তাঁর পিতামাতার বন্ধন, সে বন্ধন ছিঁড়িলে তাঁর মহা অপরাধ, সেই অপরাধে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্মিলন, শক্তিসম্মিলন সবই বিচ্ছিন্ন হইবে। মহাপ্রকৃতির এই একতা-বন্ধন রাখিবার জন্য, সুশীলরাম রাজ্যলালসা দূর করিয়া, হাসিতে হাসিতে বনগমনে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া, মহাকবির কবিত্বকে অমর করিয়া, মানজীবনকে মধুময় করিয়াছেন। আমি কি করিব? আমি এই অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে এক বিন্দু শিশির, আমি যদি সূত্র ছিন্ন করি, তো, আমারই বিপদ। তখন সমস্ত জগৎ আমার বিরোধী হইবে, আমি সেই বিরোধের বজ্রদাহে ভস্ম হইব। ভাল লাগুক আর খারাপ লাগুক, পিতামাতার আনন্দোৎসবকে পূর্ণ করিব। বিবাহে অমত করিবনা, তাঁরা যা বলিবেন তাই করিব। রাজকুমার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রভাবে কর্ত্তব্যসূত্র ধরিতে সক্ষম হইলেন। বিবাহ লইয়া যে যাতনাময় আন্দোলন, তাঁর মন প্রাণকে এতদিন ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল; তাহা আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপ্রভাবে শান্ত হইল।

আর সেই বনলতা? বিধাতা প্রকৃতির সুরে সুর বজায় রাখিয়া তাঁর রচনা করিয়াছেন; তাঁর চাঁদমুখ হইতে সেই কাতর প্রণয়-কলরব বাহির করিয়াছেন। মিলনেই হউক আর বিচ্ছেদেই হউক, প্রকৃতির সে মহাগীতির সুর তাল বিধাতাই বজায় রাখিবেন।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যুবরাজ আপনার আলয়ে ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাজবাটীতে বিবাহের রাত্রি।

রাজবাটীতে সাতটী মহল। প্রথম মহলে অতিথি ও ভৃত্যাবাস। দ্বিতীয় মহলে আমলাখানা—কাছারি বাড়ি। তৃতীয় মহলে কাছারির আমলাদের বাসস্থান। চতুর্থ মহলে নাচ গানের আড্ডা। পঞ্চম মহলে ঠাকুর বাড়ী। ষষ্ঠ মহলটী পাথরে তৈয়ারি। পাথরের গায়ে দেয়ালের উপরে কতরকমের কারিকুরি। সমস্ত দেওয়াল আগাগোড়া পৌরাণিক চিত্র সকলে পরিপূর্ণ—দেশী রাজমিস্ত্রির ভাস্করবিদ্যার পরিচয়। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ফটক। ফটকের দুই দুই ধারে মার্ব্বেল পাথরের দুই দুইটী করিয়া চারিটী প্রকাণ্ড স্থূল উচ্চ স্তম্ভ অর্থাৎ ফটকের বাহিরে দুইধারে দুটী স্তম্ভ, আর ভিতরে দুই ধারে দুটী স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় খোদিত লতা পাতা ফল ফুলে শোভিত বিচিত্র কার্ণিশ;—সেই কার্ণিশের মাথায় চড়াই, পায়রা ডাকিতেছে। ফটকের ভিতরের দুটী দেয়াল এক স্তম্ভ হইতে অপর স্তম্ভ পর্য্যন্ত লাবণ্যময় বিচিত্র মার্ব্বল পাথরে গ্রথিত। ফটক পার হইয়া প্রবেশ করিলে, ত্রিতল চকমহলের আপাদমস্তক ঐরূপ সুচিকণ চিত্রিত মার্ব্বল প্রস্তরে গ্রথিত। ফটকের ভিতরে দুই দিকে মার্ব্বল প্রস্তরময় দুইটী লম্বাচওড়া দালান। দালানে ঘরের দেওয়ালের প্রতি কবাটের মাথার উপরে এক এক

খানি বড় বিলাতী তৈলচিত্র। সেই সব চিত্রে ইউরোপীয় ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিলে, মনে হয় যেন রক্তপিপাসার ভীষণ রাক্ষসাকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। এই দুই দালানের পাশে বড় বড় ঘর। ঘরের দরজায় লাল, নীল, গোলাপী, স্ক্রীন্ দ্বারের উপরস্থ পিত্তলের দাণ্ডায় লম্বিত রহিয়াছে। এক একটী ঘর রাজবাটীর এক একটী ছেলের বৈটকখানা। সেই ঘরে বড় বড় টেবিল সবুজ বনাতে, লাল মখমলে আবৃত। টেবিলের উপরে লতা পাতায় চিত্রিত কাচের মস্যাধার, মস্যাধারের পাশে কলমাধার। কোন ঘরে একটী ছেলে ও একটী শিক্ষক অধ্যয়ন অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কোন ঘরে কেহ নাই, একটা লোমভরা বিলাতি কুকুর ম্যাটিংএর উপরে দাঁত বাহির করিয়া শুইয়া আছে। কোন ঘরে "ইজিচেয়ারে" শুইয়া কোন যুবা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতে পড়িতে, সুন্দরী রোহিনীর মত উপপত্নী চিন্তায়, দেহের ভিতরে ঘৃতপূর্ণ শোণিতে আগুণ জ্বালিতেছে। কোন ঘরে কেহ ইংরাজী নভেল পড়িতে পড়িতে হাসিতেছেন। কোন ঘরে কেহ খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে গোঁপে তা দিতেছেন। কোন ঘরে হেমন্তকুমারীর স্বামী নগেন্দ্র বাবু, টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারে অর্দ্ধশয়নে স্ত্রীর চাঁদমুখ ভাবিতে ভাবিতে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। কোন ঘরে কেহ কেহ রাজবাটীর কোন গুপ্ত কথা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে হাসিয়া দন্তকেলি করিতেছেন।

উপরতলে একটী প্রকাণ্ড হলে রাজা যশোদানন্দন প্রকাণ্ড সভায় বসিয়া বিষয় কর্ম্মের পরামর্শ করেন। সেই একটী হলেই দ্বিতলের সমস্ত যায়গা সমাপ্ত, সেই প্রকাণ্ড হলের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড লম্বা দালান। এই হলে ও দালানে যে মার্ব্বল পাথর

চল্ চল্ করিতেছে, তাহা নীচের পাথর অপেক্ষা দামী, সুন্দর, মসৃণ। তাদের স্বচ্ছতার ভিতরে দ্বিতীয় রাজবাটী বিরাজ করিতেছে। এই হলের অর্দ্ধাংশে কার্পেটের ম্যাটীংএ স্প্রিংএর চেয়ার; লম্বা লম্বা স্প্রিংএর খাটে পালঙ্কের গদি—মখমলে ঢাকা; গোল, চৌকাণ, ত্রিকোণ কতরকমের পালিশকরা মেহগিনীর, বাঁশের, হাতির হাড়ের চেয়ার, খাট, আলমারি, বাক্স, টেবিল ইত্যাদি। মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা মখমলে ঢাকা পুরু বিছানা। আর হলের চারি ধারে দুই দুই দরজার মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দেয়ালে, গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধান মানুষসমান বড় বড় আয়না; একটা আয়নার ভিতরে সেই হলের সমস্তই বিরাজ করিতেছে। প্রত্যেক আয়নার দুইহাত উপরে ইন্দ্রালয়ের উপযুক্ত নানাবিধ তৈলচিত্র, ফটোগ্রাফ্‌-চিত্র শোভা দিতেছে। কোন চিত্রে "নেপোলিয়ান বোনাপার্ট" অশ্বারোহণে সৈন্য চালনা করিতেছেন। কোন চিত্রে বীর ইংরাজের বিরাট সভায়, মহারাজ "জন" ম্যাগনাকার্টায় আপনার নাম সই করিয়া, স্বাধীনতা সূর্য্যের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। কোন চিত্রে ট্রাফালগারের যুদ্ধে, বড় জাহাজে মহাবীর "নেলসন" যুদ্ধমদে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, যুদ্ধচালনা করিতেছেন। কোন চিত্রে তৃতীয় "নেপো-লিয়নের" লজ্জিত গলে সোণার অধীনতা পরাইবার জন্য, কুটবুদ্ধি "বিস্‌মার্ক" নবীন জর্ম্মণ জাতীর আনন্দগৌরবে পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোন চিত্রে ভারতের গৌরব মহাবীর "শিবজী" শিবমূর্ত্তির সম্মুখে গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া মোগল রাজ্য পুড়াইবার জন্য অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন। সে ঘরের কড়ির নীচে, চাঁপার বর্ণের বড় বড় টানা পাখা নানাবিধ লতায় পাতায় ফলে ফুলে পশু পক্ষীতে চিত্রিত হইয়া নয়নে তৃপ্তি দিতেছে। হলের যে অর্দ্ধাংশে রাজসভা

হয়, সে অংশটী প্রথমতঃ শতরঞ্চিতে আবৃত, তার উপরে প্রকাণ্ড শীতল পাটি, তার উপরে প্রকাণ্ড লেপ, তার উপরে অতি কোমল অতি পুরু মখমল। সেই বিছানার উপরে দেয়ালের ধারে ধারে মখমলাবৃত বড় বড় তাকিয়া। তাকিয়ার সামনে সামনে সোনার আলবোলা। হলের ধারে, সিঁড়ির উপরে রেশমী পাগড়ি মাথায় তরবার স্কন্ধে দুইজন সিপাহী, পাহারা দিতেছে।

ষষ্ঠ মহলের ফটকের সম্মুখে প্রকাণ্ড "সাতফুঁকুরে" দালান। সেই দালানে বারমাসে-তের পূজা হয়। দালানের দেয়াল, মেজে, থাম সবই মার্ব্বল পাথরে তৈয়ারি। এই মার্ব্বলের মেজের মধ্য-স্থলটী আবার স্ফাটিকময়।

আজ বিবাহরাত্রি। রাজবাটী দীপমালায় স্বর্গের শোভা ধরিয়াছে। বাহিরের কয়মহলে, কাঁচের লণ্ঠনে, ঝাড়লণ্ঠনে, দেয়াল-গীরিতে তৈলের আলো; কিন্তু রাজমহলের ভিতরে এবং অন্দর মহলে দামী সুগন্ধিত বাতীর আলো। বড় বড় সেজে, বড় বড় সাদা, কাল, নীল, লাল ঝাড়ে সুগন্ধিত বাতী জ্বলিয়া আলোকে সৌরভে রাজবাটী আমোদিত করিতেছে। সেই সাদা, কাল, নীল, সবুজ, লাল লণ্ঠনের আলোক সকল, রাজবাটীর স্বচ্ছতায় প্রতিবিম্বিত হইয়া মার্ব্বল পাথরের ভিতরে ভিতরে স্বর্গরচনা করিয়াছে। এই আলোকের শোভায় আকাশের শোভা হার মানিতেছে।

দুর্গোৎসবের দালানের যেস্থল স্ফাটিকময়, সেইস্থলে বরকন্যার বিবাহস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্ফাটিকের উপরে সোণা, হীরা, মুক্তা, ফুল, ফল, নৈবেদ্য প্রভৃতি বিবাহের উপকরণ সাজান হইয়াছে। স্ফাটিকের ভিতরে, মার্ব্বেলের দেয়ালের ভিতরে,

স্তম্ভের ভিতরে সেই সব প্রতিবিম্ব আলোকের সঙ্গে, বিবাহবাদ্যের তালে তালে নাচিতেছে।

হঠাৎ রাজবাটীতে বিবাহের লগ্নসূচক তোপধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ রাজবাটীর কোলাহল, গ্রামের কোলাহল থামিয়াগেল। রাজবাটীর অন্দরের একদিক হইতে, এক অসামান্যরূপা অলঙ্কার ভূষিতা বালিকা-যুবতী, বার তেরজন সমবয়স্কা সমভিব্যাহারে শঙ্খধ্বনির সহিত মন্থর গতিতে, বিবাহস্থলে নতমুখে উপস্থিত হইলেন। অন্দর মহলের অন্যদিক হইতে, কেবলমাত্র পুষ্প-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া এক দেবমূর্ত্তি, পিতা, পুরোহিত ও সমবয়স্ক বন্ধু সঙ্গে নতমুখে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। বর ও কন্যার মূর্ত্তি দুখানি, অন্যান্য মূর্ত্তির সঙ্গে স্ফাটিকে প্রতিবিম্বিত হইল।

আমি আসলমূর্ত্তি ছাড়িয়া, ঐ দুটী প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রেমদার প্রতিবিম্বখানি ভাল করিয়া দেখি, কারণ নতমুখে মুদিত নয়নে বর অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। রাজকুমারের প্রতিবিম্বখানি আমি দেখিব না। কাঁরণ আর এক জনের মাণিকচক্ষু নতমুখে চুরি করিয়া তাহা দেখিতেছেন। আমি রাজকুমারের প্রেমপূর্ণ চক্ষু আপনার চক্ষে মিশাইয়া, প্রেমদার প্রতিবিম্বখানি একবার উঁকি মারিয়া সেই জনতার মধ্যে দেখিয়া লই। ঐ দেখুন বরের কাছে কত লোক, সেই প্রতিবিম্বখানি, চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রতি-বিম্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি স্বচ্ছ স্থির জলে, পূর্ণিমা চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি। নির্ম্মল জলের ভিতরে এতকাল থাকিয়াও সে মূর্ত্তির কলঙ্ক ধৌত হয় নাই,—এজন্য বড়ই দুঃখিত আছি। কিন্তু এই প্রতিবিম্বখানি আসলমূর্ত্তির মত নিষ্কলঙ্ক এবং অলঙ্কার ভূষিত। এইজন্য চন্দ্রমা অপেক্ষা এই মূর্ত্তি আমার অধিক

মনোহারিণী। আকাশের চন্দ্রমা অতবড় আকাশে মিশিয়াও ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িল না, অত উচ্চে থাকিয়াও ক্ষুদ্রত্ব ভুলিল না।—কারণ সে বিষ অমৃত, বিষ্ঠা চন্দন, ভেদাভেদ না করিয়া, প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে। সুতরাং সে ব্যভিচারিণী। কিন্তু সামান্যা নদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্র হয়, সেইরূপ এই সামান্য ব্রাহ্মণকন্যা আজ রাজকুমারে মিশিয়া, রাজরাণী হইয়া, ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া বৃহৎ হইলেন। এইজন্য চন্দ্রমা অপেক্ষা প্রেমদার সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর। আমি অন্ধকার রাত্রে শিশিরসিক্ত দূর্ব্বাবনে, খদ্যোতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু ঐ স্ফাটিকের ভিতরে প্রেমদার প্রেমাশ্রুসিক্ত নয়নে, প্রেমদৃষ্টির সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর। খদ্যোতের রূপ এই আছে এই নাই, আর প্রেমদার নয়নে দৃষ্টির দীপ্তি ঐ প্রতিবিম্বিত রাজকুমারের রূপে স্থিরা অচলা—যেন ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান সেই রূপে চিত্রিত করিবার জন্য, দৃষ্টিতুলিকা সেই বর্ণে ডুবিয়া, আপনি পূর্ণ হইয়া, জগৎকে সেই রূপে পূর্ণ অনুভব করিতেছে। অমাবস্যার স্থির আকাশে খলিত নক্ষত্রের রূপপ্রবাহ দেখিয়াছি; কিন্তু প্রেমদার কৃষ্ণকুন্তলে মণিমাণিক্যের শোভা অধিকতর মনোহর। কারণ রাত্রির অন্ধকারে সেই নক্ষত্র-জ্যোতি ক্ষণিক। সবুজ পাতার ঝোঁপে, ফুটন্ত গোলাপের শোভা দেখিয়াছি; কিন্তু প্রেমদার আধখানি ঘোমটার ভিতরে মুখ গোলাপের শোভা অধিকতর মনোহর। কারণ সেই গোলাপ কয় ঘণ্টা পরে শুকাইয়া যায়; কিন্তু প্রেমদার মুখগোলাপ কয়েক বৎসরেও শুকাইবে না; বরং মৃত্যুস্পর্শেও, ভস্মরূপে যাহা থাকিবে, তাহা শত গোলাপের গর্ব্বনাশক।

যখন পুরোহিতের সাহায্যে প্রেমদার পুষ্পময় হাত রাজকুমারের

পুষ্পশোভিত দেহকে স্পর্শ করিল, তখন রাজকুমারে আশ্চর্য্য শোভা বাড়িল। যেন প্রেমদাজ্যোতি পুষ্পোদ্যানে পড়িয়া হাসিতে লাগিল। প্রেমদার সেই যে হস্তদ্বারা রাজকুমারের হস্তস্পর্শ— সেই স্পর্শে প্রেমদার সমস্ত চৈতন্ত একত্র হইল। প্রেমদা আপনার অস্তিত্ব ছাড়িয়া রাজকুমারের অস্তিত্বে মিশিয়াগেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে এক হইয়া, সমুদ্রের সহিত অসংখ্য রত্নের অধিশ্বরী হন, প্রেমদা সেইরূপ রাজকুমারের সঙ্গে মিশিয়া রাজ্যেশ্বরী হইলেন। রাজকুমারকে স্পর্শ করিবামাত্র প্রেমদার জীবনে বন্যা আসিল। পনের বৎসরে যত চিন্তা আসে নাই, তার শতগুণ চিন্তা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁর হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করিল। বালিকা বয়সের যে সুখবিন্দু, তাহা রাজকুমার স্পর্শে সুখসিন্ধুতে বর্দ্ধিত হইল। জীবনের আশা পূর্ণ হইয়া জীবনাধার উপচাইয়া পড়িল। বসন্ত সমাগমে পৃথিবীতে নবসৌন্দর্য্য ও নবশক্তির আবির্ভাবের মত, রাজকুমারস্পর্শে প্রেমদার পঞ্চেন্দ্রিয়ে নবযৌবনের আবির্ভাব হইল। আর সেই যৌবন শক্তি তাঁহার অবনত দৃষ্টি ভেদিয়া রাজকুমারের প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিতে নব বসন্ত অনুভব করাইয়া তাঁহাকে প্রেমোন্মাদিনী করিল। অন্ধ যেমন নিজ যষ্টিদ্বারা গন্তব্য পথ অনুভব করে, অবলা প্রেমদা রাজপুত্রকে স্পর্শ করিয়া আপনার গন্তব্যপথের পরিচালক লাভ করিলেন। অনারব্ধ জীবনলীলা এত দিন পরে প্রকৃতই আরব্ধ হইল। প্রেমদা তখন মাংসময়দেহ ধরিয়াছেন, কি আনন্দঘনমূর্ত্তি ধরিয়াছেন? প্রেম প্রেমই দেখে, প্রেম প্রেমই স্পর্শ করে। প্রেমাতীতজ্ঞান প্রেমের কখন হয় না। প্রেম ভীষণ শত্রু-মূর্ত্তিতেও প্রেমমূর্ত্তি দেখেন। যদিও রাজকুমার কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, পিতামাতার আজ্ঞামাত্র পালনে সেখানে বসিয়া সুন্দরীকে

স্পর্শ করিয়াছেন; যদিও সেই সুন্দরীকে হাতে ছুঁইয়া, মনে মনে আর এক সুন্দরীকে আলিঙ্গন চুম্বন করিতেছেন; যদিও তাঁর মুদিত নয়নের ভিতরে আর ছুটী নয়ন ফুটিয়া আর একখানি চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে প্রেমাশ্রু ফেলিতেছে; তথাপি প্রেমদা সেই মূর্ত্তিকে ছুঁইয়া, জীবনের সকল সাধের স্বর্গ পাইয়া, ফুলের গন্ধে, চাঁদের রূপে, অমৃতের আস্বাদে ডুবিতেছেন।

শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইল।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ফুলশয্যা।

রাজার বাড়ির ফুলশয্যা। তোমার আমার গরিবের বাড়ির নয়, যে, দুই এক চুবড়ি ফুলে বা বার তেরগাছা মালাতেই হবে। বিবাহের পনেরদিন আগে সমস্ত পরগণায় মালীকে খবর দেওয়া হইয়াছে। জমিদারির মালীরা ফুলশয্যার দিন সকালে ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল ও মালা লইয়া উপস্থিত। আষাঢ় মাসে বাঙ্গালাদেশে যত ভাল ভাল ফুল পাওয়া যায় সবই আসিয়াছে। বেল, জুঁই, চাঁপা রজনীগন্ধ, গন্ধরাজ, মালতী, চামেলি, গোলাপ, পদ্ম, অপরাজিতা, তরুলতা, শালুক প্রভৃতি কতরকমের সাদা, কাল, রাঙা, জরদা, লাল, নীল, সবুজ ফুল ঝুড়ি ঝুড়ি আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ দশ বার ঝুড়ি ফুলের মালা দাসীরা অন্দরে লইয়াগেল। তারপর প্রায় পঞ্চাশ ঝুড়ি ফুল তাহারা ফুলশয্যার ঘরের কাছে লইয়া-গেল। আট নয় ঝুড়ি ফুল বাহির মহল সাজাইবার জন্ম বাহিরে থাকিল।

বাহির মহলে রাজবাটীর মালীরা, মালা গাঁথিয়া, দরজার মাথায় মাথায়, লণ্ঠনের নীচে নীচে সাজাইতেছে। বৈটকখানায় তাকিয়ার সামনে সামনে, টেবিলের উপরে উপরে, গোলাপের বড় বড় তোড়া রূপার ফুলদানিতে রাখা হইতেছে। লণ্ঠনের নীচে নীচে

বেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালার মুখেমুখে এক একটী পদ্মের থোপ ঝুলিতেছে, কোন কোন থোপে ভ্রমর গুণ গুণ করিতেছে। বাহির মহলের প্রত্যেক গেট শালুকে, পদ্মে ও গোলাপে মিশাইয়া সাজান হইয়াছে। ষষ্ঠ মহলের মার্ব্বলের থাম গুলি আগা গোড়া বড় বড় গোলাপে ঢাকা হইয়াছে। গেটের উপরে জুঁইফুলের চাঁদোয়া টাঙান হইয়াছে, চাঁদোয়ার মাঝে মাঝে গোলাপের থোপ ঝুলিতেছে। সেই গেটের দুইধারে দুইটা প্রকাণ্ড অপরাজিতা ফুলের হাতী তৈয়ার হইয়াছে।

ফুলশয্যার ঘরের পাশের ঘরটী অতি সুন্দর। মার্ব্বল পাথর ঢল ঢল করিতেছে। মেজেতে মার্ব্বল, দেয়ালে মার্ব্বল। সেই দেয়ালের পাশে সারি সারি ফুলের স্তূপ। কোথাও বেলফুলের স্তূপ, কোথাও জুই ফুলের, কোথাও চাঁপার, কোথাও গোলাপের, কোথাও গন্ধরাজের, কোথাও পদ্মের। বেলে জুঁইএ পদ্মে গোলাপে চাঁপায় গন্ধরাজে বকুলে মিশিয়া এক আশ্চর্য্য গন্ধ হইতেছে। গন্ধে নাসিকারন্ধ্র পূর্ণ হইতেছে, মন আনন্দে নাচিতেছে, যেন গন্ধ খাওয়া হইতেছে। হেমন্ত, বসন্ত, নিস্তারিণী, বিনোদিনী, যামিনী, সৌদামিনী প্রভৃতি রাজ কুমারীরা আপনাদের মালা গাঁথার বিদ্যা দেখাইতেছেন। কলিকাতা, দীল্লি ও লক্ষ্ণৌএর বড় বড় ফুলওয়ালী আসিয়া, দুই তিন বৎসর ধরিয়া, তাঁহাদিগকে মালা গাঁথা শিখাইয়াছেন। সেই বিদ্যার পরিচয় পরবে পরবে হয় বটে, কিন্তু আজ রাজপুত্রের বিবাহে তার শেষ পরীক্ষা হইতেছে। উঁহারা বিশেষ সাবধানে, যত্নে, বুদ্ধি চালনায়, মহানন্দে মালা গাঁথিতেছেন। এক একটী স্তূপের কাছে এক এক জনা শুচ, সুতা লইয়া বসিয়াছেন। এক একটী বালিকা সহকারিণী হইয়া এক এক

জনের কাছে বসিয়া হাতের কাছে ফুল সরাইয়া দিতেছে। জুঁই-ফুলের শোভার ধারে ষোড়শী হেমন্ত কুমারী ও দশম বর্ষীয়া "পটলী; বেল ফুলের শোভার ধারে অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী বিনোদিনী ও দ্বাদশ বর্ষীয়া "পুঁটী"; গোলাপের শোভার কাছ পঞ্চবিংশ বর্ষীয়া নিস্তারিণী ও এয়োদশ বর্ষীয়া "ভুঁদী"; ইত্যাদি। জুঁইফুলের কাছে যদি হেমন্ত ও পটলী না বসিত, তো, রমণীফুলের সৌন্দর্য্যের সুর তালের সঙ্গে, জুঁইফুলের সৌন্দর্য্যের সুর তাল বিকৃত হইত। জুঁই-এতে হেমন্তেতে, বেলেতে বিনোদিনীতে, গোলাপেতে নিস্তারিণীতে রূপে রূপে মিশিয়া মার্ব্বল পাথরের লাবণ্যে শোভার তরঙ্গ খেলিতেছে। এমন সময়ে, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের মধ্যমণিস্বরূপিণী প্রেমদা সুন্দরী আসিয়া মধ্যস্থলে বসিলেন। তখন নক্ষত্রদলের মধ্যে চন্দ্রমার শোভা প্রকাশিত হইল। যদি কেহ সূর্য্যালোকে নক্ষত্রভুষিত পুর্ণচন্দ্রিকার শোভা দেখিতে চান, তো, অতি সবধানে অশরিরী হইয়া ঐ ঘরে একবার উঁকিমারিয়া দেখুন। প্রেমদা সেই ঘরে বসিয়া সেই সব ফুল দিয়া আপনার স্বামীকে মনে মনে সাজাইতেছেন। মনে মনে ফুলশয্যায় স্বামীর কাছে শুইয়া স্বামীর রূপে ফুলের রূপ মলিন দেখিতেছেন। মনে মনে নিদ্রিত স্বামীর পদসেবা করিতেছেন। মনে মনে কুসুম অপেক্ষা কোমল হাতকে কর্কশ ভাবিয়া, গোলাপফুল স্বামীর অঙ্গে বুলাইতে বুলাইতে কৃতার্থ হইতেছেন।

ঘরের ভিতরে ফুলের স্তূপে ভ্রমরের উৎপাত দেখিয়া, হেমন্ত "পটলী"কে সেগুলাকে তাড়াইয়া শার্শি বন্ধ করিতে বলিলে, নিস্তারিণী একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুই তোর রূপের ডালি নিয়ে যেন তাড়াতে উঠিসনি, তাহ'লে তোর শকুন্তলার দশা হবে।

বিনোদিনী বলিলেন "ভোমরাগুলো ফুলে ব'সছে কই? উড়ে উড়েই ম'রছে যে—মাগো! আঙুলের উপরে আসে যে লো!"

নিস্তারিণী বলিলেন "রোস ভাই! ওরা হেমন্তর মুখ দেখে ফুল ভুলেগেছে!"

"পটলী" ভ্রমর তাড়াইতে পারিতেছে না—ভ্রমর এ দ্বারদিয়া বাহির হইয়া, অন্য দ্বারদিয়া প্রবেশ করে—কখন পটলীর সুন্দর মুখে ভোঁ করিয়া তাড়া মারে। হেমন্ত তখন উঠিল। অনেক কষ্টে তিনটাকে তাড়াইলেন; কিন্তু দশ বারটা থাকিয়াগেল। তখন শার্শি বন্ধ করিয়া মালাগাঁথা হইতেছে। একমনে, আনন্দে, উৎসাহে, সুন্দর মুখে, সুন্দরদেহে, সৌন্দর্য্যের নানা ভঙ্গিমায়, মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হাতের অঙ্গুলিতে, সুঁচেতে, সুতাতে, ফুলেতে মিলিয়া একটা নাচ আরম্ভ হইল। নাচ মাঝে মাঝে থামিতেছে, আবার চলিতেছে। সুন্দরীদের আঙুলের রূপে ডুবিয়া সুঁচ গরবে ফুলের অঙ্গে খোঁচা মারিয়া সুতা চালাইতেছে। ফুল গাঁথিতে গাঁথিতে হেমন্ত প্রেমদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বউ! দাদাবাবুর সঙ্গে আজ কি কথা কবি?"

নি। তা তোকে ব'লবে কি?

হে। তা ভাই দুটো কথা আমরা শিখয়ে দি।

নি। শিখুতে হবে না গো শিখুতে হবে না!

হে। দাদাবাবু পণ্ডিতলোক, তাঁর সঙ্গে আমাদের মতন যা তা কথায় হবে না।

নি। তবে একখানা বই দে, মুখস্থ করুক। তুই বরের সঙ্গে কি কথা ক'য়েছিলি?

তখন বিনোদিনী উৎসাহিতা হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ হেমন্ত! তুমি তোমার ফুলশয্যার গল্প ব'লবে ব'লেছ। আজ এমন সুবিধা, এমন দিন। আজ বল ভাই শুনি!"

নি। সব খুলে ব'লবি, চাপাচুপো দিয়ে, বলিসনি।

হে। আমিতো ব'লবো, আর তোমরা ব'লবে না?

তখন "ব'লবো" "ব'লবো" বলিয়া—উপরি উপরি কথার প্রতিধ্বনি হইল।

হেমন্ত আরম্ভ করিলেন "আমাকে ভাই জা, ননদ শুইয়ে দিয়েগেল। তারপর সে এল। এসে বিছানায় ব'সলো। আমি একপেশেহ'য়ে চক্ষুমুদে শুয়ে আছি। নড়ন চড়ন নাই। ওদিকে আমার ননদাই মেঘনাদবাবু খাটের নীচে লুকয়েছে। আমি তা জানতাম, তাই, মড়ার মত শুয়েছিলাম। ওদিকে মেঘনাদবাবু খাটের নীচে ফ্যাঁচক'রে হেঁচে ফেলেছে। সে অমনি চমকে উঠেছে। আমি আর হাসি রাখতে পারি না।

নি। খাটের নীচে মিনসের নাকে বোধ হয় মশা সেঁদয়েছেল লো!

হে। তাই হবে ভাই।

বি। বল বল তারপর কিহ'ল?

হে। সে তখন খাটের নীচে গিয়ে, মেঘনাদবাবুর কাচাধরে টান দিয়েছে। মেঘনাদবাবু হাসতে হাসতে বেরিয়েগেল। আমি মুখে কাপড়দিয়ে ফুঁপয়ে ফুঁপয়ে হাসছি। সে তারপর ঘরে খিলদিয়ে, জানলা দরজা বন্ধক'রে, খাটে ব'সলো। আমি হাসি টিপে রইনু; কিন্তু ভিতরের হাসিতে দেহ ন'ড়ছে। সে তা টেরপেয়ে ব'লছে "ওকি! প্রেমকম্প হ'চ্ছে নাকি?" তখন হাসিতে আমার

চোখে জল এলো। আমার হাসি থামলো। চুপক'রে রইলাম। একটা গোলাপফুলনিয়ে থপ্‌ক'রে আমার খোপার উপরে মেলো। আমি চুপক'রে আনন্দে ভাবছি, আমিও একটা ফুল ছুঁড়ে মারি; কিন্তু বাধু বাধু ঠেকলো। সে আবার একটা ফুল নিয়ে আমার পিটের উপরে মেলো; আর একটা আমার মুখের উপরে মেলো। তখন ফুলের তিন ঘায়ে, আমার লজ্জার বাঁধ ভেঙেগেল। আমি সেই একটা গোলাপ ল'য়ে পিছুদিকে তাকে আন্দাজকরে মারলাম। তখন সে সাহস পেয়ে "ইস্ ইস্" করতে করতে আমার কাছে এসে আমার ঘোমটা খুলেদিল। আমি মুচকে হাসতে হাসতে ঘোমটা টেনে দিলাম। আবার খোলে, আমি আবার টানি। এই রকমে খানিক ঘোমটা টানাটানি ক'রল।

নি। বস্ত্রহরণ ক'রলে না?

বি। আমরণ! রোস দিন কতক যাগ।

নি। আমার তিনি একবারেই বস্ত্রহরণ ক'রেছিলেন।

বি। তারপর?

নি। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করলেন। আমি কেঁদে ফেলতেই লজ্জায় চুপক'রে রইলো।

বি। রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ! তোর ভাতার এমন চাসা।

নি। চরিত্র ছেলেবেলাথেকেই খারাপ কিনা।

বি। তারপর কি বল ভাই হেমন্ত।

হে। তারপর একহাতে আমার ঘোমটাধ'রে আর একহাতে আমার খোঁপা খুলেদিলে। আমি তখন ঘোমটাখোলা, খোঁপা-খোলা মুখে চক্ষুমুদে উঠে বসলাম। ব'সে তাড়াতাড়ি খোঁপা আটলাম—মুখে ঘোমটা টানলাম—তারপর আগের মত শুলাম।

শুয়ে আনন্দে ডগমগ হচ্ছি। ভাই তেমন আনন্দ আর হবে না। অমন সুখ আর জীবনে কি হয়?

বি। হয়লো হয়। যখন আঁতুড়ে যাবি, ছেলের চাঁদমুখ দেখবি তখন আর এক রকমের আনন্দ হবে। সে আনন্দের কাছে স্ত্রীলোকের আর আনন্দ নাই।

নি। ফুলশয্যার ও আনন্দটা আগে, তারপর ছেলের আনন্দ।

বি। তারপর তারপর। বল ভাই বল। প্রেমদাও শুনে শুনে শিখুক।

হে। তারপর আমার পায় কাছে কখন গিয়েছে তা জানি না। সেখানে বুঝি কতকগুলা ফুল ছিল। আমার পায় কাছে গেলে আমি পা সরাতে, তাঁর গায়ে আমার পা ঠেকলো। আমি তখন লজ্জায় উঠে মুখ হেঁচক'রে তাঁর দুটী পায় কাছে প্রণাম করলে, হাসতে হাসতে বলছে "তুমিতো প্রণামক'রে নিজের কাজ ক'রলে; আমি এখন কি করি, বলেই ঘোমটা খুলে তার কোলের উপরে শুইয়েই আমার মুখে এক চুমো—" তা ভাই বলতে কি? আমি তখন লজ্জায় জোরক'রে তার কোলহ'তে যেন রাগ-ক'রে শুয়ে পড়লাম। ঘরে গোলাপজল ছেল, আমার মাথায় গোলাপের পিচকারি দিল। গ্রীষ্মকাল, তাতে আমার আরাম বোধ হ'ল। আবার ফুলশয্যায় বরের হাতের পিচকারি। এরচেয়ে মিঠে জিনিস কি দুনিয়ায় আছে?

নি। আর সেদিন কি হবে! হ'লে হরিরলুট দেব।

বি। আমরণ! আবার কি ফুলশয্যার সাধ নাকি?

নি। আর বলিসনি ভাই! আমি আমার নাগরকে নিয়ে

বৎসরে বৎসরে ফুলশয্যা করি। অমন আনন্দ মেয়েমানুষের আর হয় না ভাই।

হে। আবার পিচকারি দিল। আমার ভাই কাপড় ভিজলো। তখন ভয় হ'লো, কাল হয়তো শ্বশুর বাটীর সব মনে ক'রবে, বউ বিছানায় মুতেছে। তখন আমি একটু আধ ঘোমটায় উঠে, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। আর ভাই! সেই যে লজ্জা গেল, আর একদিনও তার কাছে লজ্জাকে খুঁজে পাই না। যার জন্য শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়িকে দেখে এত লজ্জা, শ্বশুর বাড়ির কুকুর বিড়ালকে পর্য্যন্ত লজ্জা, কি আশ্চর্য্য ভাই! কোলে যেই মাথা রেখে শুলাম, অমনি তার মুখটী দেখে সব ভুলেগেলাম। সে যে কখন আমার ঘোমটা খুললে, আমার মুখথেকে কথা বার ক'রলে,—একটী কথা কইতেই যা লজ্জা! ওমা! একটী কথার সঙ্গে সঙ্গে অমনি কথার সমুদ্র উথলে উঠলো! তারপর আর কথায় কথা ফুরায় না!

নি। ঠিক কথা ব'লেছিস ভাই! পটলী, ভুঁদী, পুঁটীর এক-বার হাঁ ক'রে শুনবার রকম দেখলো!

তখন তিন বালিকা কৃত্রিম রাগে হাত নাড়িয়া, গা দুলাইয়া তবে আমরা চ'লে যাই, বলিয়া হাঙ্গামা করিলে, হেমন্ত তাহাদিগকে ভাল ভাল পুতুল দেবার লোভে ভুলাইয়া রাখিলেন।

বি। তারপর তারপর?

হে। তারপর ভাই কথা কইতে কইতে, অন্যমনস্ক হ'য়েছি, আর মাথার কাপড়, গার কাপড় সব খুলে গেছে—এক একবার যেই হুঁস হয়, অমনি গার কাপড় আঁটি—আর সে অমনি হেসে "ইস্ ইস্" ক'রে মুখের উপর চুমোবৃষ্টি করে।—

বি। তা তুই কি শুধু বৃষ্টিতে ভিজলি; তাকে ভিজুলি না।

হে। আমি ভাই সেদিন কিছু করলাম না। তা অনেক সাধাসাধি ক'রলে।

বি। কিব'লে সাধাসাধি ক'রলে।

হে। বলে আমার চুমো ফিরিয়ে দাও।

বি। তা সেদিনতো চুমো খেলি না, কবে খেলি?

হে। তা কি ভাই মনে আছে।

নি। আর ওকথা বলিসনিলো ওকথা বলিসনি—প্রথম চুম্বন—প্রথম আলিঙ্গন—ওসব ভোলা যায় না। কথায় বলে :—

"বুড়োবয়সের ছুড়োর চোটে সব ভুলতে হয়,
মাগ ভাতারের পয়লা চুমো কভু ভোলবার নয়।
পেটের জ্বালা রোগের জ্বালা সব ঠাণ্ডা রয়
চাঁদবদনের মধুর হাসি যখন মনে হয়।"

তখন সকলে হাসিতে হাসিতে আপন আপন স্বামীর প্রথম চুম্বনের কথা মনে করিয়া, সেই ফুলের রূপে সৌরভে আপনাদিগকে যেন মিশাইতে লাগিলেন।

হে। তা মনে আছে বইকি ভাই! আমি আর ব'লবো না, তোমরা এখন বল।

তখন একে একে বিনোদিনী, নিস্তারিণী, যামিনী প্রভৃতি নিজ নিজ বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী আসিয়া শার্শিতে ধাক্কা মারিলেন। শার্শি হেমন্ত খুলিয়াদিলেন। "তোরা অত রঙ্ তামাসা করবি না মালা গাঁথবি" এই কথা বলিয়া—প্রেমদাকে ডাকিয়া কোথায় লইয়া গেলেন।

এদিকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত মালা গাঁথা হইল। [illegible] প্রায় অর্দ্ধেক ফুল স্বয়ং গাঁথিয়াছিলেন। আহারাদির পর, কুড়িজন স্ত্রীলোকে বসিয়া মালা শেষ করিলেন।

রাজবাটীর বড় মালী জুঁইফুলের মশারি, দুই দরজার দুটী স্ক্রীন, আর দরজার দুধারের জন্য বেলফুলের দুটী সাদা ঘোড়া তৈয়ার করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুঁইফুলের মালা দিয়া জালের মশারির মত এমনি মশারি ও স্ক্রীন তৈয়ার হইয়াছে—মাঝে মাঝে এমনি সবুজপাতাসহিত গোলাপের থোপ দেওয়া হইয়াছে, যে দেখিলে আর চক্ষু মুদিতে ইচ্ছা হয় না। খাটে সেই মশারি টাঙ্গান হইল। দরজার মাথার পিতলের দাণ্ডায় স্ক্রীন ঝুলান হইল। হেমন্ত ও নিস্তারিণী বেলফুলের লম্বা লম্বা মালার সংযোগে মাঝে মাঝে বড় বড় গোলাপের "থোপ"দিয়া বিছানার সুন্দর আচ্ছাদন করিয়াছেন। বিছানার উপরে তাহা পাতা হইল। বালিস পর্য্যন্ত তাহাতে ঢাকা পড়িল। বিছানা আর দেখা যায় না। খাটের স্তম্ভে চাঁপার মালা এমনি জড়াইলেন যে, স্তম্ভ আর দেখা যায় না। বিছানার দুপাশে দুটী গোলাপফুলের লম্বা লম্বা পাশ-বালিশ। একটীতে সাদা বেলের মালা দিয়া লেখা "জ্ঞানদা-নন্দন"; অপরটীতে "প্রেমদা-সুন্দরী"। ঘরের চারিটা দেওয়াল সপত্র গোলাপফুলে আবৃত করা হইল। মেজের উপরটা চাঁপা, গোলাপ, ও গন্ধরাজে আচ্ছন্ন করা হইল। ঘর ফুলের রূপে সৌরভে আকুল। তার উপরে আবার গোলাপ আতরের ছড়াছড়ি।

সন্ধ্যা আসিল। প্রেমদা একটী ঘরে শুইয়া আছেন। কাছে বাটীর বার তের বৎসরের কয়েকটী বালিকা। রাণী ও হেমন্ত এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন।

বিবাহের লগ্ন স্থিরের সংবাদ পাইয়াই, সময় মহাশয়, প্রেমদার সহিত বড় দুষ্টামি করিতেছে। প্রেমদার দরকার মত না চলিয়া বড়ই অবাধ্যতা করিতেছে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডটা মাথায় ধরিয়া সময়কে চলিতে হয়, সুতরাং তার মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে যাওয়া দরকার; নহিলে বৃদ্ধ পারিবে কেন? যেখানে প্রণয়ী, নিজ বাটীতেই হউক, আর শ্বশুর বাটীতেই হউক বা বিজনবনেই হউক, প্রণয়িনীর চাঁদমুখ দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করেন, সেখানে সময় বড় ধীরে ধীরে চলেন। দুইজনের সম্মিলন হইবামাত্র সময় হিংসায় আর থাকিতে চাননা—একবারে বিদ্যুতের গতিতে ছুটিতে থাকেন। সময়ের এ দুষ্টামি সকলদেশেই দেখা যায়। বলি ওগো সময় মহাশয়! তুমি অত বেরসিক কেন? যেখানে প্রেম, সুখ, আনন্দ সেখানে তোমার অত তাড়াতাড়ি কেন? আবার যেখানে অপ্রেম, দুঃখ, যাতনা, বিচ্ছেদ, সেখানে তোমার গড়াগড়ি আরাম;—তুমি সেখানথেকে উঠিতে চাও না! যখন নবযুবতী আপনার স্বামীর বুকে উঠিয়া, স্বামীর চুম্বনে ডুবিয়া যায়, তখন তোমার এমনি হিংসা যে তুমি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সাঁ করিয়া পলাইয়া যাও—যুবতীর আনন্দ অপূর্ণ থাকে। বলি সুন্দরী যুবতীর প্রতি সকলেরইতো শুভদৃষ্টি! তোমার এত কুদৃষ্টি কেন? তোমার সব অত্যাচার সহিতে পারি, কিন্তু নববিবাহিত যুবা, যখন কচি স্ত্রীর কচি হাসিতে জগৎ ভুলিতে ভুলিতে একটা বড় মজাদার গল্প জুড়িয়াদেয়, তখন গল্পটা শেষ না হইতেই যে তুমি "গুড়ুম" করিয়া পলাইয়া যাও, সেটা সহিতে পারি না। যখন কেরাণীভায়া নাকে কাণে দুটি ভাত গুঁজিয়া রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া আফিসে ছুটে, তখন তুমি যে একটু দয়া না করিয়া টং টং

করিয়া পলাইয়াযাও, তাহা সহিতে পারি না। যখন আসামী বিচারালয়ের কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বিচারকের মুখেরদিকে দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন, তখন তুমি একটু দয়া কর না, ইহা সহিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পরীক্ষাস্থলে গলদঘর্ম্ম হইয়া, আপনার জীবনের সমস্ত শক্তি, উত্তম সেই ঘর্ম্মের সহিত বাহির করিতে করিতে তোমার সাকার মূর্ত্তিরদিকে বার বার চাহিতে চাহিতে সমস্ত জগৎ নিরাকার দেখে তখন তুমি একটু দয়া কর না; ইহা সহিতে পারি না। ট্রেন ধরিবার জন্য যখন পথিক প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে, ছুটিতে থাকে, তখন তুমি একটু দয়া কর না; ইহা সহিতে পারি না। তুমি অতি নির্দ্দয়, অতি অরসিক। আকাশের বজ্র তোমার মাথায় পড়িতে ভয় পায়, কিন্তু যুবতীর অভিসম্পাত তোমার মাথায় পড়িতে ভয় পায় না। আজ আমাদের প্রেমদার কাছে তোমার এত মন্থর গতি কেন? প্রেমদার কাছথেকে যে নড়িতে চাওনা। রূপতৃষ্ণা নাকি?

যাহা হউক সন্ধ্যারপর প্রেমদা জ্ঞানদানন্দনের বামদিকে বসিয়া, বিনোদিনী, নিস্তারিণী, হেমন্ত সমীপে ফুলশয্যার রাত্রির, সুখের খাওয়াখায়ি, পান ভোজনাদির পর, বিনোদিনী, নিস্তারিণী, হেমন্ত, বসন্ত কর্ত্তৃক ফুলের সকল প্রকার গহনায় সজ্জিতা হইলেন। তারপর সেই ফুলশয্যায় গিয়া প্রেমদা শয়ন করিলেন। প্রেমদা একপেশে হইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতেছেন। জ্ঞানদানন্দন পুষ্প পরিচ্ছদে ধীরে ধীরে সেই বিছানায় আসিয়া বসিলেন। ঘরের বাহিরে অনেকে আড়ি পাতিতেছে। জ্ঞানদা ঘরের দ্বার জানালা কিছুই বন্ধ করিলেন না। বিছানায় বসিয়া গার ফুলগুলি খুলিয়া

রাখিলেন। তারপর পুষ্পময় পাখা নাড়িয়া আপনাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। সেদিনে ঘরের টানাপাখা বন্ধ। বাতাস করিতে করিতে ঘরের ফুলের বর্ত্তমান সৌন্দর্য্যগৌরব এবং তাহাদের রাত্রিশেষে বিকৃতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে জগতের অনিত্যতায় অপনাকে ডুবাইলেন। তিনি ভাবিতেছেন "এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য এসব কেন? আমার জন্য এই সব উৎসব, এখনি আমি যদি মরি তো উৎসব থাকিবে কোথায়? এইরূপ অনেকক্ষণ ভাবিতেছেন;—ভাবিতে ভাবিতে হাতের পাখা স্থির হইল।

প্রেমদা কিছুক্ষণপরে স্বামীরদিকে ফিরিয়া শুইলেন। জুঁই-ফুলের ঘোমটার ভিতরদিয়া সেই অসংখ্যফুলের অসীম শোভার মধ্যে স্বামীর অতুলনীয় মুখের শোভায় প্রেমদার দৃষ্টি সমস্ত প্রকৃতির সহিত আনন্দে স্থির হইল। প্রেমদার মনে কেবল সেই রূপ, আর কিছু নাই;—প্রেমদার চক্ষুতে কেবল সেই রূপ, আর কিছুই নাই। প্রেমদা সে ঘর, ফুল, সৌরভ এবং বাহিরের গীত বাদ্য সব ভুলিয়া, কেবল সেই রূপ অবিরোধে দেখিতেছেন। তখন সে রূপ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই—প্রেমদা সেই রূপে—সেই রূপ প্রেমদায়—দুইএ এক। প্রেমদা জগতের কোথায়? তা জানে না—প্রেমদার জগৎ সেই মুখ। সেই রূপ দেখিতে দেখিতে প্রেমদা অজ্ঞানে সেই রূপেরদিকে অগ্রসর হইলেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, স্বামীর সেই রূপ যখন প্রেমদার দৃষ্টি ধরিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তখন তিনি আদতে জানিতে পারেন নাই। প্রেমদা সেই রূপের কাছেগিয়া, প্রেমনেশায় উন্মাদিনী হইয়া, সে রূপকে আত্মজ্ঞান করিলেন। রূপকে আত্মজ্ঞান করিয়া, সেই রূপের কোলে, সেই স্বর্গের কোলে, সেই

ভগবানের কোলে, সেই যথাসর্ব্বস্বের কোলে সর্ব্বসৌন্দর্য্য-ললাম-স্বরূপ আপনার মস্তকখানি ধীরে ধীরে উৎসর্গ করিলেন।—তারপর [illegible] কাঁদিতে লাগিলেন। জ্ঞানদানন্দন চমকিতভাবে, সেই অশ্রুপূর্ণ অনাবৃত মুখচন্দ্রমা দেখিলেন, সেই রূপের সুশীতল আভায় দৃষ্টিপাত করিলেন,—করিয়াই জানিনা কেন কি ভাবিয়া কাঁদিলেন। প্রেমদা তখন অধিক অশ্রুবশতঃ নয়ন মুদিয়া সেই রূপ মনে মনে দেখিতেছেন;—প্রেমদার অশ্রু বাড়িতেছে।

রাজপুত্র কাঁদেন কেন? তিনি ভাবিতেছেন "এ বানরের গলে, এ মুক্তার হার কেন? এ সৌন্দর্য্যকে স্ত্রী করিবার উপযুক্ত আমি নই। বনলতার সৌন্দর্য্যই আমি সামলাইতে পারি না, আর এ সৌন্দর্য্য কিপ্রকারে সামলাইব? দুইটীই সুন্দরী; কিন্তু বনলতা আমায় ভালবাসে, আমার জন্য মরিতে পারে; এজন্য সে সৌন্দর্য্য আমার অধিকতর মনোহর। আর এই যে বিবাহ,—এ সামাজিক নিয়মরক্ষা। এ বিবাহে প্রাণ নাই—মাদকতা নাই। আমি এরূপের মাধুরি যদি অধিকক্ষণ দেখি, তো, বনলতাকে ভুলিয়া যাইব—না এরূপ আর দেখিব না। রূপের আশ্চর্য্য শক্তি—এমন শক্তি ধর্ম্মে আছে বলিয়া বোধ হয় না। হাফেজ ঠিকই বলিয়াছেন, যে, রূপের তোড়ে ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব, সতীর সতীত্ব সব রসাতলে যায়। আমারও তাই বোধ হয়, বনলতার জন্য যে আমার প্রতিজ্ঞা, তাহা সব নষ্ট হইবে; সুতরাং এ রূপ আর দেখিব না।" রাজকুমার বনলতার জন্য কাঁদিতেছিলেন; বিধাতার রূপসৃষ্টির শক্তি ভাবিয়া কাঁদিতেছিলেন। আর সংসারের মায়ারজ্জুর চমৎকারিত্বে মানুষের ধর্ম্মলোপের বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতেছিলেন। তিনটী ভাবের তোড়ে মন হাবুডুবু

খাইতেছিল, প্রাণ অবলম্বনশূন্য হইতেছিল, বুদ্ধি অমৃতে বিষাধিক্য অনুভব করিতেছিল। প্রেমদার মুখের উপর বনলতার মুখ আসিয়া তাঁর মনে নানা দুঃখ স্মরণ করাইয়া অস্তিত্বকে যাতনায় ডুবাইতেছিল; তাই রাজপুত্র কাঁদিতেছিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাজকুমার বিছানা হইতে নীচে নামিলেন। প্রেমদার মাথা সে আরামের আশ্রয় হইতে পুষ্পশয্যায় পতিত হইল। প্রেমদা তাহা জানিতে পারিলেন না। আপনার আনন্দে ঘন হইয়া এমনি আত্মহারা যে কয়েকঘন্টাপরে চক্ষু চাহিয়াই দেখেন—বিছানায় সে রূপ নাই—আলো মিটিমিটি করিতেছে—গাছপালায় পাখীরা কলরব করিতেছে। তখন ধীরে ধীরে ঘরের চারিদিক দেখিলেন;—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফুলের কণ্টকপূর্ণ বালিসে মাথা রাখিলেন। এমন সুখের রাত্রে প্রেমদার দীর্ঘনিশ্বাস—এটী ভাল কথা নহে। দীর্ঘনিশ্বাসের এইতো আরম্ভ—ইহার শেষ কোথায়?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

কর্ত্তব্যজ্ঞান।

ফুলশয্যার পরদিন, সন্ধ্যার একটু আগে, রাজকুমার আপনার পুস্তকালয়ে স্প্রিংএর গদিতে শুইয়া ভাবিতেছেন :—

"মানুষ যতদিন আপনার গণ্ডিরমধ্যে থাকে, ততদিন সে কর্ত্তব্যজ্ঞানের দাস। এ দাসত্ব ছাড়িলে, তার মনুষ্যত্ব থাকে না। যখন আত্মজ্ঞান সসীম—কেবল আপনাতেই বদ্ধ, তখন এই জ্ঞানালোক তাহাকে প্রকৃতপথে চালিত করে—তাহার পথ দেখাইয়াদেয়। যখন এই সসীমত্ব ছাড়িয়া, অসীমত্বে আপনাকে মানুষ ছড়াইয়াফেলে,—যখন আপন হইতে বিশ্বকে পৃথক ভাবে না ;—কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী বৃক্ষলতা মানুষ দেবতা সবে, আপনাকে হারাইয়াফেলে অর্থাৎ সকলকেই আত্মবৎ মনে করে, তখন আর "উচিত"বোধে সে কাজ করে না। সে তখন কর্ত্তব্যজ্ঞানের অতীত তখন কর্ত্তব্যবন্ধন আপনি খসিয়া যায়, ইহাই মানুষের মুক্তি।"

"পিতামাতা আপনাদের সন্তানকে দুইভাবে পালন করিতে পারেন। কর্ত্তব্যবোধে এবং স্নেহবশে। পিতা কর্ত্তব্যবোধে পারেন, কিন্তু জননী স্নেহবশে পালন করেন। যে জননী স্নেহবশে না করিয়া, কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে সন্তান পালন করেন, তিনি বাহিরে স্ত্রীলোক কিন্তু ভিতরে পুরুষ। জগতে এরূপ জননী অতি বিরল।

"মানুষে দুটী ভাব সর্ব্বপ্রধান। একটী আত্মজ্ঞান, অপরটী

আত্মপ্রেম। সংসারে আত্মজ্ঞান অপেক্ষা আত্মপ্রেমের কাজই অধিক দেখা যায়। আত্মজ্ঞান না হইলে সংসারের অনিষ্ট হয় না। কিন্তু আত্মপ্রেমের অভাবে সংসার বিনষ্ট হয়। আমি কি বস্তু? আমার গোড়া কোথা? শেষ কোথা? এই সব প্রশ্নের অভ্রান্ত মীমাংসাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। ইহা বিচারবিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আর আত্মপ্রেম স্বাভাবিক, আমি আমার তত্ত্ব না বুঝিয়া আমাকে ভালবাসি, এবং তোমার তত্ত্ব না বুঝিয়া তোমাকে ভালবাসি। মা সন্তানের তত্ত্ব না বুঝিয়া সন্তানকে ভালবাসেন। তবে সন্তানকে চেনা চাই, এই চেনার জন্য যতটুকু বোধ তা চাই, এ বোধ জ্ঞান নহে বিশ্বাস।"

আত্মতত্ত্বের সম্যকজ্ঞান হইলে, মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতে বোধ করে, এবং সেই বোধের জন্য, সর্ব্বভূতে প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন সকল বস্তুই তাঁর যত্নের সামগ্রী। এ অবস্থায় আর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দরকার নাই। এই অবস্থায় মানুষের একটী শক্তি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের সমাপ্তি আছে—ইহার সমাপ্তি নাই। ইহা আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়। ইহাকে উহাদের কোষ বা দেহ বলা যায়। ইহার নাম সহৃতা।

আত্মবোধ ছাড়িয়া আত্মপ্রেম থাকে না। আত্মবোধ কি? বোধের অর্থ অনুভূতি—অনুভব করা। যার যত অনুভূতি প্রবল সে তত উন্নত। জগতের উন্নতি—ইহার অর্থ—অবোধ বা অননু-ভূতি হইতে বোধ বা অনুভূতিতে উত্থান। মাটীতে অনুভূতি নাই, বৃক্ষে আছে। বৃক্ষে কম, পুরুভুজে অধিক। কীটপতঙ্গে আরো অধিক। পশু বানরে আরো অধিক। দেহ যার যত উন্নত তার মানসিক অনুভূতি তত অধিক। যিনি যোগী, সিদ্ধ, তাঁর

অনুভূতির সীমা নাই। অনুভূতি যতদিন সসীম, ততদিন তিনি অসিদ্ধ—ভ্রান্ত। অনুভূতি যখন অসীম তখন তিনি সিদ্ধ—অভ্রান্ত। মানুষের সসীম অনুভূতি ব্রহ্মানুভূতিতে এক হইয়া অসীম হয়। যেমন ক্ষুদ্র জলবিন্দু সাগরে মিশিয়া বৃহৎ হয়।”

আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেম একবস্তুর দুটী অবস্থা বা গুণ মাত্র। যেমন জড়ের তিনটী মাত্র প্রধান গুণ, আমাদের জানা আছে। সেইরূপ আত্মার দুটী প্রধান গুণ আমরা জানি, একটী জ্ঞান অপরটী প্রেম, আমি আমাকে জানি ইহা আত্মজ্ঞান। আমি আমাকে বোধ করি ইহা আত্মবোধ। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রথম অবস্থা অথবা আত্মবোধই পরিমাণাধিক্যে আত্মজ্ঞান। আমি আমাকে ভালবাসি—ইহাই আত্মপ্রেম। একটী বস্তুতে একটী গুণ জ্ঞান, আর অন্য গুণ প্রেম। জানা আর ভালবাসা একবস্তু নহে। জানা ভালবাসার কারণও নহে। তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্যে ভালবাসার আধিক্য হইত। জ্ঞান ও প্রেম একবস্তু হইত। অল্প-জ্ঞানে অধিক ভালবাসা দেখা যায় এবং অধিক জ্ঞানে অল্প ভাল-বাসা দেখা যায়। আমি একটী ফুলের কোথায় কি বলিতে পারি, কিন্তু সে ফুলটীকে ভালবাসিতে না পারি। বরং জানিয়াও ফুলটীকে নষ্ট করিতে পারি। আবার ফুলটীর কোথায় কি জানি না, কিন্তু উহাকে ভালবাসিতে পারি। সুতরাং জ্ঞান ও প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু। একটী অন্যটীর কারণ নহে। আত্মজ্ঞানের আধার আত্মা। আত্মপ্রেমের আধার আত্মা। সুতরাং আত্মার একটী গুণের প্রকাশ জ্ঞানে, আর একটী গুণের প্রকাশ প্রেমে। যেমন ফুলের একটী গুণের প্রকাশ রূপে, আর একটী গুণের প্রকাশ সৌরভে। জ্ঞান যদি আত্মার রূপ হয় তো প্রেম সৌরভ। প্রেমের

নামই শক্তি—মহামায়া। এই মহা...ই জগৎ। সুতরাং এই জগৎ আত্মার প্রেম। এইজন্য জগৎ রহস্য জ্ঞানে বুঝা যায় না। প্রেমে বুঝা যায়। আত্মজ্ঞানের প্রকাশে অদ্বৈতভাব হয়। আত্মপ্রেমের প্রকাশে দ্বৈতাদ্বৈতভাব হয়। জ্ঞানে অদ্বৈত-ভাব সুতরাং কার্য্য থাকে না। প্রেমে দ্বৈতভাব এজন্য কর্ম্ম থাকে। জ্ঞানে বিশ্রাম। প্রেমে বিশ্রাম নাই। জ্ঞানে সব সমান। প্রেমে আপনি ছোট আর সব বড়। জ্ঞানে সেব্য সেবক নাই। প্রেমে সেব্য সেবক আছে। প্রেমে ... আত্মবোধে সেবার ভাব থাকায়, প্রেম অদ্বৈতভাবকে দ্বৈত করে।”

মানুষের এই যে অবস্থা শেষ অবস্থা। আমার এ অবস্থা কি হবে? বামদেবের হইয়াছে, আমার কি হবে? যতদিন না হবে ততদিন কর্ত্তব্যজ্ঞানের আলোকে পথ দেখিতে হবে। অন্ধকারে জলে ঝড়ে ঐ আলোকে পথ দেখিতে হবে। দুঃখে কষ্টে হাহা-কারের মধ্যে ঐ আলোকে পথ দেখিতে হবে। ভীষণ যাতনা, অত্যাচার বুকে ধরিয়া ঐ আলোকে চলিতে হবে। সকলি সহিতে হবে। যে সয় সেই রয়। এই সহ্যতাই মনুষ্যত্ব। এই সহ্যতাই কর্ত্তব্যজ্ঞানের শক্তি। যেখানে কর্ত্তব্যবোধ যত প্রবল, সেখানে সহ্যতা তত প্রবল। এই সহ্যতা, অনুভূতির বা জ্ঞানের পরিমাপক। যেখানে যত জ্ঞান সেখানে তত সহ্যতা। যেখানে জ্ঞান অসীম সহ্যতাও অসীম। অনুভূতির অসহ্যতায় ক্লেশ। সুতরাং সহ্যতা অনুভূতির স্বাস্থ্য। এই সহ্যতা যার যত অধিক সে তত ধীর। ধার্ম্মিকতার অর্থই সহ্যতা। অধার্ম্মিকতার অর্থই অসহ্যতা। ধর্ম্মের জন্য মানুষ যত সহ্য করিতে পারে ততই তার মহত্ত্ব। যাতনা সহ্য করা যেমন বীরত্ব আনন্দ সহ্য করাও তেমনি বীরত্ব।

দরিদ্রতার পর্ণ কুটীর ছাড়িয়া রাজসিংহাসন লাভের আনন্দ সহ্য করাও বীরত্ব। অনেকে আনন্দের চাপেও মরিয়াছে। যখন এদেশে সতী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হাসিতে হাসিতে মরিতেন, তখন অগ্নির দাহক্লেশকে অপনার ধৈর্য্যবলে চাপিয়া স্বামীর সহিত স্বর্গ বাসের আশায় উল্লাসিত হইতেন। সহ্যতার সেই আদর্শদেশ হইতে গিয়া, দেশের সতীত্বকে নির্ব্বীর্য্য করিয়াছে। যখন পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন সতী দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতেছিলেন, তখন পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর পঞ্চ পাণ্ডব তাহাদের স্ত্রীর সেই দুর্দ্দশা চক্ষে দেখিয়াও ধর্ম্মের জন্য—কর্ত্তব্যের জন্য, অগ্নিপূর্ণ চুল্লির মত সহ্য করিয়াছিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন কিছু চঞ্চল হইলেও যুধিষ্ঠীর পর্ব্বতের মত স্থির ছিলেন। যুধিষ্ঠীরের এই সহ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। মানবমনের এরূপ আশ্চর্য্য সংযম শক্তি, পৃথিবীতে আর কোন দেশে আছে? জীশুর শত ক্রুশারোহণ, যুধিষ্ঠীরের এ ক্রুশারোহণের তুল্য নহে। যদি পৃথিবীর ইতিহাসে, প্রকৃত নাটক কোথাও থাকে, ধার্ম্মিকতার চরম ভাব কোথাও থাকে, তো ঐ অপমানিতা স্ত্রীর সম্মুখে, ঐ অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীরের জীবন মধ্যে সহ্যতার গুরুগম্ভীর বিশ্ববিজয়ী মূর্ত্তিতে।"

যখন পিতামাতার অর্থাৎ ধর্ম্মের অনু রোধে বিবাহ করিয়াছি; তখন স্ত্রীরপ্রতি যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। কর্ত্তব্য জ্ঞানে যেমন অনেক কাজ করি, সেইরূপ প্রেমদাকে স্ত্রী বলিব; স্ত্রীর মত ব্যবহার করিব; যাতে সে সুখে থাকে তা করিব। ফুল শয্যায় সেব্যবহারটা ভাল হয় নাই। আর বনলতা? সেখানে আমার ভালবাসা। যখন স্ত্রীভাবে মুখ চুম্বন করিয়াছি; মন তাহাতে আপনি ঝুঁকিতেছে; সে আমার মনকে কাড়িয়াছে; আমি তার মনকে কাড়িয়াছি; তখন

আমাদের দুজনের প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে। পুরুষের অধিক বিবাহে দোষ কি? স্ত্রীলোকের দোষ হইতে পারে, পুরুষে আদতে দোষ হইতে পারে না, যদি সহ্য হয়। "সপেনহিউএর" এবিষয়ে যা অখণ্ডনীয় কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ঋষিদের সঙ্গে এক হয়। *

---

* জর্ম্মনদেশের প্রথমশ্রেণীর দার্শনিক সপেনহিউএর স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলিয়াছেন :—Man by nature, is inclined to inconstancy; woman, on the contrary, to constancy in love. *The moment a man's love* is satisfied. it noticeably sinks. A woman's love on the contrary, increases from that very moment. This is the cosequence of a purpose of nature, which disigns to preserve and therefore to increase the genus, as much as possible. A man could, conveniently. beget a hundred children in a year; if as many women were at his disposal. A woman, however, with never somany men, could bear but one child in a year (putting aside twin births.) Thus it is that, he is always looking for other women, while she clings to the one she has; for nature impells her, instinctively, and without reflection to preserve the provider and defender of the future brood. Accordingly, conjugal fidelity is artificial to man, while it is natural to woman; and so woman's adultery, objectivly, on account of the cosequences, as well as subjectively, on account of its unnaturalness is farmore unpardonable, than man's.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণয়ে যুদ্ধ।

সেই দিন রাত্রি বারটার সময়ে রাজকুমার কর্ত্তব্যবোধে স্ত্রীর কাছে গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রেমদা বিছানায় শুইয়া স্বামীচিন্তায় বিভোর ছিলেন। হেমন্ত বলিয়াছিলেন "দাদাবাবু, ঠিক বারটার সময়ে শোন। সেইজন্য ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমদা ঘুরিতেছিলেন। ঘড়িতে মিনিটের কাঁটার এক একটা ঘর অত্যন্ত বড় বোধ হইতেছিল। প্রেমদা ভাবিতেছেন "হয়তো ঘড়িটা বং যাচ্ছে"। তাই দাসীকে অন্য ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। দাসী ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল "সাড়ে এগারটা"। প্রেমদা ঘরের ঘড়িতেও দেখিলেন "সাড়ে এগারটা"। মনে সন্দেহ হওয়ায়, দাসীকে বলিলেন "আস্তে আস্তে আমার শাশুড়ির ঘরের ঘড়িটা দেখে আয়, কেউ জানতে না পারে"। দাসী ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল সে ঘড়িতে এখনও সাড়ে এগারটা বাজে নি"। প্রেমদা আর কিছু না বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। কারণ স্বামীকে প্রণাম সম্ভাষণ করিতে হইবে। অধঘণ্টা পরে টং টং টং টং করিয়া বারটা বাজিল—। এঘরে ও ঘরে ভিতরে বাহিরে একবারে সত্তর কি আশিটা ঘড়ি পাঁচ ছয় মিনিট ধরিয়া বাজিতে লাগিল। টং টং, টং টং, ঢং ঢং প্রভৃতি কত রকমের শব্দে যেন বাদ্য যন্ত্রে ধ্বনি

উঠিল। তখন বাহির ফটকের মাথা হইতে পাইখানার ভিতর পর্য্যন্ত ঘড়ি মহলে, শৃগালের ধ্বনির মত মধুর শব্দের তরঙ্গ খেলিল। বাহির মহলে রাজসভাভঙ্গসূচক তোপধ্বনি হইল।

রাজকুমার একখানি বই হাতে, খোলা গায়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন। দাসী রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বারানসী কাপড়েঢাকা প্রেমদা, বিছানা হইতে নামিয়া, স্বামীকে প্রণাম করিলেন। পায়ে হাতদিতে গেলে, স্বামী লজ্জায় "ওকি ওকি?" বলিয়া একটু সরিয়া গেলেন। বেণারসী শাটীর ভিতর হইতে স্বামীকে প্রণাম করিয়াই, প্রেমদা মেজের এক ধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন। যেন বেনারসী শাটী জীবন্ত ভাবে চলাফেরা করিতেছে—। রাজকুমার খাটে বসিয়া, গম্ভীর ভাবে অন্য মনে কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। তারপর মেজের দিকে চাহিয়া দেখেন, বেনারসী শাটি লম্বা গোলাকৃতি মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—। কিয়ৎক্ষণ শাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে কর্ত্তব্যবোধে ডাকিলেন— "প্রেমদা।" সেই মধুর ডাক—মধুর হইতে মধুরতর ডাক, শুনিবামাত্র আনন্দে প্রেমদার দুই চক্ষে জল আসিল। প্রেমদাকে মা, বাপ, খুড়া, খুড়ি, দাদা, দিদি, ঐ নামে—ঐ নামের বিকৃতিতে কতবার ডাকিয়া থাকেন। সে সব ডাকে ভাল বাসা স্নেহ থাকিলেও প্রেমদা তাহা অনুভব করেন না, কেবল শব্দই শুনিয়া থাকেন। শ্বশুর বাড়িতে আজ কয় দিন শাশুড়ি, ননদ, "বউ" বলিয়া ডাকিতেছেন। বাপের বাড়ির সকল প্রকারডাক অপেক্ষা এ ডাকও বড় মধুর। কিন্তু এখন এই নির্জ্জন আলোকমণ্ডিত গৃহে, এই সুখের স্বর্গে, স্বামীর ডাকে, প্রেমদা যেন শব্দ সমুদ্রের মথিত অমৃত পান করিয়া, আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পেমদার ঠোঁটে ঠোঁট কাঁপিতেছে—যেন বাতাসে গোলাপের পাপড়িতে পাপড়ি ঠেকিতেছে। পাঠিকা। তোমার বিবাহের পর, তোমার প্রাণেশ্বর যখন তোমাকে তোমার নামধরিয়া প্রথম ডাকিয়া ছিলেন, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দে কি পৃথিবীকে আনন্দ ময় বোধ কর নাই? যদি না করিয়া থাক, তো, প্রণয়ের অমৃত ভোগ তোমার জীবনে হয় নাই।

প্রেমদা পুলকিত গাত্রে, আনন্দে ভাসিয়া, খাটের কাছে আসিয়া, দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই আছেন। রাজকুমারের সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি অন্যমনে কি ভাবিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে, খাটের কাছে প্রেমদাকে, দেখিয়া বলিলেন "এখনও শোওনি।" সেস্বর মধুরে মধুর বাজিল। প্রেমদা আস্তে আস্তে বিছানায় উঠিয়া, বিছানার পারদিকে শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর দৃষ্টি অন্য দিকে। স্বামী ভাবিতেছেনঃ--প্রেমদা আমার স্ত্রী, বিবাহিতা স্ত্রী,—তবে বনলতা কে? প্রেমময়ী প্রেমরূপিণী—জ্যোৎস্নাময়ী—প্রেমোন্মাদিনী বনলতা আমার কে? ছাদের উপর হইতে পড়িয়া, সেই দারুণ আঘাতে, যাতনা ভুলিয়া—মৃত্যু ভুলিয়া, আমার দিকে প্রাণপণে চাহিয়াছিল যে বনলতা, সেই বনলতা আমার কে? যমের পাশে শুইয়া, যমকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে মধুর স্বরে ডাকিয়া, আমার প্রাণ হরণ করিয়াছে যে বনলতা, সেই বনলতা আমার কে? জ্যোৎস্নাসাগর মথিয়া আমাকে অমৃত দিয়া নিজে হলাহল খাইয়াছে যে বনলতা, সেই বনলতা আমার কে? প্রেমদা ভাগ্যবলে রাজরাণী—দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা বিনা আয়াসে বিনা যাতনায় সমাজের নিয়মচক্রে আমার স্ত্রী—হয়তো আমার বংশধরের গর্ভধারিণী;—

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে বাল্যবিধবা—আমার জন্য মরিতে প্রস্তুত সেই হতভাগিনী বনলতা আমার কে ? আমি যদি বনলতাকে আজ বিবাহ করিতাম—হঠাৎ রাজকুমার আপনাকে সামলাইলেন—চক্ষের জল মুছিলেন—নাকের শ্লেষ্মা ঝাড়িলেন—হৃদয়ের অম্বু-দামকে চাপিয়া রাখিলেন। আত্মসংযমের বলে, আপনাকে স্থির করিয়া আপনার বামদিকে চাহিলেন—প্রেমদা কোথায় ? পার দিকে দেখেন বেনারসী শাটী মুদিয়া, প্রেমদা বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছেন। তখন রাজকুমার ভাবিলেন, আমি এ শয্যায় বনলতার চিন্তা করিব না—করাও উচিত নহে। প্রেমদার মনস্তুষ্টি করাই আমার এখন কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন করি। বনলতার চিন্তা রাত্রের জন্য দূর হউক।" রাজকুমার ঘড়ির দিকে চাহিলেন—দুইটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। ঘড়ির সে শব্দ তিনি আদতে জানিতে পারেন নাই। তখন তিনি মনে বলিলেন "বড় অন্যায় করিয়াছি—। বালিকার জীবনে স্বামীর সঙ্গে কত সাধ আশা—সে সব আমার দেখা—কর্ত্তব্য। আমি বালিকাকে অন্যায় ক্লেশ দিতেছি"। ভাবিতে ভাবিতে আবার ডাকিলেন "প্রেমদা!" প্রেমদা বিছানার সহিত মিশিয়া, এতক্ষণ মিনিটকে প্রহর ভাবিতে ছিলেন—এখন সে মধুর ডাকে তাঁর সে যাতনা দূর হইল। আনন্দের বিদ্যুতে চমকিত হইয়া—উঠিয়া বসিলেন।

স্বা। ওখানে কেন ?

প্রেমদার আনন্দ ঘন হইল ; দেহ আনন্দে কাঁপিল, রাঙাঠোঁটে রাঙাঠোঁট বার বার পড়িল। সতী আনন্দে স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁর পার উপরে মাথাদিয়া প্রণাম করিলেন। সতীর চক্ষের জল স্বামীর পা স্পর্শ করিল। স্বামী তাহা বুঝিয়া • চমকিতভাবে

জিজ্ঞাসিলেন "কেন কেন? প্রেমদা কাঁদ কেন? অসুখ ক'রছে নাকি?" বলিতে বলিতে স্বামী স্ত্রীর মুখের ঘোমটা খুলিলেন। অমনি সেই হীরক স্বর্ণভূষিত চাঁদমুখ ঘরের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। প্রেমদা অনাবৃত্ত মুখে চক্ষু মুদিয়া আনন্দে স্থির হইয়া আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এত সুখ প্রেমদার জীবনে কোনকালে হয় নাই। প্রেমদার মুদিত চক্ষে জল দেখিয়াই, রাজকুমার অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইলেন। প্রেমদাকে শুইতে বলিলেন, প্রেমদা শুইলে আপনি প্রেমদার পাশে শুইলেন, শুইয়াই প্রেমদা মুখ ঘোমটায় ঢাকিলেন।

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, প্রেমদার সেই স্বর্ণহীরক-ভূষিত অশ্রুযুক্ত চাঁদমুখে আলোকের চক্‌মকানি যদি রাজকুমার দশ মিনিট দেখিতেন, তো, তাঁর জ্যোৎস্নাময়ী বনলতা বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিত এবং তিনি আপনাকে প্রেমদার রূপের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিতেন, রূপের অদ্বিতীয় শক্তি। পাণ্ডিত্য—ঐশ্বর্য্য—ধার্ম্মিকতা রূপের শক্তিজালে জড় সড় হয়। মুক্তি প্রয়াসী যোগী যখন ভগবানের রূপ দর্শন করেন, তখন আর তাঁর মুক্তির আকাঙ্খা থাকেনা—তিনি সকল আকাঙ্খা সেই রূপের পাদপদ্মে আহুতি দেন। এই জন্য জগতে রূপই শ্রেষ্ঠ। পুরাণকার এই রূপতত্ত্ব ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাই বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মহাযোগীর হৃদয় চাঞ্চল্য দেখাইয়াছেন।

স্বামী স্ত্রীর কাছে শুইয়া মুদিত নয়নে আবার ভাবিতেছেন :—কেন?—প্রেমদার মুখের দিকে চাহিতে ভয় হয় কেন? বনলতা! তোমার জন্যই এত ভয়। আহা! তুমি দুঃখিনী বিধবা! আজ যদি তোমার প্রেমদারিমত সুখ হইত?—একি! আমার এই কি সংযম!

এই কি কর্ত্তব্য বোধ! না না আমি বনলতাকে রাত্রির জন্য ভুলিয়া যাই। দিবসে বনলতার চিন্তা করিব রাত্রে প্রেমদা। দিবসে বনলতা আমার জীবন মন হৃদয় কল্পনা স্মৃতি সব আচ্ছন্ন করিবে— রাত্রে প্রেমদা, ভালইতো, বনলতার কষ্ট নিশ্চয়ই দূর হবে। প্রেমদার মত বনলতার ও সুখ হবে, জীবন দিয়া, প্রাণ দিয়া, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, প্রেমদাকে পর্য্যন্ত দিয়া বনলতাকে সুখী করিব;— এইরাত্রের জন্য, বনলতাকে ভুলি। একি? ভুলি ভুলি করিয়া ও যে, বনলতাকে ভুলিতে পারিনা! সেরূপ—সে প্রেমমূর্ত্তি—সে মধুর ডাক—আমার অস্তিত্বে যে জ্যোৎস্নার মত—কুহুস্বরের মত— আঁধারে আলোর মত জড়াইয়া রহিয়াছে,—আমি ভুলিতে পারিতেছি কই? প্রেমদাকে দেখিয়া আমার বনলতার ভাব প্রবল হইল"। ভাবিতে রাজকুমার কাঁদিয়া ফেলিলেন—যাতনায় অস্থির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছেন "আহা! এই বিবাহে দেশের সকলেরই আনন্দ;—দেশ আনন্দময়; কিন্তু আমার বনলতার কত দুঃখ—কত যাতনা কত দীর্ঘ নিঃশ্বাস! রাজকুমার আবার চমকিত হইলেন—ভাবিলেন" না আর ভাবিব না;—এখন প্রেমদার সঙ্গে দুটা কথা কই, এই ভাবিয়া উঠিলেন। ঘরের আলো গুলি একে একে নিবাইলেন, ঘরে অন্ধকার হইল। প্রেমদা অন্ধকার দেখিয়া মুখের ঘোমটা খুলিলেন, রাজকুমার সেই অন্ধকারে খাটের দিকে চাহিয়া দেখেন অন্ধকারে রূপের আভা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে —বালিসের উপরে মুখের আভা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি তখন চমকিয়া উঠিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ সেই রূপের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিলেন। বুকটা ভয়ে টিপ্ টিপ্ করিল। "ভাবিলেন পড়িয়া বনলতাকে হারাব না কি? সদা আমার সেই

ভয়, দৃষ্টি নত করিয়া বিছানায় শুইলেন। চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বনলতা!" অন্ধকারে রাজকুমার চমকিত হইয়া জীবে দাঁত চাপিলেন। প্রেমদা তখন ধীরে ধীরে কোমলস্বরে বলিলেন "আমার নাম প্রেমদা"।

স্বা। ভুল হয়েছে। তুমি লেখা পড়া শিখেছ কত দূর?

প্রেমদা অন্ধকারে মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিলেন।

স্বা। কথার উত্তর দিচ্ছনা?

স্ত্রী। লেখাপড়া সামান্য জানি।

স্বা। তবু কি কি বই পড়েছ তা বল। কেন না কাল হতে লেখা পড়ার বন্দবস্ত হবে।

স্ত্রী। সংস্কৃত, বাবার কাছে কিছু শিখেছি; বাঙ্গালাও শিখেছি; ইংরেজী ফাষ্টবুক পড়েছি।

স্বা। মেয়ে মানুষের ইংরেজী পড়া ভালনয়। সংস্কৃত কি কি বই পড়েছ।

স্ত্রী। বিদ্যাসাগরের কৌমুদী চার ভাগ; মুগ্ধবোধের ণত্ব ষত্ব। প্রেমদার কথা ভয়ে বাহির হইতেছে!

স্বা। কৌমুদী চার ভাগ পড়িলেই কাজ চলবে। আর মেয়াদা পাণ্ডিত্যের দরকার কি? আর কি? খুলে বল? লজ্জা কি?

স্ত্রী। আর হিতোপদেশ।

স্বা। আর?

স্ত্রী। ভট্টিকাব্য।

স্বা। আর?

স্ত্রী। রঘুবংশ খানিকটা।

স্বা। আর?

স্ত্রী। কুমারসম্ভব খানিকটা।

স্বা। একবারে ব'লে যাও—আর আর ক'রে কি রাত কাটাব নাকি?

স্ত্রী। আর শকুন্তলা। আর কিছু নয়।

স্বা। বাঙ্গালা?

স্ত্রী। ভাল ভাল বই অনেক পড়েছি।

স্বা। আচ্ছা শকুন্তলার কোন কোন যায়গা খুব ভাল বল দেখি? প্রেমদা তখন লজ্জাতে চুপ করিয়া থাকিলেন।

স্বা। ঘুম পাচ্ছে?

স্ত্রী। না।

স্বা। তবে চুপক'রে রইলে?

স্ত্রী। কি ব'লবো তাই ভাবছি।

স্বা। শকুন্তলার কোন্ কোন্ যায়গা ভাললেগেছে?

স্ত্রী। সবই ভাল।

স্বা। ওরই মধ্যে কোথা কোথা খুব ভাল?

প্রেমদা অন্ধকারে মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে চক্ষু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন "সেই ভোমরাটার কথা যেখানে সেইখানটা বলি।" আবার ভাবিলেন "ওখানটা য়তো ওঁর মনোমত হবে না।" শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার যায়গাটা লি। আবার লজ্জায় ভাবিতেছেন শ্বশুরবাড়ি যাবার কথাটাইবা লি কেমনক'রে। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শকুন্তলার ছলেকে দেখে দুষ্মন্তের মিলনটা যেখানে,—সেই যায়গাটা াবিতে ভাবিতে বলিলেন "ব'লবো?"

স্বা। বল! বল!

শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের মিলনটা খুব ভাল।

প্রেমদার কোমলস্বরে সেই কথার ভিতরে রাজকুমার যেন ব্যঙ্গ অনুভব করিলেন। রাজকুমার আবার অন্ধকারে বনলতার চাঁদমুখ ভাবিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে ঘর অন্ধকার, মনটা প্রেমদা হইতে পলাইয়া, সেই কোটাঘরের ধারে, জ্যোৎস্নাপূর্ণ পথে, সেই পতিতা সুন্দরীর চাঁদমুখের লাবণ্যে সেই মধুর ডাকে ডুবিয়াগেল। রাজকুমার চিন্তাবেগে যেন বাস্তবিকই সেইখানে উপস্থিত। সেই সব গাছ, লতা, তৃণ, চাঁদের আলোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে। আলোতে ছায়াতে মিশিয়া পথে, গাছে, কোটার গায়ে, বনলতার গায়ে, নিজের গায়ে নাচিতেছে। রাজকুমার অন্যমনে জীবন্ত স্মৃতিতে উল্লাসিত হইয়া অজ্ঞাতে প্রেমদারদিকে পাশফিরিলেন। পাশফিরিয়া মুদিতনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই জ্যোৎস্নামধ্যে বনলতাকে দেখিতে দেখিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া "প্রাণেশ্বরী তুমি এখানে" বলিয়াই অন্ধকারে আলিঙ্গন করিতে গিয়া প্রেমদাকে আলিঙ্গন করিলেন। কোন ভাগ্যবানের প্রাপ্য-রত্ন যদি দাতার ভ্রমবশতঃ কোন হতভাগ্য প্রাপ্ত হয় তাহাতে সেই হতভাগ্যের যেরূপ আনন্দ; বনলতার প্রাপ্য আলিঙ্গন প্রেমদা দৈবাৎ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন এবং জীবনের সমস্ত প্রণয় দুবাহুতে লইয়া স্বামীকে প্রথম আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমদা সেই আলিঙ্গনে স্বর্গের সমস্ত অমৃত আপনার অস্তিত্বে আকর্ষণ করিলেন, রাজকুমারের তখন চমক ভাঙিল। তিনি প্রেমদার আলিঙ্গনমধ্যেই এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে প্রেমদার বুক যেন ভাঙিয়াগেল। সুধালালসায় জ্যোৎস্না-

মধ্যে থাকিয়া, সহসা বজ্রাঘাতে চকোরিনীর যাহা হয়, প্রেমদার যেন সেইরূপ হইল। প্রেমদা আস্তে আস্তে স্বামীর চক্ষে হাত দিলেন, চক্ষে জল, একি? কাঁদেন কেন? উঠিয়া সব আলোইবা নিবাইলেন কেন? আমাকে নিশ্চয়ই পসন্দ হয় নাই, আমি মনেরমত স্ত্রী হই নাই, আমার মা বাপ দুঃখী, আমি দুঃখীর ঘরের মেয়ে—তাই পসন্দ হয় নাই। কি আমি দেখিতে ভাল নই—কুরূপা তাই আমার পসন্দ হয় নাই, এই সব ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে প্রেমদা কাঁদিয়াফেলিলেন, স্বামী তাহা বুঝিলেন। মনকে স্থির করিয়া, ধীরে ধীরে প্রেমদাকে আপনার বুকের কাছে টানিলেন। তখন প্রেমদার চক্ষু শুকাইল। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। বুকেরকাছে টানিয়া স্বামী বলিলেন "প্রেমদা! তোমাকে শকুন্তার আর কোন্ কোন্ যায়গা ভাল লাগে?"

স্ত্রী। শকুন্তলা যেখানে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে।

স্বা। দুই একটা শ্লোক বলিতে পার?

প্রেমদা অনেকগুলি শ্লোক বলিলেন। ব্যাখ্যাও করিলেন।

এইরূপে অনেকক্ষণ অতীত হইল। সেই সুন্দর মুখে, অতি কোমলস্বরে, কালিদাসের শ্লোক যেন আপনার জীবন পাইয়া, রাজকুমারকে বড়ই মুগ্ধ করিল *। স্বামী তখন কোমল সুন্দরে বিগলিত হইয়া, বিধাতার কোমল সুন্দর কবিতার মুখে একটী

---

* সৌন্দর্য্যের সহিত কোমলতার সংযোগ করণে কালিদাস কাব্যজগতে অদ্বিতীয়। কোনদেশে কোন কবি তাঁহাকে এ বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

চুম্বন করিলেন। প্রেমদা তখন সাহসে জিজ্ঞাসিলেন "কাঁদছিলেন কেন ?"

স্বা। প্রেমদা তুমি এখন বালিকা।—আমার অনেক দুঃখের কথা আছে, যখন উপযুক্ত হবে বলিব।

বাহিরে প্রাভাতিক তোপধ্বনি হইল। গাছে পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল। রাজকুমার প্রেমদার মুখে আর একটী চুম খাইয়া, বিদায় লইলেন।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে এবং প্রেমদার রূপ ও মধুরস্বরে একটু আকর্ষিত হইয়া, ঐ কথাগুলি, এবং চুম্বন আলিঙ্গনগুলি রাজকুমার খরচ করিয়াছিলেন।

প্রেমদা হাসিভরামুখে সে ঘর ত্যাগ করিলেন।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রকৃতিতে জীবনের ছায়া।

রাজকুমার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পুস্তকাগারে গেলেন। পুস্তক সকলের চকচ'কে চেহারা,—চেহারার ভিতরে রস, প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, আগুণ, জল, তড়িৎ, বজ্রাঘাত, ভূকম্প, বিপ্লব প্রভৃতি জীবনের ব্যাপার লুক্কায়িত দেখিয়া তাঁর প্রাণে পবিত্র আনন্দপ্রবাহ ছুটিত; আজ সেই সব চেহারা বিশ্রী এবং রসহীন জ্ঞানহীন প্রাণহীন বোধ হইল। পুস্তকালয়ের সেই সব প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, তাঁহাদের জীবনের সুখে সুখ এবং দুঃখেও সুখ অনুভব করিতেন; আজ সেই সব মূর্ত্তি যেন অপ্রকৃত কাল্পনিক পদার্থের মূর্ত্তি বোধ হইল। সেক্ষপীয়রের মূর্ত্তির কাছে একখানি চেয়ারে বসিয়া, মনে মনে বলিলেন "সকলের মধ্যে তুমিই একজন। জীবনের সকল অবস্থাতেই তোমার শাড়া পাওয়া যায়।" তার পর সেখান হইতে উঠিয়া পুস্তকালয়ে কখনও পাইচারি করেন, কখনও জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আকাশ, মাঠ, গাছ, পাখী, সূর্য্য দেখিতে থাকেন। আজ প্রকৃতি যেন মরিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মলিন; আষাড়ের আকাশে সূর্য্য নিভু নিভু,—সে তেজ নাই—জ্যোতি নাই—আলো বড় ফিকে। গাছে পাখী ডাকিতেছে,—যেন কলের পুতুল কলে শব্দ করিতেছে। যেন সব মোমের গাছ—শোলার পাখী—তুলার মেঘ।—কিছুতেই প্রাণ নাই—মাধুরি নাই

—যেন সবই কৃত্রিম-বস্তু। কিছুই ভাল লাগে না। রাজকুমার আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে নীচে গেলেন। বিবাহ ব্যাপারের ধুমধাম এখনও থামে নাই। লোকজন-বিদায়, খাওয়া দাওয়া, নাচ গান এখনও চলিতেছে। আস্তে আস্তে লোকজনের প্রণামাদি লইতে লইতে, রাজবাটী ছাড়িয়া, একলা বনলতাদের কোটার দিকে চলিলেন। রাস্তার ধারে একটা বেলফুলের গাছ হইতে ফুল তুলিলেন—নাকের কাছে আনিলেন—গন্ধ নাই—যেন শোলার ফুল। এইরূপ রসশূন্য, প্রাণশূন্য, শোভাশূন্য প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে, মলিন মনে ভারি ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, সম্মুখে বনলতার আবাস দেখিলেন। যদিও একতোলা তথাপি রাজকুমারের বিচারে তাহা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ। সে গৃহে শোভা মাধুরি আছে—প্রাণ আছে। সেখানকার গাছ, পাতা, আকাশ যেন একটু মাধুরিযুক্ত বোধ হইল। কোটার পাশে যেখানে বনলতা শুইয়াছিলেন, সেখানকার তৃণগুলি এখনও মরে নাই—তাহাদের সবুজবর্ণের গাঢ়তর মাধুরি এখনও যায় নাই—পৃথিবীর আর সব ঘাস শুকাইয়াছে। সেখানকার ঘাসে সে রাত্রির জ্যোৎস্না সূর্য্যালোকে মিশিয়া হাসিতেছে। সেই রাত্রির জ্যোৎস্না-স্পর্শে সেখানকার বৃক্ষ, লতা, পাতা, তৃণ সবই যেন সুন্দর হইয়াছে। সেখানকার বাতাসে প্রকৃতির প্রাণবায়ু অনুভূত হইতেছে।

রাজকুমার সেইখানে দাঁড়াইয়া, কোটার ছাদের দিকে তাকাইতেছেন। বনলতা জানালা হইতে দেখিবামাত্র একটা অদৃশ্য বিদ্যুতে যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত দেখিলেন। তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ধাঁধা লাগিল। আনন্দে সমস্ত প্রকৃতির সহিত তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। জানালার ভিতর দিয়া দেখিলেন গাছে, আকাশে তাঁরই মত আনন্দের

জীবনের কয়টা দিন স্বর্গভোগ করিয়া চলিয়া যাইব। বনলতা আগে মরে, আমি সেই সঙ্গে মরিয়া মৃত্যুকে মধুর করিব। তার পর নরকে যাইতে হয়, বনলতাকে লইয়া নরকে স্বর্গ রচনা করিব। ভগবান তাহাতে বাদী হন, তো, দুইজনের কোমল আর্ত্তনাদে, দয়াময়ের প্রাণ গলাইব। যাঁর সৃষ্টিতে জলে পাথর গলে, আগুণে লোহা গলে, গীতে বাঘ সাপ গলে, তিনি কি ইহাদের অপেক্ষা কঠিন—নির্দ্দয়, তাহা কখনই নহে। যিনি মানুষকে দয়া দিয়া মহৎ করিয়াছেন, তিনি কি দয়াহীন কখনই নহে। আমাদের দুইজনের কোমল কাতর ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় গলাইব এবং জীবনের এই ভাব-সমুদ্রে যে আমাদের নিজের শক্তি নাই, তাহা দেখাইব। ঘর, সম্পত্তি, পিতা মাতা, স্ত্রী, আত্মীয় কিছুই মানিব না। সাধনা, সিদ্ধি, তপস্যা, সাধু, ভক্ত কিছুই বুঝিব না। শীঘ্রই বনলতাকে প্রাণে পুরিয়া স্বাধীনতার আকাশে উড়িব। বনলতাকে লইয়া বনের নির্জ্জনতায় নগর সম্ভোগ করিব। দুইজনের আনন্দে পাথরে মাটীতে জীবন সঞ্চার করিব, গভীর অন্ধকারে আলোক প্রকাশ দেখিব। দুইজনে পর্ণকুটীরে, বৃক্ষতলে, শৈবালের ধারে, নদীর তীরে, বসিয়া মনের সাধে গান গাহিব; করতালি দিব; গাছ লতা জড়াইয়া আনন্দ করিব; ফুলে ফুলে বিবাহ দিয়া রঙ্গ করিব। আর বনলতাকে বন ফুলে সাজাইয়া আমার রূপতৃষ্ণা মিটাইব। কয়েক বৎসর স্বরস্বতীর কৃপায় সে রূপতৃষ্ণা মিটিয়াছিল, বনলতাকে দেখিয়া আবার যখন সে তৃষ্ণা জাগিয়াছে তখন অল্পে ছাড়িব না। দেখিতেছি জগতে রূপের শক্তিই অধিক; রূপের উপাসক সকলেই। যিনি প্রণয়ী তিনি প্রণয়িনীর কুরূপে স্বর্গের পরি দেখিতেছেন। যিনি ভাবুক তিনি রাত্রির অন্ধকারে অসীম সৌন্দর্য্য সমুদ্র সম্ভোগ

করিতেছেন। যিনি ভক্ত তিনি ভগবানের রূপ দেখিবার জন্য সংসারের শত শত যাতনা তুচ্ছ করিতেছেন। তবে আর অন্য পথে যাই কেন? এই রূপের ভিতর দিয়া যদি পারি তো সেই রূপবানকে সেই রূপবতীকে ধরিব। আর বিলম্ব করিব না।" এই-রূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ১২টা বাজিল। বাহিরে তোপ ধ্বনি হইল। রাজকুমার অনিচ্ছায় কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রেমদার ঘরে গেলেন। গিয়া নতদৃষ্টিতে দাসীকে একটী আলো বাদে আর সব আলো নিবাইতে বলিলেন। দাসী আলো নিবাইয়া চলিয়াগেলে রাজকুমার সে আলোটী আপনি নিবাইলেন। অন্ধকারে বিছানায় শুইয়া ডান হাতখানি প্রেমদার পিটে বুলাইতে বুলাইতে বনলতার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বনলতা জ্ঞানে প্রেমদাকে দুই তিন বার আলিঙ্গন চুম্বন করিয়া আবার চমকিত হইয়া অপ্রতিভ হইলেন। বনলতার নাম কয়েকবার উচ্চারণ ও করিলেন। প্রেমদার কোন সন্দেহ হয় নাই। রাত্রি প্রভাতে প্রেমদার মুখচুম্বন করিয়া উঠিয়াগেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

পত্রপ্রেরণ।

রাজকুমার পুস্তকালয়ে বসিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন দাসীকে ডাকাইলেন, পুস্তকালয়ে কেহ নাই। দাসী রাজকুমারের কাছে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

রা। এক কাজ কর্‌তে পারবি? বকশিশ পাবি? পাঁচ শত টাকা।

দা। আপনার দয়া হলেই পারবো।

রা। বড় গুপ্ত কথা। আর কেহ না জানে।

দা। বাপরে! কেউ জানবেনা। প্রাণ থাকতে না।

রা। যদি কেহ তিলার্দ্ধ জানতে পারে তো, তোর ধড়ে মাথা থাকবেনা। বেশ ভেবে চিন্তে দ্যাখ?

দা। বাপরে! কেউ জান্‌তে পারবে না। জান কবুল।

রাজকুমার তখনি দাসীকে দুইটা চক চকে মোহর দিলেন। বলিলেন "এদুটা তোর ঘরে লুকয়ে রেখে এক বার পরে আয়।"

দাসী পরমানন্দে দুটা মোহর ঘরের বাক্সে রাখিয়া আসিল। রাজকুমার ইত্যবসরে এক পত্র লিখিলেন :--

"আশীর্ব্বাদ জানিবে,

আর দেরি কেন? তোমার জন্য আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। তোমার ও যদি সেই ভাব হয়, তো, লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া

আজ রাত্রি ১২ টার সময় মাঠের ধারের দীঘির পাড়ে আমার দেখা পাইবে। আমাকে একবার দেখিয়াই ঘরে ফিরিবে, আমি তোমার সহায়, কোন ভয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছায় কোন লোভে আসিও না, কেবল আমার লোভে পার তো আসিবে।

তোমারই জ্ঞানদা ”

পত্র খানি একখানি মোটা খামে পুরিয়া, খামের উপরে কিছু না লিখিয়া, দাসীকে কাছে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন “ পারবিতো? দেখিস? প্রাণ খোয়াসনি। শুধু তোর প্রাণ নয়—যদি প্রকাশ হয় তোর বংশে কাহাকেও রাখিব না। ঘর পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিব।”

দা। জান কবুল মহারাজ! কেহ জানিবে না।

রা। ক্ষুদিরাম চাটুর্য্যের বাড়ি চিনিস?

দা। চিনি না? দুবেলা যাই।

রা। তার মেয়ের নাম কি বল দেখি?

দা। বনলতা।

রা। তাকে চিনিস?

দা। চিনি না?—দুবেলা দেখাহয়।

রা। কি রকম দেখতে বল দেখি?

দা। যেন দুর্গা ঠাকরুণ, তার ভাজ বড় কাল।

রা। এই পত্রখানা নিরিবিলিতে তাকে ডেকে দিবি। কেউ জানতে না পারে।

দা। তা আমি ঠিক দেব। অধীনীকে দয়া করবেন। আমার ছোট ছেলেটীর রাজবাড়িতে যাতে একটা চাকরি হয় মহারাজ তা করবেন!

রা। পত্র কোথা দিবি বলদেখি ?

দা। তা আজ নাবার ঘাটে, যখন যাবে, তখন রাস্তায় যখন কেউ থাকবে না; কি আমি সেইখানে তাদের বাড়ির কাছে কাছে কি ঘাটের কাছে কাছে থাকিগে, সুবিধা বুঝে তবে দেব।

রা। চিটি দিয়েই চলে আসবি। আর সেখানে থাকবি না। খবরদার যেন এর বাষ্প গন্ধ কেউ জানতে না পারে।

বলিয়াই রাজকুমার তার হাতে আর একটী মোহর দিয়াই, পত্রখানি দিলেন। নিজে তার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীর সীমানা পার করিয়া দিলেন। রাজবাটীর ফটকের সম্মুখে ধীরে ধীরে পাইচারি করিতে থাকিলেন। দাসী ঠিক সময়েই চিটি লইয়া, স্নানের ঘাটে উপস্থিত। ঘাটে বনলতা গলা বুড়াইয়া কুলকুচা করিতেছেন। যেন জলে পদ্ম ফুটিয়াছে। দাসী জলেরধারে গিয়া বলিলেন "দিদি! একবার উঠে এস!"

ব। কেন লো?

আসুন বিশেষ দরকার, বলিয়াই দাসী দূর হইতে বনলতাকে সেই পত্রখানা দেখাইল, বনলতার বুক টিপ্ টিপ্ করিল, গা কাঁপিল। এক আঁটু জলে আসিয়া হাত বাড়াইলে দাসী পত্র দিল আর সেখানে দাসী দাঁড়াইল না। হন্ হন্ করিয়া রাজবাটীরদিকে ফিরিল। রাস্তায় রাজপুত্র দাসীকে দেখিয়া, তাহার মুখেরদিকে তাকাইলে সে উৎসাহে আনন্দে চঞ্চল হইয়া বলিল "মহারাজ! জলেরঘাটে কেউ ছিল না—পত্র দিয়াছি।

রা। খবরদার প্রকাশ না হয়, আর তুই খবরদার বনলতার কাছে যাবি না, গেলে ঐ শাস্তি।

"যে আজ্ঞে মহারাজ!" বলিয়া দাসী চলিয়াগেল।

এক আঁটুজলে দাঁড়াইয়া, বনলতার প্রাণ বুঝিতে পারিয়াছিল, এ রাজপুত্রের পত্র। একবার তাড়াতাড়ি চারিদিক দেখিলেন। পুকুরের গভীরতারদিকে মুখ ফিরাইয়া, ভাসমান ঘড়ার আড়ালে পত্রখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলেন। একবার পড়িয়াই পত্র বর্ণে বর্ণে কণ্ঠস্থ করিলেন। সেই পত্রের কমা সেমিকোলেন পর্য্যন্ত স্মৃতিতে উঠিল। বনলতা জীবনে সব ভুলিবেন, কিন্তু সে পত্রের কথা মৃত্যুশয্যাতেও ভুলিবেন না। সেই পত্রের হরপে হরপে বিদ্যুৎ ছিল, চাঁদছিল, আগুণের পাহাড়ছিল, সিংহের সাহসছিল অথবা বিদ্যুতে চাঁদের আলোতে অগ্নিতে সিংহের সাহসেতে মিশাইয়া সেই কালী তৈয়ার হইয়াছিল। নহিলে সে পত্র পড়িতে পড়িতে বনলতার হাতে গায়ে মাথায় শত চন্দ্র স্পর্শ করিল কেন? শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল কেন? হৃদয়ের গহ্বর খুলিয়া অগ্ন্যুদ্গম হইল কেন? অবলাহৃদয়ে সিংহের সাহস বল আসিল কেন? তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া বন্য হস্তীর বলে বনলতা ঘড়া কাঁকে করিয়া আনন্দে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ভিজা মাথায় ভিজাকাপড়ে পথে আনন্দরস ছিটাইতে ছিটাইতে প্রতি পাদবিক্ষেপে যেন পদ্ম গোলাপ ফুটাইতে ফুটাইতে গৃহে চলিলেন। সেই পত্র অতি যত্নে পেটকাপড়ে মহা রত্নের মত লুকাইয়া লইয়া গেলেন। ঘরে গিয়া ভিজা কাপড়ে আপানর বড় বাক্সের গুপ্ত স্থলে সে পত্র রাখিলেন। যদি পৃথিবীতে বনলতার সব সুখ' সব আশ্রয় যায়, তো, সেই পত্রের কয় পংক্তিতে যে, স্বর্গ আছে তাহা কেহ ভাঙিতে পারিবে না।

মাথা মুছিয়া, রান্নার আয়োজন করিতে করিতে মাকে বলিলেন "মা! আমার বড় মাথাঘুরছে আমি শুইগে! এই কথা বলিয়া বনলতা বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনা জল

স্রোতের মত সাহস বলকে সঙ্গে করিয়া আসিতে লাগিল। সেই ভাবনা চক্ষেরজলে ও মুখের দীপ্তিতে প্রকাশ পাইল। প্রেমিকা ভাবিতেছেন :—স্ত্রীলোকের যা লজ্জা তাহা আর রাখিব না, কুলের গৌরব মানিব না। শ্বশুরকুল পিতৃকুল রসাতলে যাউক, আমি রাজকুমারের সহিত অগাধসমুদ্রে সাঁতার দেব। সম্মুখে অকুলসমুদ্র দেখিতেছি—সেই সাগরে রাজপুত্রই সহায়। এসমুদ্র ঝড়ে অন্ধকারে সাতারিয়া পার হইব। যদি ডুবি তো তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতে জনমের মত ডুবিব। যদি মরণেরপর তাঁকে পাই, তবেই যেন আবার এ পৃথিবীতে আসি ; নহিলে স্বর্গেও যেন না যাই, তিনি যেখানে সেইখানেই স্বর্গ। আজ রাত্রে দীঘিরপাড়ে নিশ্চয়ই যাইব। ধরিয়া কে রাখিবে ? গুরুজন মানিব না। দেবতা মানিব না। আমার গুরুজন তিনি—দেবতাও তিনি—আর কোন দেবতা মানিব না। যখন মনে মনে বরণ করিয়াছি, হৃদয় সিংহা-সন—সতীত্বরত্ন তাঁকে দিয়াছি, তখন আর কাহাকেও মানিব না। শত তরবার বুকে লুকিয়া লইব,—বন্দুকের গুলি গিলিয়া ফেলিব,—মরিব—খণ্ড খণ্ড হইব ; তথাপি তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করিব না। আজ রাত্রে যখন সকলে ঘুমাবে, তখন আমি বাহিরে যাইব। ভয় ? লজ্জা ? যেদিন তাঁরজন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, সেই কান্নার জলে গলিয়া, ভয় লজ্জা মান অপমান অদৃশ্য হইয়াছে। বনলতা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনের আগুণ ও জল বাহির করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সম্মিলন।

বিকাশশীল জগতে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অল্প যত্নে অল্প অয়াসে অল্প সময়ে বিকশিত হয়। পুরুষের প্রকাশ উৎকর্ষে, স্ত্রীলোকের প্রকাশ স্বাভাবিকতায়। পুরুষ মনবুদ্ধি হৃদয়ের উৎকর্ষে বড়, স্ত্রীলোক মনবুদ্ধি হৃদয়ের স্বাভাবিকতায় বড়। পুরুষের মস্তিষ্ক সর্ব্বস্ব, স্ত্রীলোকের হৃদয় সর্ব্বস্ব। যে শক্তিতে মস্তিষ্ক ফোটে সেই শক্তিতে পুরুষ ফোটে। যে শক্তিতে হৃদয় ফোটে সেই শক্তিতে স্ত্রীলোক ফোটে। পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই বুদ্ধি ও মনের উপযুক্ত। স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই প্রেমের উপযুক্ত। পুরুষ বাহিরে সংগ্রাম করিবে, দেহও তদুপযুক্ত। স্ত্রীলোক গৃহে শান্তিবিধান করিবে, দেহও তদুপযুক্ত। পুরুষ রণমদে হুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপাইবে, দেহও তদুপযুক্ত। স্ত্রীলোক মধুর সঙ্গীতে গৃহকে সুখের আলয় করিবে, দেহও তদুপযুক্ত। পুরুষ আকাশে উঠিয়া বজ্রের সঙ্গে ফিরিবে, দেহও তদুপযুক্ত। স্ত্রীলোক সবুজ তৃণক্ষেত্রে মুক্তাফল তুলিবে, দেহও তদুপযুক্ত। প্রেমের শক্তি জ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অধিক। শান্তির শক্তি সংগ্রামের শক্তি অপেক্ষা অধিক। এইজন্য স্ত্রীলোকের বিকাশ অল্পসময়ে হয়। স্ত্রীলোকের সবই কোমল, সবই জল—কিন্তু সমুদ্রে বাড়বানলের মত কখনও কখনও আগুণ জ্বলিয়া সমস্ত জল আগুণ হয়।

তখন স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শক্তিময়ী সাহসময়ী। স্নেহ প্রেমের স্পর্শে স্ত্রীলোকে যত সাহস বল আসে পুরুষে তত নহে। অবলা জননী সন্তানের জন্ম বাঘের মুখে যাইতে ভয় পাইবেন না, কিন্তু পুরুষ ভয় পাইবেন। এইজন্য স্নেহে প্রেমে বা হৃদয়ের বলে স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের অধিক, পুরুষকে সংসারপথে সভ্যতারপথে রাখিয়াছেন স্ত্রীলোক। এইজন্য নারীপূজাতেই দেশের উদ্ধার—জাতীর উদ্ধার। নারীদেহেই পুরুষকে দেহলাভ করিয়া প্রকৃতিক্ষেত্রে নামিতে হয়। পুরুষ যাহা দেন স্ত্রীলোক তাহাতে সহস্রগুণদিয়া মানুষ করেন। এইজন্য স্ত্রীলোকের শক্তি অধিক। স্ত্রীলোকই পুরুষের শিক্ষক। স্ত্রীলোকের কথায় বীর-প্রকৃতি মরিতে প্রস্তুত। পৃথিবীর বীরজীবন স্ত্রীর কথার আগুণে জলিয়াছে—কথারজলে ভিজিয়াছে। স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পুরুষ, কালীর পদতলে মহাদেবের মত চিরকালই থাকিবে। এবং যত-দিন প্রকৃতভাবে থাকিবে, ততদিনই মঙ্গল। এই স্ত্রীপ্রকৃতি হইতে চরাচরের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়। মহাশক্তি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররের উৎপত্তি কথা অতি সত্য। মানুষ স্ত্রীর সুশক্তিতে উত্থিত হয় এবং কুশক্তিতে পতিত হয়। যে পুরুষ স্ত্রীর সুবাতাস পাইয়াছে, তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ যেখানে হতভাগ্য, সেখানে সে স্ত্রীর কুবাতাসে পড়িয়াছে। স্ত্রীর বাতাসকে সু কর, হতভাগ্য ভাগ্যবান্ হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকে প্রেমসংযোগে যে চরাচর কম্পিত হইবে আশ্চর্য্য কি?

আজ রাত্রি ১২টার পরে, মাঠেরধারে, দীঘিরপাড়ে প্রণয়ী প্রণয়িনীর সম্মিলনের কথা। সন্ধ্যারপর হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বৃষ্টিরশব্দে ঘরের

বাহিরে কথারশব্দ শোনা যায় না। রাজকুমার ভাবিলেন এ রাত্রে এ দুর্যোগে কি বাহির হইব? আকাশের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন বনলতা স্ত্রীলোক—এ রাত্রে এ দুর্যোগে কখনই বাহির হবে না। রাজকুমারের হিসাবে ভুল।

রাত্রিশেষে সূর্য্যকীরণস্পর্শে পৃথিবীর বায়ু প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ উপরে ফুলিয়া উঠে, প্রেমস্পর্শে নারীপ্রকৃতির এইরূপ হয়। রাজপুত্রের পত্র পড়িবামাত্র বনলতার প্রকৃতি উর্দ্ধদিকে স্ফীত হইল, হৃদয় ছিল বিন্দুসদৃশ, হইল সিন্ধুসদৃশ, জীবনের গতি ফিরিল। মানুষকে দেবতায় পাইলে যেরূপ হয়, বনলতার সেইরূপ হইল। বনলতার রক্তে মনে আগুণ জ্বলিল। বনলতায় তখন বীরপুরুষের বুদ্ধি বল সাহস অসিয়াছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা আদতে কম নহে—উৎকর্ষে কম। যখন প্রণয়ে স্ত্রীবুদ্ধির সংযোগ হয়, তখন স্ত্রীলোক প্রণয়ীর সহিত মিলনের জন্য যে সব উপায় চাতুরি উদ্ভাবন করেন, পুরুষ তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হন। স্ত্রীপুরুষের পবিত্র বা অপবিত্র স্বাধীন প্রণয়ে, স্ত্রীলোকই পুরুষকে মজায়—পুরুষকে আপনার কাছে আনে। কিন্তু এমনি সতর্কে কার্য্য করে, যে, অভিভাবকেরা আদতে বুঝিতে পারে না। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধির কাহিনী শুনিলে পুরুষকে স্ত্রীলোকের গাধা ভিন্ন আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না। কে বলে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের বুদ্ধি অধিক?

সন্ধ্যারপরই বনলতার বিনা কারণে পেটের অসুখ হইল। জলে ভিজিতে ভিজিতে তিনি একঘণ্টা অন্তর ঘাটে যাইতেছেন। বাটীর সকলের ঐরূপই বিশ্বাস হওয়ায়, বনলতার রাত্রি ১২টার সময়, নায়কের কাছে যাইবার সুবিধা হইল।

এদিকে রাত্রি নয়টারপর, আকাশ একটু থামিল। একটু একটু জ্যোৎস্না মেঘের আড়াল হইতে পৃথিবীকে রূপবতী করিল। সেই সময়ে রাজকুমার রাজবাটী হইতে সরিয়াপড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড ছাতা মাথায়দিয়া, সেই দীঘিরধারে গিয়া, ভাঙাঘাটে বসিলেন। দুইঘণ্টা বেশ জ্যোৎস্না থাকিল। আষাঢ়ের রাত্রে বৃষ্টিরপর জ্যোৎস্নার আশ্চর্য্য শোভা হয়। গাছের পাতায় পাতায় জল টুপ্ টুপ্ পড়িতেছে—সেই সব জলবিন্দুতে চাঁদের আভা কি সুন্দর! গাছের ডালে, পাতায় কোটি কোটি জলবিন্দুতে চাঁদের আলো ঝক্‌মক্ করিতেছে—কি সুন্দর! ঘাসের মাথায় মাথায় জলবিন্দু—তাহাতে চাঁদের আলো—যেন নক্ষত্র জ্বলিতেছে, কি সুন্দর! সেই শোভার উপরে খদ্যোতের চকমকানি—ঘাসে, গাছে, পুকুরের জলের উপরে, কি সুন্দর! রাজকুমার সেই শোভা দেখিতে দেখিতে বনলতার হাসিভরা মুখ ভাবিতেছেন, আর দেখিতেছেন পিছনে কেহ আসিতেছে কি না।

রাত্রিতে যখন টং টং করিয়া ১১টা বাজিল। তখনই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি বড়ই বাড়িল। বনলতা পেটের অসুখের ছলনা আগেই করিয়াছেন। ঘরে ভাজ ঘুমাইতেছে। প্রেমিকা আস্তে আস্তে বাহির হইলেন। প্রেমোন্মাদিনী পৃথিবীর সে উপদ্রবকে ফুৎকারে উড়াইলেন। আকাশ শতগুণে বৃষ্টি বর্ষণ করুক, পৃথিবী প্লাবিত হউক, ঝড়ে গাছ পাথর আকাশে উড়ুক, বনলতা হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত স্থলে যাইবেন। ইহাই স্ত্রী প্রকৃতি। ইহাই স্বাভাবিকতার মহিমা। উৎকর্ষিত শক্তির—কৃত্রিমতার এরূপ মহিমা হয় না।

বনলতা অনাবৃত মুখে হাসিতে হাসিতে চক্ষু কর্ণ নাসিকার

শক্তি বাড়াইয়া, সেই ভীষণ বৃষ্টিধারাকে তুচ্ছজ্ঞানে বাহির হইলেন। অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যায় না। বাড়ির উঠানে না নামিতে নামিতে বনলতার দেহে স্রোতের সৃষ্টি হইল। প্রেমিকা জলজন্তুর মত সেই জলে, অন্ধকারের জন্তুর মত সেই অন্ধকারে বাহির হইলেন। ভয় নাই—কেবল আনন্দ ও উৎসাহ। সে সময়ে প্রেমিকার ভিতরটা দেখিলে বোধ হয় আকাশের জল বর্ষণ শক্তি অপেক্ষা তাঁহার প্রেম বর্ষণ শক্তি অধিক। আন্দাজে পা ফেলিতেছেন—গর্ত্ত নালা—টিপি আন্দাজে ডিঙ্গাইতেছেন—অথবা প্রেমশক্তি অদৃশ্য আলোক জ্বালিয়া বনলতাকে লইয়া যাইতেছে। যেমন নবপ্রসূত মধুমক্ষিকা ফুল কেমন অথবা কোথায় না জানিলেও নাসিকার আঘ্রাণশক্তি অবলম্বনে ফুলের দিকে ধাবিত হয়, প্রণয়িনী অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাইলেও প্রেমপূর্ণ অনুমিতির বলে ধাবিত হইতেছেন; পথে জলস্রোতে কত ভেক, কীট, জোঁক, সাপ ভাসিতেছে—বনলতার পা ধরিতেছে অথচ কিছুই ভ্রুক্ষেপ নাই। একটা বড় জোঁক তাঁর পায়ে আশ্রয় লইয়া রক্ত পানে মোটা হইতেছে—অথচ তাঁর হুঁস নাই। দশ মিনিটের মধ্যে যেন কলে চালিত হইয়া, দীঘির কাছে গেলেন। বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিল, সে আলোকে দীঘি দেখিয়া স্বর্গ পাইলেন। দীঘির পথে জলের স্রোতের উপরে, এক প্রকাণ্ড বিষধর শুইয়া, অন্ধকারে ভিজিতে-ছিল। বনলতা সেই সাপের পেটে পা দিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। সাপ পার আঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া পথে দংশন করিল, বনলতা কিছুই জানিলেন না। তিনি দীঘির ধারে গিয়া, আনন্দে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বিদ্যুতালোকের জন্য অপেক্ষা করিলেন। বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিল—সেই আলোকে

দীঘির এপার ওপার মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়ন গোচর হইল—কিন্তু মানুষ কই? বনলতা ভাবিলেন এ বৃষ্টিতে আমারই কপালের লেখা মুছিল। গলার শব্দ করিলেন—উঁহুঁহুঁ। রাজকুমার ঘাটের উপরে ভিজিতে ভিজিতে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে সেই গলার মধুরতম শব্দ স্পষ্ট শুনিলেন। যেন এক লাফে স্বর্গে উঠিয়া স্বর্গের উপর হইতে নায়িকাকে গলার শব্দে ডাকিলেন—উঁহুঁহুঁ। বিদ্যুৎ উপর্য্যুপরি চক্‌মক্ করিল। বনলতা ঘাটের দিকে চাহিয়া আপনার হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়া, দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটের উপরে গিয়া আর চলিতে পারেন না—হস্তিনীর বল যেন উপিয়া গেল।—মুখে আর কথা সরে না।—শক্তির অতিরিক্ততায় ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল।—কেবল চক্ষের জলধারা বাড়িল।—বৃষ্টির জলধারায় চক্ষের জলধারা মিশিল। রাজকুমার ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন। মধুর উন্মাদক আত্মহারা স্বরে ডাকিলেন "বনলতা!"—এই শব্দ বৃষ্টির শব্দকে আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার সুরে তালে মধু ঢালিয়া, স্বর্গীয় বাদ্যের ধ্বনির মত আকাশ ও অন্ধকার পূর্ণ করিয়া, বনলতার প্রাণে বাজিতে লাগিল। সেই স্বর শুনিয়া বনলতার দেহ আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রিয়তমের দিকে হেলিতে লাগিল। তখনি প্রিয়তম তদ্রুপ আনন্দে বনলতার হাত ধরিলেন—অমনি প্রেমিকার সমস্ত শক্তি যেন প্রেমিকের অস্তিত্বে প্রবেশ করিল—বনলতা মৃতার মত প্রিয়তমের বুকে পড়িলেন।—প্রিয়তমকে স্পর্শ করিবামাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ে শক্তির বন্যা আসিল—তখন স্পর্শজ্ঞান যেন আকাশের মত প্রকাণ্ড হইল—প্রিয়তমের পরিমিত দেহে বনলতা যেন অনন্ত বিশ্ব আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে বিদ্যুৎ তাঁহাদের আলিঙ্গন প্রকৃতিকে দেখাইবার জন্য উপর্য্যুপরি চক্‌মক্ করিল।

তখন বনলতা আপনার মুখ প্রিয়তমের মুখে, বুক প্রিয়তমের বুকে রাখিয়া প্রিয়তমের অস্তিত্বে মিশিয়া গেলেন। তখন নায়কনায়িকাতে একটী প্রাণী—একটী ব্যক্তি। দুই নিঃশ্বাসে এক নিঃশ্বাস, দুই হৃদয়কম্পনে এক কম্পন। সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এ পর্য্যন্ত যত অমৃত সঞ্চিত হইয়াছিল - যত সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছিল—সে সমস্তই দুই শক্তিতে এক হইয়া শুষিতে লাগিলেন। তখন মুখের কথা—মুখের আলাপ ফুরাইল। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলাপ, চুম্বনে চুম্বনে কথা, আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সম্ভাষণ, অশ্রুজলে অশ্রুজলে প্রেম পরিচয়, হৃদয় কম্পনে হৃদয় কম্পনে আনন্দ প্রকাশ। প্রেম-স্বর্গের ইহাই প্রকৃত ভাষা। তখন প্রেমিক প্রেমিকা এই নশ্বর দেহে, অবিনশ্বর প্রেমজগতে, প্রেমের স্বাভাবিক ভাষায় আত্মহারা হইলেন। সেই আলিঙ্গনে দুই প্রকৃতির একীকরণ কতক্ষণ থাকিল; তাঁহাদের সম্মিলিত দেহের উপরে আকাশ কত বৃষ্টি ঢালিয়া তাঁহাদের বিবাহের অভিষেক করিল; প্রকৃতি স্বাভাবিক সঙ্গীতে কি প্রকারে তাঁহাদের বিবাহের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল; সে সব তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই সময়ে একটা বিষধর বৃষ্টির তাড়নায়, তাঁহাদের সম্মিলিত নিশ্চল দণ্ডায়মান দেহকে জড়খণ্ড স্থির করিয়া কিয়ৎক্ষণ বেষ্টন করিয়া থাকিল। নায়ক নায়িকা তাহাও জানিতে পারিলেন না। তারপর অন্তর্জগতের বন্যা যখন আপনি কমিল, তখন দুই জনের জ্ঞান হইল। তখন আকাশে চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। রাজকুমার ঘাটের ইটে বসিলেন। বনলতাও কাছে বসিলেন। তখন দুইজনের জড়মূর্ত্তি নাই—প্রেমমূর্ত্তি। যেমন কয়লা অগ্নিস্পর্শে অগ্নি হয়—তাঁহারা প্রেমস্পর্শে প্রেমই হইয়াছেন। দুইজনে কথাকহিবার সাধ কিন্তু

ভাবভরে কথা ফুটিতেছে না। সেই সাধ মিটাইবার জন্য দুই জনে মাঝে মাঝে চুম্বন আলিঙ্গনে রাত্রি কাটাইতেছেন। রাজকুমার একটী স্বনামাঙ্কিত হীরকাঙ্গুরী অতি আদরে বনলতার আঙুলে পরাইতেছেন—বনলতার সে হুঁস আদতে নাই। রাজকুমারের অন্তরের ভাষা জিহ্বায় ফুটিল। পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আর নয়—রাত্রি শেষ হইয়াছে"। সে কথা যেন সাপের মত বনলতার কর্ণকুহরে দংশন করিল। সে-স্বর্গ ছাড়িয়া যমালয়ে ফিরিতে হইবে ভাবিয়া তিনি আকুল প্রাণে রাজকুমারের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই কান্নায় রাজকুমার যেন হলাহল পান করিলেন। বনলতা সেই বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছেন "এই আলিঙ্গনে মরিলাম না কেন?"

রাজকুমার আবার বলিলেন "বনলতা! প্রাণেশ্বরি! আর নয়"। বলিয়াই দুঃখে কাঁদিলেন।—বনলতার মুখে মুখ রাখিলেন।—"আহা কি অনন্ত তৃপ্তি! এসুখ ছাড়িয়া কোথা যাব?"—ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার মুখ তুলিয়া—প্রাণেশ্বরীকে আলিঙ্গনে চাপিয়া, কাতর প্রেমে বলিলেন "জগতে যদি আমার কোন সুখ থাকেতো তুমি।—যদি কোন আশা থাকে তো তুমি।—যদি কোন তপস্যা থাকে তো তুমি।—আমার যদিইহকাল থাকে তো তুমি।—পরকাল থাকেতো তুমি।—তবে কাঁদকেন? প্রাণেশ্বরী! যদি তোমাকে লইয়া লোকালয়ে থাকিতে বাধা পাইতো বনে থাকিব। সেখানে দুইজনের প্রেমে স্বর্গ ভোগ করিব।—ভয় কি? আজহইতে আমার যাহা কিছু সব তোমার। আমার বিবাহিতাস্ত্রীকে পর্য্যন্ত তোমার দাসী করিয়াদেব।"

গুড়ুম করিয়া রাজবাটীতে তোপ পড়িল। বনলতা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুত চলিলেন। রাজকুমার কিছু পরে ফিরিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রকৃত প্রণয় অন্ধ।

দীঘির ঘাট হইতে যখন রাজকুমার ও বনলতা পৃথক্ হন, হঠাৎ আহ্লাদী পাগলিনী সেখানে উপস্থিত হয়। সে দুই জনকে দেখিয়াই "হো হো হো" শব্দে হাসির রোল তুলিল। বনলতার পিছনে পিছনে কতকি বিশ্রী কথা বলিতে বলিতে চলিল। বনলতা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন গ্রামে কেহ উঠে নাই, তাই বনলতাকে কেহ রাস্তায় দেখিল না। বনলতা যেন পেটের অসুখের জন্য ঘাটে গিয়াছিলেন, এই ভাবে বাটীর কাছের পুকুরে কাপড় কাচিয়া খিড়কী দরজা দিয়া, বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তখন বনলতার মা, বাপ, ভাইজ সকলেই নিদ্রিত। আহ্লাদী বনলতার বাটীর কাছ অবধি গিয়াই, সতীশের ভয়ে সরিয়া পড়িল এবং পথে পথে লোকের সাক্ষাতে অসাক্ষাতে দুইজনের মিলনের কথা বিশ্রী ভাষায় বলিতে লাগিল। তখন সেই কথা লইয়া গ্রামে একটা খুব আলোচনা হইতে লাগিল।

রাজকুমার ক্ষুদিরামের কোটার পাশে বেড়াইতে, বেড়াইতে ঘরের জানালার দিকে চায়, ছাদের উপরে নজর দেয়, এবং ক্ষুদিরামের বিধবা কন্যা সর্ব্বদা জানালায় বা ছাদে বসিয়া থাকে, এসব দেখিয়া নানা লোকে নানা আলোচনা করিতে লাগিল। সেদিন

প্রাতে বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত, রাস্তায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, রাজকুমার ছাদের উপরে বনলতার অতুল রূপ দেখিতে ছিলেন ; এবং বনলতা ছাদ হইতে রাজকুমারকে একদৃষ্টে দেখিতে ছিলেন ; গ্রামের তিন চার জন স্ত্রীলোক তাহা দেখিয়াছিল। সুতরাং বনলতার সহিত রাজকুমারের গুপ্ত প্রণয়ের আলোচনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তার উপরে আহ্লাদীর আজকের ঢ্যাট্‌রাতে অনেকের বিশ্বাস হইল। সেদিন ভোরে রাজকুমার ভিজা কাপড়ে, রাজবাটীর দেউড়ি পার হইলে, দ্বারবানেরা সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাণা-কাণি করিতে লাগিল। দাসীমহলে খুব একটা চুপি চুপি আন্দোলন চলিল। কথাটা নিস্তারিণী কর্ত্তৃক রাণীর কাণে গেল। রাণী অনেক দিন আগে, সে কথা আহ্লাদীর মুখে শুনিয়া ছিলেন। আজ শুনিয়া মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য ঘরে সরিয়া গেলেন।

প্রেমদা সমস্ত রাত্রি স্বামীকে না পাইয়া বড়ই ভাবিতেছিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁর চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। ভোরে ঘুমাইয়াছেন। উঠিতে বেলা নয়টা হইল। আহারাদির পর, হেমন্তকুমারী প্রেমদার ঘরে বসিয়া বলিলেন "বউদিদি! কাল রাত্রে দাদাবাবু ঘরে আসেন নাই কেন?"

প্রে। তা তো জানি না। তবে শুনেছি, উনি প'ড়তে প'ড়তে এক এক রাত্রি আদতে শোননা—সমস্ত রাত্রিই প'ড়েন।

হেমন্ত মুচকিয়া হাসিলেন।

প্রে। হাসছ যে?

হে। কিছু শোন নি?

প্রে। কই না।

হে। তোমার যে একটী সতীন আছে।

প্রেমদা চমকিতা হইয়া একদৃষ্টে হেমন্তের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন "আমিতো তা জানিনা! আমি তা হ'লে ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী? কই—এসেতো তাকে দেখলাম না?

হে। উপপত্নী—উপপত্নী।

সে কথা হইতে যেন সহস্র সর্প বাহির হইয়া প্রেমদাকে দংশন করিল। হেমন্তের উপর তাঁর ভীষণ ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিল। তিনি রাগে ঘৃণায় যেন দেখিলেন হেমন্ত দেবতার নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণমূর্ত্তিতে আলকাতরা ঢালিয়া দিল.। প্রেমদা রাগে কিছু না বলিয়া, হেমন্তর কাছ হইতে সরিয়া, আপনার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শয়ন করিলেন। হেমন্ত কাছে গিয়া আবার বলিলেন "বউ! আমার উপর রাগ ক'রলে?

প্রে। দাদার নামে, মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া কি ধর্ম্ম সঙ্গত? আমি এখনি শাশুড়িকে গিয়া বলিব! বলিয়া প্রেমদা কাঁদিতে লাগিলেন।

হে। উকি ভাই। তুমি কাঁদছ কেন?

প্রেমদা চুপ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বিছানার নীচে মেজেতে গিয়া বসিলেন। হেমন্ত আবার কাছে গিয়া বলিলেন "তুমি আমার কথা অবিশ্বাস ক'রলে?"

প্রেমদা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "তুমিতো তুমি" আমার শ্বশুর শাশুড়ি বলিলেও বিশ্বাস করিনা। যদি দুচক্ষে দেখি তো চক্ষুকে অবিশ্বাস করিয়া অমন দুষ্ট চক্ষুকে উপড়াইয়া চিরকাল অন্ধ হইয়া থাকিব, তথাপি সে দেবমূর্ত্তিতে পাপকলঙ্ক বিশ্বাস করিব না।

হেমন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

রাজা যশোদানন্দনের কাণে সে সব কথা তুলিতে কেহ সাহস করে নাই। রাজবাটীর আর সব লোক শুনিয়াছিল। অল্পলোক বিশ্বাস করিল, অধিক লোক করিল না। দিন কয়েক পরেই রাজকুমারের জ্বর হইল। পনের দিন পরে পথ্য পাইলেন। সাত-দিন পরে আবার জ্বর। সেই জ্বরে পেটে প্লীহা যকৃত দেখা দিল। রাজকুমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলেন। সেখান হইতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। রাজকুমার, পিসীমা, চারজন দাসী, চারজন চাকর এবং দুইজন দ্বারবান সঙ্গে চলিল। তিন মাস মুঙ্গেরে আছেন। এই তিন মাসে পথে ঘাটে রাজ-কুমার ও বনলতার কলঙ্ককথা আলোচনা এত বাড়িল যে, ক্ষুদিরাম চাটুর্য্যের বাটীর কাহারও বাহিরে যাওয়া দুষ্কর। সতীশ, বনলতার ভাই এই সময়ে, নূতন চাকুরি পাইয়া, লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। নতুবা সতীশের হাতে বনলতাকে মরিতে হইত।



একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

আগুনে জল সঞ্চার।

"গ্রামে আর বেরোবার যো আছে! গিন্নি তুমি বল কি?" এই কথা বলিতে বলিতে, ক্ষুদিরামের দুই চক্ষু দিয়া আগুণ ছুটিল, চক্ষুর গরম জল কয় ফোঁটা পড়িয়া মাটীকে যেন পুড়াইল,—নিঃশ্বাসে আগুণ—লোমে লোমে বিষের আগুণ।

গৃ। আর কি ব'লবো! আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরিগে।

দুইজন এক আগুণে কিয়ৎক্ষণ পুড়িতে থাকিলেন। গিন্নি চক্ষের জল মুছিলেন। তখন ক্ষুদিরাম ভিতরের আগুণ ধৈর্য্যে চাপিয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ফাঁসিই আমার কপালে আছে।" তখন পা হইতে মাথা এবং মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা বিষের আগুণ ধমনীতে ধমনীতে ছুটিতে থাকিল। ক্ষুদিরাম চক্ষুমুদিয়া, যাতনার চাপে শুইয়া পড়িলেন। মুদিত নয়নে কল্পনার চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, গ্রামের যেখানে মানুষ, সেই খানেই তাঁর মেয়ের কলঙ্কের কথা,—তাঁর চির পবিত্রকুলের কলঙ্কের কথা,—তাঁর পুণ্যবান পিতৃপুরুষদের নরকের কথা, মুদিতচক্ষে "হা ভগবান!" বলিয়া এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। গৃহিণী চুপে চুপে বলিলেন "আমার আর স্নানের ঘাটে যাবার যো আছে! আহ্লাদী সর্ব্বনাশীর মা বলে "হাঁগা! তা তোমাদের রাজবাটী থেকে মাসহারা হবে না? গুখেকোর বেটীর আস্পদ্ধা দেখেছ?"

ক্ষু। পরকে গাল দিও না। গুণের মেয়ের মুণ্ডটা টক্ ক'রে কেটে আন্‌তে পার?

ক্ষুদিরাম বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, ঘরের দেওয়ালে পাঁটা কাটা খাঁড়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন "যাওনা যাও—এখনি ঐ খাঁড়া দিয়ে মুণ্ডুটা কেটে আন—আমি হুকুম দিচ্ছি।"

গৃ। বাপ হলে কাটতুম; মা কি তা পারে? ওরে নিয়ে গলায় দড়ি দিতে বল দিগে!

ক্ষু। তা আমি তো বাপ। আমি কাটিগে? কি বল? জবাব যে দাওনা!

গৃ। শুধু ওকে কাটলে তো হবে না! আমাকে শুদ্ধ কাট যে সব জ্বালা দূর হক।

ক্ষু। ঐ মেয়ের সঙ্গে আবার মরতে সাধ?

গৃ। সাধ কি শুধু হয়? বত্রিসটা নাড়ির যে টান। মা হতে তো বুঝতে।

স্ত্রীর সে সব কথায় ক্ষুদিরামের দুঃখ, কষ্ট, রাগ আরো জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্ষিপ্তের মত অন্য ঘরে গিয়া খিল দিলেন। ঘরে খিল দিলে গিন্নির ভয় হইল, ব্রাহ্মণ মনস্তাপে আত্মহত্যা করিবে না কি? তাই দরজা ঠেলিতে ঠেলিতে কাতর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ঘরে খিল দিয়া বিছানায় বসিয়া ক্ষিপ্তের মত ভাবিলেন "নিশ্চয়ই কুলের কলঙ্ক মোচন করিব। কেটে ফাঁসি যাব।" তার পর হড়াৎ করিয়া দরজা খুলিলেন।

বনলতা মা, বাপ, ভাজ প্রভৃতির দুঃখ, যাতনা, রাগের উত্তাপে পুড়িতেছেন। রাজকুমারের সহিত একবার দেখা করিবার আশায় প্রাণ রাখিয়াছেন। তিনি মরিলে যদি তাঁর বিয়োগে রাজকুমার

মরেন—এই ভয়ে প্রাণ রাখিয়াছেন। পিতামাতার ভৎর্সণা, গ্রামের নিন্দা ধিক্কার সবই সহিতেছেন, কেবল রাজকুমারকে আর একবার দেখিয়া তাঁর আদেশানুসারে চলিবার জন্য।

বনলতা রাত্রে ভাজের কাছে শোন। ভাজ তাঁর সহিত আর ভাল করিয়া কথা কন না, কেবল প্রহরির কার্য্য করেন। বনলতা অন্যমনা,—সুতরাং ঘরে খিল যে দিন কিরণশশী দেন, সেই দিনই খিল পড়ে। নহিলে খিল পড়ে না। আজ রাত্রি যখন দুইটা, গ্রাম অন্ধকারে ঢাকা, প্রকৃতির গম্ভীর মূর্ত্তি, আকাশে মেঘ, ভয়ানক গরম, ক্ষুদিরাম আস্তে আস্তে উঠিলেন। প্রতিজ্ঞার রক্তিম মূর্ত্তিতে পাঁটা কাটা খাঁড়া খানি চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আনিলেন। মাল কোচা করিয়া কাপড় পরিলেন। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত রাগে দেহ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। রক্তিম দৃষ্টিতে একবার ঘরের চারি দিকে চাহিলেন। আকাশের অন্ধকারে দৃষ্টি ক্ষেপ করিলেন। নরহত্যার মূর্ত্তি লুকাইবার জন্য যেন অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছে। পৃথিবীতে শত শত পিতা যেন কন্যা হত্যার জন্য তাঁর মত খাঁড়া হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, রাগে প্রতিজ্ঞায় সাহস জ্বলিল। দ্রুত বেগে ঘরের দরজায় পদাঘাত করিলেন—দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। পুত্র বধুর পাশে বনলতা ঘুমাইতেছে। কন্যার বার বৎসর বয়সের পর, পিতা কখনও মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। আজ সে মুখ দেখিলেন। পুত্রবধূর অর্দ্ধোলঙ্গ দেহের দিকে একবার চাহিয়াই আর চাহিলেন না। আপনার কন্যার সেই মুখ, —যাহা কয় বৎসর আদতে দেখেন নাই—আজ রক্তিম সংহারক দৃষ্টিতে দেখিলেন। আগুন যেমন জলে পড়িলে নিবিতে থাকে, পিতার রক্তিম অগ্নিদৃষ্টি, সেই মুখের রূপে অপত্য স্নেহের

সঞ্চারে নিবিতে থাকিল। যেমুখে তিনি এক সময়ে আদর করিয়া কত চুম্‌ খাইয়াছেন;—আদর করিয়া ধুলা কুটা মলা মুছিয়াছেন;—যে মুখ একটু বিমর্ষ দেখিলে স্নেহেগলিয়া আপনার বুকে রাখিয়া কত আদর করিতেন, যে মুখের কচি লাবণ্যে অর্দ্ধস্ফুট কথায় জীবনের জ্বালা জুড়াইতেন; ক্ষুদিরাম কন্যার সেই অনুপম মুখে বালিকার সেই কোমল কচি মুখ দেখিলেন। সেই কচি মুখের শীতলতায় তাঁর ক্রুদ্ধ রক্তিম অগ্নিদৃষ্টি ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিল, ক্ষুদিরাম সাবধান হইলেন—মুখ ফিরাইলেন। চক্ষুমুদিয়া ভাবিলেন "না, আর ও মুখ দেখিব না। ও আমার সে মেয়ে নয়,—সে বনলতা নয়,—সে বনলতা মরিয়াছে,—তারমৃত দেহে পিশাচী সয়তানী প্রবেশ করিয়াছে। আমি সয়তানীকে এক আঘাতেই যমালয়ে পাঠাইব। তখন গলা লক্ষ্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে খাঁড়া উত্তোলন করিলেন। কিন্তু গলা লক্ষ্য করিবার সময়, আবার সেই কচিমুখ দেখিয়া—তাঁর নিজের মুখ—তাঁর সতীশেরমুখ, সেই মুখে দেখিয়া—আবারতাঁর স্নেহ হইল—খাঁড়া হাত হইতে পড়িয়া গেল। ক্ষুদিরাম তখন পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ভাবিলেন "এই মেয়ে আমার কত সেবা করিয়াছে এখনও করিতেছে। বালিকা সময়ে আমি ঐ গলায় হাত না দিলে বালিকার ঘুম হইত না;—আমি ঐ গলায় কত স্নেহ ঢালিয়াছি—আজ কি করিয়া অস্ত্রাঘাত করি? যে গলে আমি ফুলের মালা পরাইয়া,—আদর করিয়া কত গহনা পরাইয়াছি,—একটু যাতনা বুঝিয়া কত ফুঁ দিয়াছি, হাত বুলাইয়াছি, আমি সে গলায় কোন প্রাণে অস্ত্রাঘাত করি? ক্ষুদিরামের চক্ষে আগুণ নিবিয়া জল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার সেই বালিকা মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবিলেন একি রূপ? এরূপের পিতা

হইয়া কি প্রকারে অস্ত্রাঘাত করিব ? যম এরূপ দেখিলে চক্ষে জল মুছিবে—আমি পিতা হইয়া কি প্রকারে অস্ত্রাঘাত করিব ? আহা ! এমন রূপে, আমার এমন কুলে বিধাতা এ কি করিলেন?—"উঃ উঃ গেলাম"—বলিয়া এক চীৎকার দিয়া ক্ষুদিরাম মূর্চ্ছিত হইলেন। বনলতা, কিরণশশী সেই চীৎকারে জাগিলেন। বিস্মিত, ভীত ও লজ্জিত হইয়া, তাঁহারা গার কাপড় সামলাইয়া খাটের কাছে মেজেতে ক্ষুদিরামের মূর্চ্ছিত মূর্ত্তি দেখিয়া "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! বলিয়া চীৎকার করিলেন। গৃহিণী তাড়াতাড়ি "হাউমাউ" করিতে করিতে ঘরে আসিলেন। মুখে চোখে জল ও অঙ্গে বাতাস দিতে দিতে ক্ষুদিরামের জ্ঞান হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন।

রাজকুমারের ব্যারাম বড় শক্ত—এই সংবাদ আসিলে, রাজা যশোদানন্দন, রাণী স্বর্ণসুন্দরী এবং প্রেমদা সুন্দরী তৎক্ষনাৎ রওনা হইলেন। গ্রামের যেখানে সেখানে সেই পীড়ার কথা। ক্ষুদিরাম শুনিয়া দেবতার কাছে মানস করিলেন "রাজকুমার মরিলে যোড়শোপচারে মার পূজা দেব।" বনলতা শুনিয়া পাগলিনীর মত হইলেন। যখন বড় দুঃখ বাড়ে তখন ঘরে খিল আঁটিয়া খানিকটা কাঁদেন। কান্না লইয়া বড় বিপদ—যেমন কুলটা বিধবার গর্ভ লইয়া বিপদ। সে কান্নার জল যদি বাড়ীর কেহ দেখেতো বিপদ। বনলতা এইরূপ ভাবিয়া আড়ালে লুকাইয়া কাঁদিতে থাকেন। তিনি ভাবিলেন "এঘরে—এদেশে আর থাকিবনা; কোন দূর দেশে যাইব। কিন্তু এরূপ লইয়া যাইলে তো পথেই বিপদ। কি করি?" তখন আবার ভাবিলেন "মস্তক মুড়াইয়া পুরুষের বেশ ধরিনা কেন? এ স্তন কি কাটা যায় না? এই দুটাকেই বড় ভয়—পাছে ধরা পড়ি।" আবার ভাবিলেন "যদি লোকালয়ে না থাকিয়া, বনে জঙ্গলে থাকি, তো স্তনে আর কিসের ভয়? সেখানে বাঘ ভালুকের ভয়! লোকালয়ে দুষ্ট মানুষ অপেক্ষা বনে বাঘ ভালুক ভাল! সেখানে তাঁর নিন্দা শুনতে হবে না।" বনলতা সমস্তদিন এইরূপ উল্টিয়া পাল্টিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রে কীরণশশীর কাছে শুইলেন। শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ভাইজকে বলিলেন "বউ! আমায় একখানা ক্ষুর দিতে পারিস"?

কী। কেন গলায় দিবি নাকি?

ব। তাই দেব।

কী। তা হ'লে বাঁচি। বাবা সে দিন রাত্রে তো তোকে খুন ক'রতে গেছলেন।

তা তো সব শুনেছিস। সেদিন করেন নি—আর একদিন ক'রবেন। তা তুই নিজে যদি মরিস, একটার জন্য আর একটা মরে না। তা ক্ষুর আমি তোকে এখনি দিচ্ছি।

ব। দাও ভাই। বড় উপকার হবে।

কী। তা যদি মরিস তো কোথা ম'রবি?

ব। বনে জঙ্গলে।

কী। কোথাকার বনে জঙ্গলে।

ব। মাঠের ধারে দীঘির পাড়ের জঙ্গলে।

কী। না এদেশ ছেড়ে—এ গাঁ ছেড়ে—অন্য দেশে ম'রগে। এদেশে ম'লে আমাদের বিপদ হবে।

ব। আমার জন্য মন কেমন ক'রবে না?

কী। কয় বৎসর আগে ম'লে করতো। এখন তুই আমাদের যম। যমের জন্য কি মন কেমন করে?

ব। তবে ক্ষুর খানা দে।

কীরণ বাক্স হইতে ক্ষুর বাহির করিয়া দিল।

ব। তা এই রাত্রেই যাব নাকি?

কী। দিনে যেতে লজ্জা হবে না?

ব। তবে এই রাত্রেই যাই।

বলিয়াই বনলতা—আপনার বাক্স হইতে সেই চিঠী এবং আংটী বাহির করিলেন। ঘরের আলোকে হীরা চক্‌মক্ করিল। কীরণ তাড়াতাড়ি আংটী ছিনাইয়া লইল। একার আংটী? ঠাকুরপোর নাকি? বলিতে বলিতে আলোকে রাজপুত্রের নাম অঙ্কিত দেখিয়া, রাগে সে আংটী ঘরের মেজেতে ছুঁড়িয়া ফেলিল। "এতও কপালে ছিল! তুই এতই বেহায়া! তোর একটু লজ্জা নাই?" এই কথা বলিতে বলিতে কীরণ চক্ষে জল ফেলিল। তখন বনলতার হৃদয়ে সাহসে দুঃখে মিশিয়া এক ভাব উঠিল। বনলতা লালমুখে লালচক্ষে জল ফেলিয়া বলিলেন "বউ দিদি!—

কী। আর তুই আমায় "বউদিদি" ব'লে ডাকবি তো রাজকুমারের মাথা খাবি।

ব। বউ!—

কী। ওনামেও নয়।

ব। কীরণ!

কী। বল্‌কি?

ব। তুই আমাকে কখনও কি ভাল বেসেছিলি?

কী। যত দিন ননদ ছিলি।

ব। এখন আমি কি ননদ নই?

কী। না।

ব। তবে আমি তোমার কে?

কী। তুমি রাজকুমারের উপপত্নী—আবার কে?

ব। তুই কি মনে করিস, আমি রাজকুমারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি?

কী। আর গায়ে আগুন ছড়াসনি—তুই খারাপ ব্যবহার করিস নি, রাজকুমার ক'রেছে।

ব। কীরণ! আমার এ ঠাট্টার সময় নয়। আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি—এইবার বোধ হয় ডুবু ডুবু হইতেছি। এখন ঠাট্টার সময় নয়।

কী। তোমার যৌবন সমুদ্রে ডুবু ডুবু হ'চ্ছে—আমি কি মাজিগিরি ক'রব নাকি?

ব। তুই দেবতা মানিস?

কী। মানি না?

ব। কোন্ দেবতা?

কী। কালী।

ব। যদি আমি সতী হই, যদি ক্ষুদিরাম চাটুর্য্যের ঔরসে আমার জন্ম হয়, যদি রাজকুমারকে আমি ভগবান জ্ঞান ঠিক ক'রে থাকি, তো, নিশ্চয় ব'লছি, যে দিন আমি দেশত্যাগী হব, সেই দিন রাত্রে মা কালী স্বপ্নে তোকে ব'লবেন "বনলতা অসতী নয়, রাজকুমারের সঙ্গে তার কুভাব নাই।"

কথা শুনিয়া কীরণের মনটা একটু নরম হইল। সে তখন বনলতার গলে হাত দিয়া বলিল "ঠাকুর ঝি! ভাই মুখে যাই বলি,—ভিতরটা যে তোমার জন্য পুড়ে যাচ্ছে, তাকি বুঝতে পারছ না দিদি! আমি কি তোমার তেমনি বউ দিদি। আজ যদি তোর কপাল না ভাঙতো, তো, আমার বৈধব্যের জ্বালা এত যেয়াদা হ'ত না। তোর সুখ দেখেও সুখ হ'তো।

ব। কীরণ! আমার দুঃখ কি যায় নাই? তোরা আমাকে কুলটাই বল, আর যাই বল, আমার দেশে ঘরে এত গঞ্জনা এত

তাড়নার মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে, তা তুমি, বুঝতে পারছ না ?

বলিয়াই "তাই তো তিনি কেমন আছেন"—ভাবিয়া দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কী। যদি সুখ তো ক্ষুরের দরকার ? আত্মহত্যার দরকার ? কিসের সুখ ? বাপ আত্মহত্যা ক'রবে, যদি তুমি না মর, বা দেশ-ত্যাগী হও ;—মা পাগলিনী হবে বা বিষ খাবে তোমার অভাবে ;—ভাই এসে শুনে, আত্মহত্যা ক'রবে, বা তোমাকে কাটবে ;—তোর আবার কিসের সুখ ?

ব। কীরণ! আমি সব বুঝি ;—তথাপি গরলের মধ্যে আমার একটু অমৃত আছে ;—নরকের মধ্যে আমার একটু স্বর্গ আছে।

কী। কি বল দেখি ? বুঝতে পারছিনা। সংসার যেন অসীম কাঁটা গাছের জঙ্গল—সে জঙ্গল থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছি না। ঠাকুরঝি! তুই কেন এমন হলি ? তোর কি সুখ বল শুনি ?

ব। কীরণ! যদি সমস্ত পৃথিবী যমালয় হয়, তো, সে যমালয় স্বর্গ বোধ হবে, এমন জিনিস আমি পেয়েছি।

কী। তা আমি এতক্ষণে যেন বুঝলাম। তা পোড়ার মুখী! তাতে এত কি সুখ ? কামরিপুর জন্য তোমার এত বাহাদুরি ?

ব। তবে আর কথা কবনা, আমাকে বিদায় দে।

কী। আমি কি বিদায় দেব। তোর যাওয়াই ভাল। নহিলে শ্বশুর দেবর শ্বাশুড়ির প্রাণ যায়।

ব। তাইতো আমি জনমের মত যাবো কীরণ!

বনলতা আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। কীরণ আপনার চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "তবে আত্মহত্যাটাই কি ক'রবি—এই যে কি সুখের কথা বল্লি।" বনলতা দুঃখের ভগ্নস্বরে বলিলেন "আমি আত্মহত্যা করি, না করি, তোমরা তা জানতে পারবে না।" বলিয়া খানিক চুপ করিয়া আবার বলিলেন "তবে যাই।" বলিয়া প্যাটরা হইতে কাপড় চোপড় বাহির করিয়া একটা পোঁটলা বাঁধিলেন। তার পর গলায় কাপড় দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বড় ভাইজকে প্রণাম করিলেন। তখন কীরণের দুচক্ষু জলে ভাসিল, বুক জলে-ভাসিল, বুক দুঃখে ফাটিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বনলতার হাত ধরিয়া "ঠাকুরঝি! দিদি! তুমি এ অন্ধকারে এরাত্রে কোথা যাবে? রাজপুত্রতো বিদেশে। তুমি দিদি! কোথা যাবে? আত্মহত্যা করিসনি, সে বড় পাপ, আত্মহত্যা যে করে, তার উদ্ধার হয় না। কীরণ অনেকবার সে চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু ঐ ভয়ে সাহস হয় নাই। দিদি! যেদিন বিধবা আমরা হয়েছি, সে দিন সব আশ্রয়ই হারায়েছি—তবু একটু যা ছিল তাও তুমি কপাল দোষে হারালে! তোমায় আমি কি ব'লবো! যদি বুকের ভিতরে রাখবার উপায় থ.কতো, তো, তোমায় এই বুকের ভিতরে রাখতাম। তুমিও যাবে—খাশুড়ি আমার কাল পাগলিনী হবে, না হয় বিষ খাবে। আমি পোড়ার মুখী সব ব'সে ব'সে দেখবো। দিদি!—।" আর কীরণের কথা ফুটিল না—কীরণ দুচক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বনলতার চক্ষের জল হঠাৎ শুকাইয়া গেল—সংসারের মায়া কাটাইলেন। কীরণের চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন "কীরণ। আমি আত্মহত্যা করিবনা। আমি মস্তক মুড়াইব। লুকাইয়া আলখেল্লা তৈয়ার করিয়াছি।

সেই আলখেল্লা পরিয়া, মুখে ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিব। তারপর সেই বেশে কালীঘাটে গিয়া হত্যা দেব।"

কীরণ কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসিলেন "কার জন্য ?"

ব। যাঁর জন্য কুলত্যাগিনী হইতেছি, অসতীনাম কিনিয়াছি।

কীরণের কান্না আরো বাড়িল।

কী। তার পর ?

ব। হত্যা দিয়া যদি ঔষধ পাই, তো সেই বেশে, রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করিয়া, ঔষধ খাওয়াইব। আরাম হইলে আত্মপরিচয় দেব। তখন আমার সব দুঃখ ঘুচিবে।

বলিয়াই বুক কাঁপাইয়া, এক আশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কী। যদি হত্যা দিয়া ঔষধ না পাও, যদি রাজকুমার না বাঁচে। সেকথা শুনিবামাত্র বনলতার দেহ যাতনায় সিহরিয়া উঠিল, দুচক্ষু স্থির হইল—বনলতা মূর্চ্ছিতা হইলেন।

কীরণ আর গোল না করিয়া সুশ্রূষাদ্বারা চৈতন্য আনিলেন। বনলতার মাথা কীরণের কোলে, বনলতা উঠিয়া বসিলেন, কীরণ আবার বলিলেন "তা বুঝেছি তুই রাজকুমারে ম'জেছিস। হয়তো তোর পবিত্র প্রণয়। তা কি জানি ? তাই যেন হয়। লোকে যা বলুক, ভগবানের কাছে তুমি খাঁটি থাক, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি।" বনলতা উঠিয়া কীরণকে প্রণাম করিলেন। কীরণ চুপ করিয়া পাথরের মত বসিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে থাকিলেন। বনলতা দূর হইতে পিতা মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উন্মাদিনীর মত ঘরের বাহির হইলেন। পথে পা দিয়া রাজবাটীর দিকে তাকাইলেন। অন্ধকারে কে কাহাকে দেখে ? অন্ধকারে হন্ হন্ করিয়া বনলতা চলিলেন। সেই দীঘির পাড়ে ঘাটে বসিয়া আকুল

প্রাণে প্রিয়তমের জন্য কাঁদিলেন। পিতা মাতা ভাইএর জন্য কাঁদিলেন। তারপর রাজকুমারের জীবনের জন্য মাকালীকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। আকাশে রাত্রি শাঁ শাঁ করিতেছে। আকাশে মেঘ—মাঝে মাঝে দুই একটা নক্ষত্র জ্বলিতেছে। বনলতা আকাশের দিকে চাহিয়া, কাতর প্রাণে, মহামায়ার কাছে, রাজকুমারের জীবন ভিক্ষা করিলেন। অমনি পিছনে কিসের আলো দেখিলেন। সে আলো পৃথিবীর কোন প্রকার আলোর মত নয়—অথচ আলো বলিয়াই বোধ হইল। বনলতা মা! মা! বলিয়া ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া আবার রাজকুমারের জীবন ভিক্ষা করিলেন।

শব্দ হইল "তথাস্তু। আর কি চাও?"

বনলতা অবনত মস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "রাজকুমারের মঙ্গল।"

শব্দ হইল "তথাস্তু। আর কি চাও?"

বনলতা আবার অবনত মস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "রাজকুমারের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

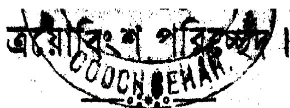
শব্দ হইল "তথাস্তু। তোমার নিজের জন্য কি চাও?"

বনলতা আবার অবনতমস্তকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "রাজকুমারের মঙ্গলের জন্য যেন আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।"

তখন শব্দ হইল "তথাস্তু। তুমি সতী। সমাজ তোমার তেজ ধরিতে পারিবেনা। তুমি বোনপুরের জঙ্গলে গিয়া রাজকুমারের মূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তিজ্ঞানে ধ্যান করগে, শিবনাম জপ করগে, সেখানে গুরুদীক্ষা পাবে। আমার শক্তি তোমায় রক্ষা করিবে। ইহার অন্যথায় রাজপুত্রের অমঙ্গল। শব্দ নীরব হইল। বনলতা মাথা

তুলিয়া দেখেন সে মূর্ত্তি নাই, আলোক নাই। সে আলোকের ছায়া যেন প্রকৃতিতে রহিয়াছে, সেই মধুর উন্মাদক শব্দের প্রতিধ্বনি যেন প্রকৃতিতে বাজিতেছে। বনলতাতে তখন নূতন তেজ নূতন সাহস প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তখন বিশ্ববিজয়িনী মূর্ত্তিতে, অন্ধকারে জলে মাথা ডুবাইলেন। আস্তে আস্তে ভিজা মাথায় ক্ষুর বুলাইলেন। মাথার সৌন্দর্য্য ঘাটে পড়িল। পুরুষের মত কাপড় পরিলেন। আলখেল্লা গায়ে দিলেন। অঞ্চলে ভস্ম আনিয়াছিলেন—তাহা মুখে মাখিলেন। তারপর সেই আলোক মধ্যস্থ বালিকামূর্ত্তি স্মরণে, আনন্দে সাহসে পৃথিবীকে যেন কৈলাস ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। কত গ্রাম, কত মাঠ অতিক্রম করিয়া রেলষ্টেসনে গিয়া টিকিট কিনিলেন। তার পর আবার ষ্টেসনে নামিয়া কুড়িক্রোশ পরে সেই জঙ্গল পাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।



চুম্বন ও আলিঙ্গন।

মুঙ্গেরে রাজকুমারের ব্যারাম খুব বাড়িয়াছিল। যে রাত্রে মহামায়ার কৃপায় বর পাইয়া বনলতা রাজকুমারের মঙ্গলার্থে প্রেম-ব্রত উৎযাপনের জন্য বনপুরের জঙ্গলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেই রাত্রে ভোরে রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন, "সেই দীঘির ঘাটে বনলতা গৃহতাড়িতা হইয়া, তাঁর জন্য আকুল প্রাণে কাঁদিতেছেন। হঠাৎ বনলতার পিছনে বন আলো করিয়া এক অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা বনলতাকে সান্ত্বনা করিয়া শক্তি, সাহস ও বর দিতেছেন। তিনি দীঘির পাড় হইতে সব দেখিতেছেন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁদের কাছে যাইতে পারিতেছেন না। বালিকা বনলতাকে বর দিয়া বিদায় করিলেন। তিনি বনলতার সঙ্গে যাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পা উঠিতেছেনা। তখন তাঁর কষ্ট বুঝিয়া বালিকা কাছে আসিলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম করিলেন। বালিকা হাতে করিয়া তাঁকে একটী রেশমের মত শিকড় দিলেন। বলিলেন "এই শিকড়ের আধখানা গঙ্গাজলে বাটিয়া খাইবে, অপর আধখানা সোণার মাদুলিতে ধারণ করিবে।" বলিয়া বালিকা ফিরিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা! বনলতা কোথায় গেল? আমি সঙ্গে যাব।" মা বলিলেন "বাবা! তোমার একটী পুত্র হইলে সংসার বিরক্তি বাড়িবে। তখন আমার বাম-

দেবের কাছে দীক্ষা লইয়া বনে তপস্যা করিতে যাইবে। বনলতাকে জঙ্গলে একদিন পাইবে। তার মৃত্যু শয্যায় তার মাথায় পা দিয়া দাঁড়াইবে। তোমাতে শ্রীসদাশিবের মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সে আমার কোলে লুকাইবে।” স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে চক্ষেরজলে বালিস ভিজিতেছিল। হঠাৎ সেই মাতৃমূর্ত্তি আলোক সহিত আকাশে মিশিবামাত্র স্বপ্নের সহিত তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত। হাতের মুঠায় প্রকৃত শিকড় দেখিয়া দুর্গা ভক্তিতে কাঁদিতে লাগিলেন।

পিসীমা, গঙ্গাজলে সেই শিকড় বাটিয়া কুমারকে খাওয়াইলেন। যেন অমৃত—এমন মিষ্ট জিনিস জীবনে খান নাই। খাইবামাত্র শরীরে এক তেজ অনুভব করিলেন। আর অসুখ নাই—এই বিশ্বাস যত বাড়িল তিনি ততই সুস্থ হইলেন। সপ্তাহের শেষে তিনি নির্দ্দোষ আরাম হইলেন।

ঐ স্বপ্নের পরে, তিনি দেহে মনে যতই বল পাইতেছেন তাঁর প্রাণ ততই বনলতার জন্য পাগল হইতেছে। শুইয়া, বসিয়া কেবলই বনলতার চিন্তা। বনলতার জন্য, (ঔষধ সেবনের সাতদিন পরেই) দেশে ফিরিলেন।

দেশে আসিয়া শুনিলেন বনলতা ঘরে নাই—আত্মীয়দের বাটীতে নাই—নিরুদ্দেশ, স্বপ্নের কথা সত্য বোধ হই। গোপনে গোপনে স্ত্রীলোক দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করিলেন—পাইলেন না। স্বপ্নের কথা সত্য দেখিয়া তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস বাড়িল।

যেখানে বনলতাকে হৃদয়ে ধরিয়া দেশত্যাগিনী করিয়াছেন; সেই ভাঙা ঘাটের উপরে, রাজকুমার এক প্রকাণ্ড বৈটকখানা প্রস্তুত করাইলেন। ঘাটের সেই সব ভাঙা ইট, সেহলা, ঘাস,

আগাছা, ডাঙা গুগলি যেমন তেমনি রাখিয়া চারিদিকে, বৈটকখানা তুলিলেন। তাহার উপরে ছাদ খোলা থাকিল। আলো, বাতাস, শিশির, বৃষ্টি আগের মত আসিতে লাগিল। সেই তৃণ, সেহলা, আগাছা সতেজ রাখিবার জন্য কুমার স্বয়ং জলসেক করেন। দিবসে সেই ঘাসে, আগাছায় মাথা রাখিয়া শয়ন করেন; প্রণয়ের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হন। কিছুদিন পরে বনলতাকে স্মরণে ধরিয়া, এক চিত্র আঁকিলেন। অনেক প্রকার রং, তুলি, আনাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া প্রণয়িণীর মূর্ত্তি আঁকিলেন। মূর্ত্তি অনেকটা বনলতার মত হইল। কিছুদিন পরে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, স্বয়ং মাটীতে গঠিত করিলেন। বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। কয়েকমাস পরে, ইংরেজ কারিকর আনাইয়া মার্ব্বল পাথরে সেই মূর্ত্তি খোদিত করাইলেন। বহু অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। তিনি দিবসে সেই মূর্ত্তির কাছে, সেই ঘাস শেহলার কাছে বসিয়া, শুইয়া প্রাণান্তক যাতনা কিঞ্চিৎ নিবারণ করেন। বনলতার চিন্তায় যখন আপনহারা হন, তখন সেই মূর্ত্তিকে প্রকৃত বস্তুজ্ঞানে চুম্বন ও আলিঙ্গন করেন। এ যদি না করিতেন, তো এতদিনে বনলতার শোকে পাগল হইতেন। সন্ধ্যা হইলেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত কর্ত্তব্যবোধে রাজবাটীতে প্রেমদার মনস্তুষ্টির জন্য যাইতেন। সব রাত্রি যাইতেন না;—প্রেমদাকে বলিয়া এক এক রাত্রি অধ্যয়নের ছলনায় সেই গঠিতা বনলতার কাছে, থাকিয়া রাত্রি যাপন করিতেন।

একদিন রাত্রে প্রেমদার কাছে শুইয়া আছেন। গ্রীষ্মকাল। ঘরের সব জানালা খোলা। ঘরের আলো নিবান। প্রেমদার অনাবৃত মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। রাজকুমার হঠাৎ তাহা

দেখিলেন। আহা কি সুন্দর!—বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। বনলতার মুখও মনে পড়িল। তখন চক্ষুমুদিয়া কল্পনায় প্রেমদার কাছে বনলতাকে শুয়াইলেন। দুখানি মুখ সামনা সামনি রাখিয়া দুখানিকে সমানভাবে সছায়া চন্দ্রকরদীপ্ত দেখিলেন।—আহা কি সুন্দর! এই দুটীইতো আমার স্ত্রী? আমিতো দুইজনেরই স্বামী? তবে একজনকে কম ও একজনকে অধিক ভালবাসি কেন? আত্মা তো এক—দুই নহে। সাংখ্যের কথা মিথ্যা—বেদান্তের কথা সত্য। এক আত্মার দুই প্রকাশ—একটী বনলতা একটী প্রেমদা। আমার বনলতাও যে, প্রেমদাও সে। তবে পৃথক ভাবি কেন? ভাবিতে ভাবিতে কল্পনার দেশে ও মাটীর দেশে এক করিলেন, কল্পনাও সত্য এক ভাবিলেন। বনলতা ও প্রেমদা এক বস্তুর দুই রূপ—এক বৃন্তে দুই ফুল—ভাবিতে ভাবিতে সৌন্দর্য্যের নেশা হইল। নেশায় সেই মুখ আরো সুন্দর হইল। তখন বনলতার রূপ ভুলিয়া প্রেমদার সেই চন্দ্রকর ফুল্ল মুখে আপনাকে হারাইলেন। অজ্ঞাতে মুখের কাছে আপনার মুখ অগ্রসর করিতে করিতে, আনন্দোন্মত্ত হইয়া সেই চন্দ্রকরের উপরে ঠোঁট দুটী সংলগ্ন করিলেন। তখন চন্দ্রকরের আধখানা স্ত্রীর মুখে, আধখানা স্বামীর ঠোঁটে, বায়ু সঞ্চালনে কাঁপিতে থাকিল। সেই চুম্বন বড় মিষ্ট—যেন অমৃতভাণ্ডে মুখ রাখিয়া স্বামী অমৃত পান করিতেছেন। সেই দীঘির ঘাটে বনলতার মুখ চুম্বনে জগতের অমৃত শুষিয়াছিলেন, আজ সেই অমৃতের কিয়দংশ শুষিলেন। দুই বৎসর পরে এই অমৃত ভোগ। কুমার ভাবিলেন "সে সুখ সে আনন্দ সে অমৃত যেন সমুদ্র, আর এ যেন সরোবর—এরূপ হইল কেন? এমন সময়ে প্রেমদার ঘুম ভাঙিল। প্রেমদা দেখিলেন, স্বামী তাঁহাকে

বুকে জড়াইয়া শুইয়াছেন—মাঝে মাঝে মুখচুম্বন করিতেছেন—আলিঙ্গনে চাপিয়া ধরিতেছেন। প্রেমদা জীবনে স্বামীর এ আদর পাননাই—আজ আদরের সাগরে ডুবু ডুবু—প্রেমদার চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিল—দেহ পুলকে কণ্টকিত হইল। প্রেমদা নিজে স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন—চুম্বন করিলেন—তখন দীঘির ঘাটের আনন্দের মত রাজকুমারের কতকটা আনন্দ হইল—কিন্তু তেমনটী হইলনা।

কুমার ভাবিলেন, "ইহার কারণ কি? বনলতার প্রণয় বোধ হয় অসীম—অসীম সাগরে জল অধিক—গভীর প্রেমে অমৃত অধিক। তাই বোধ হয়।" কুমারের হিসাবে ভুল হইল।

শপথ করিয়া বলিতে পারি, প্রেমদার প্রেম বনলতারই তুল্য। কিন্তু চারি চক্ষের প্রথম মিলনে যে প্রেমের আদান প্রদান হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে মেশামিশি, আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন চুম্বন হয়, প্রেমদাতে রাজকুমারেতে তাহা হয় নাই। ইহা প্রেমদার দুর্ভাগ্য। বিবাহের সময়ে যে কাপড়ের আড়ালে চারি চক্ষের চাহনি হয়—সেই চাহনির সন্ধিক্ষণে * জগতের প্রেম, দৃষ্টি ভেদিয়া অদৃশ্য বিদ্যুতে দম্পতীর অস্তিত্বকে অনন্তকালের জন্য পূর্ণ করে, ইহাই বিবাহ। বিবাহের সময় বস্ত্রের আড়ালে, প্রেমদা আপনার প্রাণ, হৃদয়, সৌন্দর্য্য, ইহকাল, পরকাল, দৃষ্টির ভিতর দিয়া, স্বামীর দৃষ্টিতে ঢালিবার জন্য যখন আকুল হইয়াছিলেন, তখন রাজকুমার মুদিত নয়নে কল্পনাচক্ষে বনলতার চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে অশ্রুপাত

---

* মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে যে পূজা বলীদান, এখানে সেইভাব বুঝিতে হইবে। এই চারিচক্ষের চাহনিতে যে সন্ধি হয় তাহাই হরপার্ব্বতীর মিলন।

করিয়াছিলেন। সেই জন্য দুই জনের প্রাণে প্রাণে বিবাহ হয় নাই। তবে প্রেমদার অনন্তপ্রেম বশতঃ রাজকুমার আলিঙ্গন চুম্বনে অতটা তৃপ্তি পাইলেন। বনলতার সহিত আলিঙ্গন চুম্বনে *সমুদ্রে সমুদ্র মিশিয়াছিল। এখন সমুদ্রে ক্ষুদ্র নদী মিশিল।*

বেরসিক পাঠক! আলিঙ্গন চুম্বনের বর্ণনায় আমার উপর রাগ করিবেন না। উহা হৃদয়ের ধর্ম্ম—বুদ্ধির নহে। হৃদয়, আলিঙ্গন চুম্বনের ভাণ্ডার। যার হৃদয় যত বড় তার আলিঙ্গন চুম্বন তত সুখকর। মা ছেলেকে আলিঙ্গন চুম্বন করেন;—তাহাতে হৃদয়ের অমৃত কেমন মিষ্ট তাহা ছেলে বুঝে। যুবতীকে দেখিয়া যুবার হৃদয়ে যখন কাম সমুদ্র উথলিতে থাকে, সে সমুদ্রের তেজ আলিঙ্গন চুম্বনে প্রকাশ পায়। মানব হৃদয়ে (সমুদ্রেরমত) বিষ, অমৃত, দুইই আছে। কিন্তু চুম্বন আলিঙ্গনে কখনও বিষ বাহির হয় নাই। যদি অমৃতের অক্ষয় তরু কিছু এই দুঃখের সংসারে থাকে তো ঐ চুম্বন, আলিঙ্গন। তবে ভীমের আলিঙ্গনে যে কীচকের মৃত্যু, তাহা আলিঙ্গন নহে—সংহারের ছদ্মবেশ মাত্র। কামুকের সহিত কামুকীর আলিঙ্গন চুম্বনে বিশ্বের প্রাণরূপী যে অগ্নি আছে, উহাই প্রেমের প্রথম প্রকাশ। যেরূপ কদর্য্য কাকবিষ্ঠাতে :পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষের জন্ম, সেইরূপ কদর্য্য কামেই প্রেমের জন্ম। "কামসে রাম" এই কথা অতি সত্য। কামুক কামুকী পরস্পরের আলিঙ্গন চুম্বনে জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুরতম সুখ সম্ভোগ করে। দম্পতী যত উন্নতচরিত্র, তাহাদের আলিঙ্গন চুম্বনের সুখ ও তত মিষ্ট এবং পবিত্র। এই চুম্বন আলিঙ্গনের মাদকতায় হৃদয়ের অমৃত ঝরিতে থাকে। যেমন আগুণে সোণার আসল ও খাদ ধরা যায়, সেই রূপ দম্পতীর চুম্বন আলিঙ্গনে জীবনের আসল ও খাদ ধরা পড়ে। এই

চুম্বন আলিঙ্গনে অর্থাৎ দম্পতীর দেহমনের সম্মিলিত যজ্ঞে সকল প্রকার অমৃতের পরাকাষ্ঠা। কাম বিহীন চুম্বন আলিঙ্গন যেমন পবিত্র তেমনি সুখকর। চুম্বন আলিঙ্গনে কাম যত অল্প সুখও তত অধিক। যেখানে কাম গন্ধ আদতে নাই, সেখানে চুম্বন আলিঙ্গনে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন। দম্পতীর কামপূর্ণ চুম্বন আলি-ঙ্গন (আহা !) কবে ঐ পবিত্র আদর্শে উঠিবে ? এই চুম্বন আলিঙ্গন রূপ বৃক্ষ মানুষের কামে জন্মাইয়া, ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া, বৈকুণ্ঠ গোলকে গিয়া ভগবান ভগবতীর পদতলে অপূর্ব্ব কুসুমাকার ধারণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে।

এই রাত্রে প্রেমদা ঋতুস্নাতা ছিলেন। সুতরাং ভগবানের কৃপায় রাজবংশ রক্ষার উপায় হইল। দশমাস পরে একটী ঘর আলো করা পুত্র হইল।

ছেলেটী যখন পেটে তখন রাজকুমারের সংসার বিরক্তি প্রবল হইল। এক দিন শ্রীবামদেব স্বামীকে দেখিতেগেলেন।



চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

শ্রীশ্রীবামদেব স্বামী।

রামপুর হাটের নিকটে তারাপুর গ্রাম, এখানে ক্ষীণতোয়া দ্বারকা নদীর তীরে ভারতগুরু বশিষ্ঠের সাধনাসন আছে। নদীর তীরে প্রকাণ্ড শ্মশান। শ্মশানের ধারে নিবিড় বন। বনে নিম্ব বট অশ্বত্থ বিল্ব প্রভৃতি সাত্বিক বৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। বশিষ্ঠ এই আসনে মহাসাধনায় চিন্ময়ীমার দর্শনে কৃতার্থহন। এখানে সেই মহাভক্তের আধ্যাত্মিক শক্তি এখনও জীবন্ত আছে। এই আসনে এক রাত্রি সাধন করিলে মহামায়ার দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রের এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, অনেক তান্ত্রিক এই আসনে সাধনা করেন। শতের মধ্যে এক জন সিদ্ধ হন। অন্ধকারে এই আসনে সাধন করিতে করিতে কত সাধক ভয় পাইয়া পলাইয়াছে—পাগল হইয়াছে। সম্প্রতি একজন বেহার হইতে সাধন করিতে আসিয়াছিলেন, ইনি তান্ত্রিক বিধান অনুসারে আসনে বসিয়া জপ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, যখন বনদেশ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; আকাশে মাঠে রাত্রি গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিল; চারি দিকে ঝি ঝি রবে প্রকৃতির গীত উথলিতে থাকিল; তখন সাধক অকস্মাৎ একটা হুঙ্কার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সেই হুঙ্কার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া

প্রকৃতির অন্যান্য শব্দকে ডুবাইয়া ফেলিল; সে রব বাড়িতে বাড়িতে যেন সমুদ্রের কল্লোল শব্দবৎ বোধ হইল। সাধকের মনে হইল, যেন তিনি সমুদ্রের গর্জ্জনের মধ্যে রহিয়াছেন। সেই রব ক্রমশঃ ভীষণতর হইতেছে। সাধকের মনে হইতেছে যেন তিনি সমুদ্রের মধ্যস্থলে জলের উপরে ভাসিতেছেন, তাঁহার মন তখন একটু ভয়ে চঞ্চল হইল, সাধক ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলেন। সে সব গাছ লতা পাতা কোথায়? চারি দিকে জল—জল—পাহাড়ের মত তরঙ্গ—কুল কিনারা নাই—সাধক মহাসমুদ্রে ভাসিতেছেন। হঠাৎ সেই সমুদ্রে অট্টহাসির মহারোল উঠিল। সাধক ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন সেই প্রকাণ্ড সমুদ্রের ভিতর হইতে, একটী বালকের মূর্ত্তি বাহির হইয়া, আপনার দেহ বাড়াইতে বাড়াইতে প্রকাণ্ড জটাজূটবিভূষিত হইয়া, নিজদেহে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া, ভীষণ স্বরে চীৎকার করিলেন "হিয়াসে ভাগ (অ,"। যেন শত শত কামানের গর্জ্জনে সেই শব্দ ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিয়া উত্থিত হইল, সেই ভীষণ শব্দে সাধক মুর্চ্ছিত হইলেন। পর দিবস প্রাতে আটটার সময়ে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে, চাহিয়া দেখেন, তিনি সে বনে নাই, নদীর পরপারে মাঠের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন।

এই তারাপুরের বশিষ্ঠাসনের কাছে মহামায়ার যে প্রকার উগ্র ভাব এরূপ বোধহয়, আর কোথাও নাই। রাত্রে এই শ্মশানের কাছে বসিয়া দুর্গাচিন্তা করিলে মহাশক্তির জীবন্তভাব অনুভূত হয়। এখানকার আসনে বসিয়া সাধন করার না না বিঘ্ন। পঞ্চাশ বৎসরে বোধহয় সহস্র সহস্র সাধক আসিয়া আসনে বসিয়াছেন—বসিয়া নাম জপিতে জপিতে নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়াছেন।

আমাদের বামদেব স্বামীর প্রতি মহামায়ার আশ্চর্য্য কৃপা, ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে এই আসনে সাধনা আরম্ভ করেন। তারপর সিদ্ধ হইয়া এই জঙ্গলে আসন জড়াইয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর রহিয়াছেন। বামদেব তারামার আদুরে ছেলে। আমাদের উপন্যাসে একটী মহারথী। সুতরাং ইহাঁর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বামদেব তারাপুরের নিকট চণ্ডীপুর গ্রামে দুর্গানাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে উমাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র।

একাদশ বৎসরে বামদেবের উপবীত সংস্কার হইলে তাঁরজীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। যিনি আদৌ লেখাপড়া করিতেন না; মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে বেড়াইতেন ; গ্রামের লোককে জ্বালাতন করিয়া মারিতেন; তিনি উপবীত সংস্কারের শক্তিতে শক্তিশালী— প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিবামাত্র প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন, বাটীতে শালগ্রাম ছিলেন। তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। বেলা নয়টার পর ঠাকুর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, দেবতার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। সে কান্না আর কিছুতেই থামেনা। ঠাকুর ঘরের মেজের মাটী কান্নার জলে ভিজিয়া কাদা হয় সেই কাদামাখা বুকে রাঙা রাঙা চখে সন্ধ্যার একটু আগে পাগলের মত ঘরের বাহির হইয়া কিছু আহার করেন। সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি শেষ করিয়া আবার ঘরে খিল দেন। সমস্ত রাত্রি দেবতার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার দর্শনের জন্য পাগল হন। এই প্রকারে তাঁর জীবনের কয়েক বৎসর কাটিল। ইহাতে তাঁর মহা আনন্দ, পরমা শান্তি।

ভাল আহার নাই, গভীর নিদ্রা নাই অথচ বামদেবের এই কাতর সাধনায় কুমারদেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য শ্রী ফুটিল, মুখে চখে আনন্দ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল —বামদেব যেন কুমার কার্ত্তিক।

বামদেবের বয়স যখন তের বৎসর, তখন একদিন তারাপুরের তারামার মন্দিরে বসিয়া, মার মূর্ত্তির দিকেচাহিয়া চাহিয়া, ভক্তিতে গদ গদ হইতেছেন, এমন সময়ে সেই মূর্ত্তির ভিতর হইতে একটী বালিকামূর্ত্তি বাহির হইয়া যেন তাঁর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বামদেব ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। দুইজন পাণ্ডা তাঁর সুশ্রুষা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁর চৈতন্য হইল না। তিন ঘণ্টা পরে বামদেবের সংজ্ঞা হইলে চক্ষে আশ্চর্য্য তেজ ও সৌন্দর্য্য, মুখে অপূর্ব্ব মাধুরি ও লাবণ্য প্রকাশ পাইল। বামদেব সজল নয়নে আকাশের দিকে চাহিলেন।, দেখিলেন আকাশের নীলিমার মধ্যে ছায়াকৃতি তেজস্বিনী তারামূর্ত্তি অনন্ত স্নেহে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি প্রেমে কাঁপাইয়া বলিতেছেন "বামা! আজ হতে আমার শিমুল তলায় আমার বশিষ্ঠের আসনে বসে সাধন কর"। মার সেই প্রেমপূর্ণ কথায় তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন স্থির হইল! বামদেব কিয়ৎক্ষণ প্রেমাবেশে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইলেন। অপলক চাহনিতে আকাশের সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অশ্রুধারা বর্ষণে আপনার মুখ, বুক ও মাটী ভিজাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া "মা! মা!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিতে থাকিলেন সেই মাটী যেন তারামার কোমল কোল বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভক্ত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া, যে তৃপ্তি শান্তি পাইলেন, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আপনার হারান সাম্রাজ্য

পাইয়া সে তৃপ্তির তিলাংশও পান না। বামদেব বুঝিলেন, তারামার এই স্থান, এই মাটী, এই শ্মশান তাঁর কৈলাস—আরাম—তৃপ্তি। আজ আর বাটী যাইলেন না। বামদেবের মা বাপ খুড়া প্রভৃতি আত্মীয়েরা আসিয়া কত কাঁদিলেন, কত অনুনয় বিনয় ভয় প্রদর্শন করিলেন; ভক্ত মহামায়ার সেই মধুর স্বর মনে করিয়া, মহাশক্তিবৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া, আত্মীয়দের পায়ে ধরিয়া, এমনি ব্যাকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিলেন যে, ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহাদেরও প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। পিতা তারামার মন্দিরে পুত্রের জন্য হত্যা দিলেন। স্বপ্ন হইল "তোমার বামদেব আমার কোলে আছে ভয় কি?" বামদেবের ভক্ত পিতা, মহামায়ার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, পুত্রকে শিমুল তলায় মার কোলে রাখিয়া ঘরে ফিরিলেন।

বামদেব তের বৎসর বয়সে সেই দিন হইতে শিমুলতলা সার করিলেন। সেইখানে বসেন, শোন, খান, ঘুমান, গান করেন, নৃত্য করেন, কাঁদেন, হাসেন, মহানন্দে বিভোর হন। সেই বন তাঁর গৃহ। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তাঁর পরমাত্মীয়। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় গাছপালা-পশু-পক্ষীর মত অনাবৃত দেহে মার নামে বিভোর হইয়া থাকেন। আগে ঘরে বামদেবের ব্যারাম পীড়া হইত.—মার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আর ব্যারাম পীড়া নাই। শীতের হিমে, গ্রীষ্মের তাপে, বর্ষার জলে, ভক্ত হৃষ্টপুষ্ট হইলেন। গাছলতা পশুপক্ষীর যিনি আশ্রয়, বামদেবেরও তিনি আশ্রয়। ভক্ত সে বন, সে শিমুল তলা ছাড়িয়া কোথাও যান না। পৃথিবীর কোন চেষ্টাই রাখিলেন না—আহারেরও নয়। কালীর প্রসাদ পাণ্ডারা যা দয়া করিয়া দেন, তাই খাইয়া অমৃত ভোগ করেন। একদা তিনদিন দুষ্টামি করিয়া পাণ্ডারা ভোগের প্রসাদ দিলেন না।

বামদেবের সেজন্য ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি সিমুল তলার মাটী খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। কিন্তু জগন্ময়ী মহামায়া, দেবালয়ের স্বত্বাধিকারী নাটোর রাজকে স্বপ্নে বলিলেন "আমার তিন দিন পূজা হয় নাই; কারণ আমার বামদেব তিনদিন অনাহারী।" রাজা স্বপ্ন দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তারাপুরে লোক পাঠাইয়া পাণ্ডাদিগের জরিমানা করাইলেন। তখন বামদেবের সম্মান পাণ্ডাদের কাছে বাড়িল। এই ঘটনা বশতঃ অনেকে বুঝিলেন, বামদেবে মার কৃপা হইয়াছে, বামদেব মার ভক্ত সন্তান। কেহ কেহ ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া কাঁদিলেন কেহ কেহ ভক্তিভরে বামদেবকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। একজন পাণ্ডা সময়ে সময়ে তাঁকে গালি দিতেন, তিনি বামদেবের পায়ে ধরিতে গেলেন। তিনি কাহাকেও পা ছুঁতে দেন না। অপরের পা ছুঁইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

বামদেব তারামূর্ত্তির সাধক। তারা, তারা, তারা বই আর বলেন না, জানেন না। তারাপুরের তারামার মূর্ত্তি ভাবিয়া ভাবিয়া আপনার দেহে সেই মূর্ত্তি ফুটাইয়াছেন। দেখিলে মনে হয় যেন তারামা বামদেবের দেহে লুকাইয়া "বামদেব নামে" লীলা করিতেছেন। এতবড় উগ্রমূর্ত্তির ভিতরে কিন্তু উগ্রভাব নাই—বালকের কোমল ভাব। বালকের মত কথার সুর, বালকের মত আচরণ, বালকের মত কখনও বস্ত্রপরিহিত, কখনও উলঙ্গ। শ্মশান ছাড়া তাঁর আর কোন সম্পত্তি নাই। মড়ার কাপড়, মড়ার মাদুর, মড়ার বালিস, মড়ার মাথা, মড়ার বাঁস এই সব ঐশ্বর্য্যেই তাঁর অপূর্ব্ব শোভা সম্পদ। তিনি মদ, সিদ্ধি, গাঁজা দিবারাত্রি তারামাকে ভক্তিভরে নিবেদন করিয়া প্রসাদ খাইতেছেন। আধমন

মদ খাইয়াও তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি অবিকৃত। যত মদ খান ততই তারাভক্তিতে উন্মত্ত হন। তারাপ্রেমের তরঙ্গে সাধকভক্ত, পাষণ্ডকে মাতাইয়া ফেলেন। মদ, গাঁজা, সিদ্ধির উন্মাদকশক্তি বামদেবে কেবল বিশ্বাস ভক্তিকেই বর্দ্ধিত করিতেছে। মার পাদ-পদ্মে বিশ্বাস করিয়া, হলাহল খাইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ফোটে ;—ইহা বামদেবের জীবনে লোকে দেখিতেছে। যাহার সংস্পর্শে মানুষের ইহকাল পরকাল রসাতলে যায়, মার নামের জোরে সেই বিষ দিবা-রাত্রি খাইয়া বামদেব যেমন মাতৃজ্ঞানে মাতৃভক্তিতে সিদ্ধ হইলেন, এমন আর দেখা গেলনা। ইহা অপেক্ষা বীরত্ব আর কোথা? প্রহ্লাদের আগুণে জলে পরীক্ষা, আর আমাদের বামদেবের গাঁজা সিদ্ধি মদে পরীক্ষা। দুইচার ছটাক মদে যে মাথা ঘুরিতে থাকে, অসীম ব্রহ্মতত্ত্বের নির্ণয় সে মাথার কার্য্য নয়। দশ বার সের মদেও যে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় না, সেই মস্তিষ্কই এই অনাদ্যনন্ত তত্ত্বের কণামাত্র অনেক চেষ্টায় কখনও না কখন বুঝিতে পারিবে। বামদেব কি বাস্তবিক মদ্যপায়ী? মাতাল? অবিশ্বাসীর কাছে তিনি মদ্যপায়ী মাতাল, কিন্তু বিশ্বাসীর কাছে তিনি অমৃতপায়ী সিদ্ধ পুরুষ—কালীপ্রেমে মাতাল। যে মদে কামিনী কাঞ্চনের নেশা বাড়ায়, বামদেব জীবনে সে মদ খান নাই—স্পর্শ করেন নাই। তিনি তারামন্ত্রে মদের স্বাত্বিকভাব বাড়াইয়া তারাপ্রসাদ জ্ঞানে ভক্তির সহিত খাইয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হন। সে প্রসাদ একলা খান না। উপযুক্ত লোকদিগকে বণ্টন করেন, আগে যাহা বিষ ছিল তারামার জিহ্বাস্পর্শে তাহা অমৃত হইল। কারণ তাহাতে মদের গন্ধ মদের আস্বাদন নাই—কেবল অমৃতের গন্ধ অমৃতের আস্বাদন। •

বামদেব একবার কাশী যান। সেখানে অন্নপূর্ণা, সর্ব্বমঙ্গলা, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তি দেখিলেন, কিন্তু তারামার মূর্ত্তি না দেখিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। আমার তারা মা কই? তারা মা কই? বলিয়া বালকের মত রোদন করিতে করিতে মনের দুঃখে, একবিন্দু জল গ্রহণ না করিয়া, পদব্রজে সেখান হইতে, পথে বেলপাতা খাইতে খাইতে, তারাপুরে আসিয়া, তারামাকে দেখিয়া, প্রাণের জ্বালা শান্ত করেন। এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তারামার আঁচল ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবেন না।

বয়স যখন চল্লিশ, বামদেবের গর্ভধারিণী মরিলেন। মাকে সেই শিমুল তলায় শ্মশানে দাহ করিতে আনা হইল। ছোটভাই রামচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার কাছে দাঁড়াইলে, দাদা বালকের মত ভুল ভুল করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন "রাম ভাই! কাঁদ কেন?"

রা। দাদা! মা ম'রেছেন। শ্মশানে এনেছি। মুখাগ্নি করিবেন চলুন।

বামদেব তারামাকেই জানিতেন, আর কোন মার কথা তাঁর মনে ছিল না; তাই চমকিতভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া, ভোঁ করিয়া দৌড়িয়া, কালী মন্দিরের দরজা খুলিয়া কাঁদু কাঁদু হইয়া বলিলেন "রাম ভাই! তুমি বল'ছ মা ম'রেছেন, কই মাতো এই রয়েছেন।"

রামের সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিরা বলিল "তোমার গর্ভধারিণীমা ম'রেছেন—তারা মা নয়।"

সেকথা শুনিয়া ভক্ত বিস্মিত নয়নে চাহিতে চাহিতে বলিলেন দুদুমা! দুদুমা।

তার পর মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া, রামচরণাদির সঙ্গে শ্মশানে গিয়া মার সৎকারাদি করিয়া, তারামার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হ্যাঁ মা! তুহমা তোতে লুকুলো! তুই আবার কাতে লুকুবি? তুই লুকুসনি মা! আমি তাহ'লে কার কাছে থাকবো।" বার বার এই কথা বলিয়া বামদেব কাঁদিতে কাঁদিতে অনেককে কাঁদাইলেন।

বামদেবের বিশ্বাস ভক্তির কথা চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। নানা দেশ হইতে মেয়ে পুরুষ তাঁকে দেখিতে আসিল। কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ সংসারের জন্য, কেহ ছেলে হবার ঔষধের জন্য আসিল। মহাপুরুষ কাহাকেও কৃপা করেন, কাহাকেও তাড়াইয়া দেন। কেহ তাড়িত হইয়া ফিরিয়া যায়, কেহ তাড়িত হইয়াও যায় না—তাঁর পায়ে হাতে ধরিয়া কার্য্য সিদ্ধি করে। অসচ্চরিত্র-দিগকে তিরস্কারে বিদায় করেন।

এক সময়ে কলিকাতা হইতে কোন স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে মহাপুরুষের কাছে ছেলে হবার ঔষধের জন্য আসিল। স্ত্রীলোকটী প্রণাম করিয়াই কাঁদকাঁদ হইয়া "বাবা! আমায় একটু দয়া করুন?" বামদেব বালকের মত সরল চাহনিতে স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা! আমি কিকৃপা ক'রবো মা!"

স্ত্রী। বাবা! আমার এত বয়স হল, এ পর্য্যন্ত ছেলের মুখ দেখলাম না। যদি কৃপা করেন, তাই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে এসেছি। অন্তর্যামী সিদ্ধ পুরুষদের সামাজিকতা জ্ঞান বড় দেখা যায় না। তাই বালকের মত সরল ভাবে বলিলেন "তারা মার যারা ভালো মেয়ে, তাদের তারা মা ছেলে দেন। তুমি রাত্রে স্বামীর কোল থেকে অন্য পুরুষের কাছে যাবে;—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই স্ত্রীলোক ভয়ে ভয়ে তখনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। স্বামীর স্ত্রীচরিত্রে আদতে সন্দেহ ছিল না। তিনি কথা শুনিয়া বামদেবের উপর চটিলেন। স্ত্রীলোকটী সেই গ্রামে স্বামীর সহিত একটী দোকানে রহিলেন। দোকানীর সহিত আলাপ হইলে, দোকানী বলিল" উনি মা! লোককে ঐ রকমে পরীক্ষা করেন। তুমি আবার যাও"।

স্বামীর মন সে কথায় আশ্বস্ত হইল। স্ত্রীলোকটী মনে মনে সবই বুঝিল। এখন দোকানীর কথায় স্বামীর মন সন্তুষ্ট দেখিয়া, দোকানীর যথার্থ পাওনার উপরে, পুরস্কার স্বরূপ কিছু ধরিয়া দিল। পর দিবস প্রাতে, স্বামীকে দোকানে রাখিয়া, একলা ঔষধের জন্য, যাইলেন। প্রতিজ্ঞা ঔষধ না লইয়া ছাড়িবেন না। বামদেব যে অসামান্য পুরুষ তাহা তাঁর খুব বিশ্বাস হইয়াছে। কারণ, পল্লী মধ্যে "সতী" বলিয়া প্রসিদ্ধার গুপ্ত কথা ভগবানের মত তিনি জানিতে পারিয়াছেন। বামদেব দূর হইতে, স্ত্রীলোকটীকে দেখিবা-মাত্র ভোঁ করিয়া বালকের মত দৌড় দিলেন। দৌড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে লুকাইলেন। স্ত্রীলোকটী অনেক অনুসন্ধানেও ধরিতে পারিলেন না।

বামদেব তারা সিদ্ধ। সেনাম সদাসর্ব্বদা বলেন, জপেন, কীর্ত্তন করেন। সে নামের জোরে যা ইচ্ছা তাই করেন। অন্ধের চক্ষুদান, বধিরের শ্রবণ দান, খঞ্জের গমন দান, বামদেব তারা নামের জোরে সমাধা করেন। নামে তাঁর অদ্ভুত বিশ্বাস। তিনি গায়ত্রী কিসন্ধ্যা—এসব জানেন না। তাঁর মহামন্ত্র মার নাম। দুর্গা তারা; দুর্গা মা, তারামা এই নাম এমনি মিষ্ট স্বরে বলেন, যে শুনিয়া কত পাষণ্ড ভক্তিতে গলিয়া সেই নামকে জীবনের এক

লাত্র অবলম্বন করিয়াছেন। বামদেব দুর্গা নামের জোরে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জয় করিয়া বসিয়াছেন—তাঁর অসাধ্য কি? তাঁর অন্ধের চক্ষু চিকিৎসা, খঞ্জের পদচিকিৎসা, বধিরের কর্ণ চিকিৎসা, কত লোক কাতার দিয়া, দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে। অন্ধ আসিয়া তাঁর কাছে কাঁদিতেছে, ভক্তের দয়া হইল। "আমার সঙ্গে আয়! তোকে তারাসমুদ্রে স্নান করাব"—এই কথা বলিতে বলিতে অন্ধের হাত ধরিয়া নদীতে লইয়া গেলেন। নদীর জলে "তারা তারা" বলিয়া ডুব দিতে বলিলেন। কি আশ্চর্য্য! অন্ধ ডুব দিয়া উঠিবা-মাত্র আর অন্ধতা নাই—দুটী নূতন চক্ষু ফুটিয়াছে। নদীর দুই পার্শে শ্রেণী দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া "তারা" "তারা" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা বামদেবের পায়ে লুটাইতে থাকিল। কাহারও বা তাহা দেখিয়া, জীবন্মুক্তির দ্বার খুলিয়াগেল। বামদেবের মহিমা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। *

---

* অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক কার্লাইল এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

Deep has been, and is, the significance of miracles; fardeeper, perhaps, than we imagine. Mean while the question of questions were; what specially is a miracle? To that Dutch King of Siam, an icicle had been a miracle; &c. * * * Was man with his experience, present at the creation, then to see, how it all went on? Have any deepest scientific individuals yet dived down to the foundations of the universe and gauged everything there? Did the Maker, take them

into His counsil; that they read, his groundplan of the incomprehensible All; and can say, this stands marked therein, and nomore than this? These scientific individuals have been nowhere but where we also are; have seen some hand breadths deeper than we see into the Deep that is infinite, without bottom as without shore—Thomas carlyle.

প্রকৃতির অনন্ত নিয়মরাজ্যে, কোন নিয়মের শক্তিতে মানুষ বাঁচে এবং কোন নিয়মের শক্তিতে মানুষ মরে তাহা কে বলিতে পারে? কোন ঘটনা বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া মিথ্যা—এ ভাব চিন্তাশীল মনের বিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ভক্তির আভাস।

যেসময়ে রাজকুমার জ্ঞানদানন্দন বৈরাগ্যের আবেগে সংসার পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময়ে, বামদেব স্বামীর নাম বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানদানন্দন তাঁকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন। একদিন সামান্য পরিচ্ছদে রামপুর হাটে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে বামদেবের কোন শিষ্যের সহিত তারা-পুর গেলেন। শিষ্যের নাম রসিকানন্দ।

প্রাতে রসিকানন্দের সহিত রাজকুমার পদব্রজে যাত্রা করিলেন। রাজকুমার শিমুলতলায়, একটী সামান্য কুঁড়ে ঘরের বাহিরে, অশ্বথ-তলে বামদেবকে দেখিলেন; খুব লম্বা দেহ, দোহারা, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, চক্ষু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাঙা জবাফুলের মত, নাক বাঁশির মত অথচ সুদৃশ্য। গায়ে গৌরিক আলখেল্লা।

রসিকানন্দের সহিত রাজকুমার বামদেবকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রণামের আগেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন। রসিকা-নন্দকে দেখিয়া বামদেব আনন্দে বলিলেন "কেও রসিক দাদা! এতদিন কোথা ছিলে? রসিকানন্দ প্রণত হইয়া গুরুর পদধুলি লইলেন। রাজকুমার পদধূলির জন্য নত হইয়া পার কাছে হাত বাড়াইলে, বামদেব পা লুকাইলেন। জ্ঞানদানন্দন তাহাতে মনে

একটু দুঃখ পাইলেন। অন্তর্যামী তাহা জানিতে পারিয়া বালকের মত স্বরে বলিলেন" রাজকুমার বাবা! আমি পাপী, আমার পা ছুতে আছে বাবা! তারামার পদধূলি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—সেই পদধূলি অঙ্গে মাখ বাবা!" রাজকুমার বালকের সুর, বালকের আচরণ দেখিয়া অবাক হইলেন। ভক্তিতে নম্র হইয়া সেই রক্তমাংসের ভিতরে তারামূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বলিলেন "বাবা! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

বামদেব তখন প্রেমদৃষ্টিতে রাজকুমারকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন "তুমি আমার তারাদাস! তোমায় শিমুলতলায় মার পাদপদ্মের ধূলি মাখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিব।"

তারপর রসিকানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন "রসিক দাদা! আর আমার খোঁজখপর রাখেন না। ভাগ্যে এই ছেলেটী সঙ্গে করে আনলেন, তাই এলেন। কতবলি এই থানটীতে তারামার কাছটীতে থাকুন, দুটী দুটী প্রসাদ খান, আর মার নাম করুন—তা শুনবেন না। ওঁর মনটী কেমন খ্যাপা। কেবল এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াবেন। রসিকানন্দ তখন গুরুর উপরে যেন একটু আবদার করিয়া বলিলেন "তা আমার যখন যেথানে মন যাবে আমি যাব।"

"তা আপনি যান, যেথানে যাবেন কেবল কুজাল, ভ্রষ্টজাল, বদকামানের দলে প'ড়ে কষ্ট পাবেন ;—

এই কথা বলিয়া, ভক্তরাজ রসিকানন্দের হাত হইতে মদের বোতল লইয়া জিজ্ঞাসিলেন "একোথা পেলে দাদা! এযে বড় ভাল অমৃত।"

"এই ছেলেটী তারামাকে নিবেদন করিবার জন্য দিয়াছেন ;—"

এই কথা রসিকানন্দ বলিলে, ভক্তরাজ দুর্গা ভক্তিতে গদ গদ হইয়া বলিলেন "তারামার জ্ঞানীছেলে গো! বড় ভাল ছেলে।"

এই সময়ে রাজকুমার ভাবিতেছেন, যদি নিবেদিত মদ প্রসাদ স্বরূপ কিছু দেন তো কি করিব? আমি বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে মদ ছাড়িয়াছি। কিন্তু এই মহাপুরুষ যদি নিজে হাতে করিয়া দেন তো খাইতেই হবে, নহিলে ভক্তের অপমান। এখন কি করি?" রাজকুমার এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বামদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বাবা আমার ভয় পাচ্ছেন! ভয় নাই বাবা! আমি ইংরাজের কালকুট শুঁড়ির বিষ কখনও খাইনা। প্রহ্লাদ যেমন ভগবানকে বিষ দিয়া অমৃত করিয়া খাইয়াছিলেন, আমিও তেমনি মাকে বিষ দিয়া অমৃত করিয়া খাই বাবা! মার প্রসাদ খাবেনা বাবা? মদের গন্ধ মদের আস্বাদ থাকবে না। যদি থাকেতো খাবে না! ঠিক অমৃতের মত গন্ধ হবে স্বাদ হবে, না হয়তো খাবে না বাবা!" এই কথা বলিয়া ডানহাতে কারণের বোতল ধরিয়া, দুচক্ষু মুদিয়া গম্ভীরস্বরে "তারা মা! তারা মা! তারা মা!" বলিয়া মদ মাকে নিবেদন করিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ এক স্বর্গীয়সৌরভে আকাশ পূর্ণ হইল। যুবরাজ জীবনে সেরূপ গন্ধ কখনও পান নাই। কত ভাল ভাল গোলাপ, আতর, মৃগনাভি প্রভৃতি পৃথিবীর কত সুগন্ধভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এমন সৌরভ কখনও ভোগ করেন নাই। তাই আগ্রহের সহিত রসিকানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন "কোথাথেকে ফুলের গন্ধ আসছে! আহা! আহা! প্রাণ পাগলক'রে তুলছে! বনে কি ফুল ফুটলো?

ভক্তরাজ বামদেব, সেকথা শুনিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন "রাজ-

কুমার বাবা, ভাবছেন বনে ফুলফুটেছে! বন খুঁজে দেখুন। ফুল ফোটে নাই। তারাসুন্দরী মার পাদপদ্মের গন্ধ! মা ছেলেদের আপনার পার সৌরভ খাওয়াচ্ছেন।"

তারপর নিবেদিত কারণ নরকপালে ঢালিয়া, আপনি পান করিয়া, রাজকুমারকে হাত পাতিতে বলিলেন। রাজকুমার হাতে কয়ফোঁটা কারণ ধরিলেন—ঠিক অমৃতের গন্ধ। খাইলেন—আঃ কি মিষ্ট! সমস্ত দেহের ভিতরে একটা যেন শান্তির প্রবাহ ছুটিল! মন আনন্দে উন্মত্ত হইল। বুদ্ধি স্মৃতি প্রখরা হইল। হঠাৎ যেন প্রকৃতির অন্ধকারে আলো দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—রাজকুমারের চক্ষে ভক্তির জল ঝরিল। অন্যান্য ভক্তেরা সেই প্রসাদ পানে, "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া হুঙ্কার দিতে লাগিল। বামদেব প্রেমে গদ গদ হইয়া বলিলেন "এখন আমরা মার নামের জোরে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল একমুহূর্ত্তে জয় করিতে পারি।" সেই কথার ভিতর হইতে বিশ্বাস ভক্তির তড়িৎপ্রবাহ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে প্রাণে ছুটিতে লাগিল। তখন "জয় জগন্ময়ী তারা" নামের হুঙ্কারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের মনের অবিশ্বাস খসিয়া পড়িল। রসিকানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি বামদেবের সহিত সমস্বরে গান ধরিলেন :—

আমি দুর্গা দুর্গাব'লে যদি মা মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করি॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক (ওমা!)
ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

গানের প্রত্যেক শব্দে বিশ্বাস ভক্তির অমৃত উঠিতেছে। রাজকুমার এতদিনপরে একটু শান্তি—শান্তি—শান্তি পাইলেন। চক্ষেরজলে বুক ভাসিতেছে। এই চক্ষের জলই মানুষের প্রকৃত শান্তিরজল। তখন ভক্তিবিরোধী রাজকুমার মনে মনে ভাবিতেছেন "ভক্তি ই" শ্রেষ্ঠ পদার্থ। "জ্ঞান" ছাই ভস্ম। বামদেবের সেই সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া, রাজকুমার ভাবিতেছেন "এই মূর্ত্তিকে ফুল চন্দনে পূজা করিলেইতো ঠিক হয়।" রাজকুমার তখন আকুলপ্রাণে ভক্তিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রাজকুমার ভক্তের পাদুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। সে পা জড়াইয়া, যুবার জীবনে যে আনন্দ, শান্তিলাভ হইল, তাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রত্বলাভে হয় না, সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণে হয় না; কোটি দরিদ্র পালনে হয় না। যুবা ভাবিতেছেন "যদি ভক্তের পা জড়াইয়া এত আনন্দ এত শান্তি, না জানি এই ভক্ত যাঁর পাদপদ্ম জড়াইয়া আছেন, তাঁর পাদপদ্ম ধারণে কতই আরাম কতই শান্তি।" এই ভাবের প্রভাবে যুবা ভক্তিমহিমা বুঝিলেন। শুষ্কজ্ঞানে মানুষের অশান্তি আর ভক্তিতে মানুষের শান্তি তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল; কিন্তু সে লক্ষ্য ধরিবেন কবে? এই সময়ে বামদেব ভক্তিরসমুদ্রে তুফান তুলিলেন:—

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
ও সে যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয়॥
ও সে কালীর ভক্ত জীবনমুক্ত নিত্যানন্দময়॥

এইরূপ প্রেমানন্দে তিনঘণ্টা অতীত হইল। এদিকে শ্মশান হইতে, গ্রাম হইতে চৌদ্দ পনেরটী কুকুর আসিয়া উপস্থিত। তাহারা বামদেবকে দেখিয়া, উপুড় হইয়া, একপেশে হইয়া, চিত হইয়া শয়ন করিল। শুইয়া গান শুনিতে লাগিল। একটী কুকুর হঠাৎ উঠিয়া, ভক্তমণ্ডলীরমধ্যে দাঁড়াইয়া, গা লম্বা করিয়া, কাণ খাড়া করিয়া "তা—রা—তা—রা" শব্দে ডাকিয়া রাজকুমারকে বিস্মিত করিল। কুকুরের মুখে স্পষ্ট "তারা" নাম। রাজকুমার বামদেবকে বলিলেন "বাবা! কুকুরের মুখে স্পষ্ট তারানাম যে!"

বামদেব বলিলেন "বাবা! এই কুকুর বাবা, বড়ই পণ্ডিতলোক ছিলেন গো! গুরুর শাঁপে কুকুরজন্ম হ'য়েছে, তা নিজের সাধনাটী ভুলেন নাই। মানুষে সাধন ভোলে; তা, বাবা আমার, কুকুর হ'য়েও সাধন ভোলেন নাই। আর ইনি বড় ভাল ব্রাহ্মণ—তারা মার প্রসাদ খান, আর কিছু খান না। তাও আবার আমি হাতেক'রে না দিলে খান না। ইনি এ সব কুকুরের সঙ্গে মেশেন না। আমার কাছটীতে থেকে আমাকে লেজের ছোট করেন। তা ওঁর পাদপদ্মের তলেই প'ড়ে আছি।" বলিতে বলিতে বামদেব প্রেমভরে সেই কুকুরকে ডাকিলেন "পণ্ডিত বাবা!"

পণ্ডিত বাবা, তখনি বামদেবের কোলে মাথা রাখিয়া উল্‌টিয়া শুইয়া পড়িলেন। বামদেব তাঁর পাদপদ্ম লইয়া আপনার বুকে মাথায় বুলাইতে থাকিলেন। তারপর কুকুরগুলি একে একে চলিয়াগেলে, বামদেব রাজকুমারকে বলিলেন "বাবা চল! এইবার শিমুলতলায় যাই! মার পাদপদ্মে গড়াগড়ি দিয়ে আসি।" বামদেব "দুর্গা," "দুর্গা" বলিয়া উঠিলেন। রসিকানন্দ ও রাজকুমারও উঠিলেন। তিনজনে শিমুলতলার জঙ্গলে গেলেন।

বামদেব রাজকুমারকে বলিলেন "এই শিমুলতলা। গাছটী আট বৎসর হইল, শুকাইয়াছে। এই গাছেরতলে বশিষ্ঠ মার সাধনা করেন। গাছটী এতকালপরে মার ইচ্ছায় মরিয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে ভক্তরাজ "দুর্গা মা দুর্গা মা" বলিতে বলিতে সেখানকার মাটীতে শুইয়া পড়িলেন। ভক্ত সেই মাটীতে দুর্গা মার কোমলকোলে শুইয়া, মহাশান্তিতে বিভোর হইলেন। রসিকানন্দ ও রাজকুমার সেইখানে "মা"কে প্রণাম করিলেন। ভক্তরাজ উঠিয়া সেইখানকার মাটী খাইয়া, পরমানন্দে আবার মাথা লুটাইয়া, প্রণাম করিতেছেন এমন সময়ে একটী কুকুরের লেজ তাঁর মাথায় ঠেকিল। তখন ভক্তরাজ ভক্তিতে গলিয়া সজলচক্ষে কুকুরের-দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবা! আমার মাথায় লেজ দিলেন, তাহ'লে তো আমি আপনার লেজের ছোট হ'লাম। তা আপনাদের জুতার শুকতলা হ'য়ে আছি—আমার মাথায় আবার পাদপদ্মটী তুলে দিন।" এই কথা বলিয়া কুকুরকে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণাম করিলেন। তারপর আর একটা কুকুর মড়া খাইয়া বামদেবের কাছে একটা পচা মড়ার হাত লইয়া উপস্থিত। রাজকুমার সেই মড়ার গন্ধে মুখ বিকৃত করিলেন। বামদেব বুঝিতে পারিয়া কুকুরটাকে স্তব করিলেন "বাবা! আপনি সিদ্ধপুরুষ! আপনার বিকার নাই। আমাদের বিকার আছে।" এই কথা বলিবামাত্র কুকুর সেই পচামড়া মুখে করিয়া সরিয়া পড়িল।

যুবরাজ ভক্তের দীনতার কথা শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন, আজ তাহা চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। বামদেব যুবরাজকে বলিলেন "বাবা! তুমি মাকে পাবে।"

যু। কবে পাব?

বা। মৃত্যুর ছয় বৎসর আগে। আকাশ-গঙ্গার কৃপায়, বনলতার তপস্যায়।

রাজকুমার বনলতার কথা শুনিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ পাগলেরমত স্থির দৃষ্টিতে বামদেবের মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিলেন। সেই চাহনি লাল হইয়া জলে ভরিয়াগেল। রাজকুমার অনেকক্ষণ অবনতমুখে, গম্ভীরদুঃখে ভাবিতে ভাবিতে, কাতরভাবে চাহিয়া বামদেবকে বনলতার কথা জিজ্ঞাসিবেন কি না ভাবিতেছেন—এই পুণ্যাশ্রমে সেই সব পাপ কথার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য কি না ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বামদেব গম্ভীরভাবে বলিলেন "বনলতা ভাল আছে।"

রাজকুমারের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। শুষ্ক আশালতা হঠাৎ মুঞ্জরিত হইল। তথন প্রণয়আশাভয়মিশ্রিতস্বরে রাজকুমার আপনার জীবনের সকল কথা ভুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন "গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসিতে সাহস হইতেছে না।" বলিয়াই রাজকুমার আন্তরিক যাতনায় কাতর হইয়া অশ্রুমোচন করিলেন। রসিকানন্দ প্রভৃতি বিস্মিতনয়নে রাজকুমারের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন। বামদেব তখন কোমলভাবে বলিলেন "বনলতা দেবী, তাঁর তপস্যা-বলেই তোমার বাবা! শান্তিলাভের উপায় হবে। বনলতাকে জীবনে একদিন দুই ঘণ্টার জন্য পাইবে। আর অধিক বলিব না।"

যুবরাজ ও রসিকানন্দ বামদেবকে প্রণাম করিয়া রামপুরহাট যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



জ্ঞানে শান্তির মৃগতৃষ্ণিকা।

রাজকুমার বামদেবকে দেখিয়া এক নূতন জগতের আভাস পাইলেন। মানুষের জীবনে, যখন ভগবদ্বিশ্বাস আসে, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এই জীবনের প্রকাণ্ড অন্ধকার আলোকিত করা অসম্ভব হইলেও সম্ভব বোধ হইতেছে। এই জগতের সর্ব্বস্থলই অন্ধকার পূর্ণ। যদি আকাশে আলো না থাকিত, তো, কি বিরাট অন্ধকারেই জগৎ লুক্কায়িত থাকিত। তাহা হইলে এক অনন্ত অন্ধকারের রাত্রি ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না। কিন্তু আকাশের সামান্য আলোকে যে অন্ধকার ঘুচে, তাহা এই অসীম রহস্যান্ধকারমধ্যে খদ্যোতের আলোকবৎ বোধ হয়। খদ্যোতের আলোকে সামান্যতম অন্ধকার দূর হয়, প্রদীপের আলোকে কিছু অধিক, নক্ষত্রালোকে আরো অধিক, সূর্য্যালোকে আরো অধিক। কিন্তু সূর্য্যালোকে জগতের সকল স্থল আলোকিত হয় না। সূর্য্যালোক যে অন্ধকার দূর করিতে পারে না, মানুষের বুদ্ধিজ্যোতিঃ সে অন্ধকার দূর করে। কিন্তু বুদ্ধিজ্যোতিঃ কত টুকু আলো দূর করে? যে অন্ধকারে আমি নিমগ্ন সে অন্ধকার বুদ্ধিজ্যোতিঃ দূর করিতে পারিল কই? অসীম সমুদ্র কুলে বুদ্ধির

আলো জ্বালিয়া জগতের জ্ঞানীগণ কেবলই পাথরের নুড়ি কুড়াই-তেছেন—রত্নাকরে ডুবিয়া রত্ন তুলিতে যে আলোর আবশ্যক, তাহা স্বতন্ত্র বলিয়া বোধহয়। বুদ্ধির আলোকে সে রত্ন উদ্ধার হয় না বলিয়াই দার্শনিকে দার্শনিকে মতভেদ, বৈজ্ঞানিকে বৈজ্ঞা-নিকে মতভেদ। বুদ্ধির আলোকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে গিয়াই পৃথিবী মানবরক্তে অপবিত্র হইয়াছে। এই "আমি"র উপরে যে এত বড় জগতের অভিনয়, সেই "আমি" যদি চির আঁধারে থাকিল, তো. বাঁচিবার দরকার কি? সবই যদি পঞ্চভূতের লীলাখেলা, তবে হৃদয়ে এত আশার ঝড় পৃথিবীকে তোল পাড় করে কেন? প্রণয়ের আবেগে মানুষ বসুন্ধরাকে ধরিয়া লুফিতে চাহে কেন? এই ক্ষুদ্র পরমাণুতে বিশ্ববিজয়িনী শক্তির আভাস পাই কেন? স্বাভাবিকতায় আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি লাভ হয়। তবে, মরিবার পর থাকিব না, ভাবিলে অস্তিত্ব অসীম যাতনায় কম্পিত হয় কেন? মরিবার পর মানুষ আদতে থাকিবে না, ইহা যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য হইত, তো, সে চিন্তায় মানুষের সুখ শান্তির উদ্রেক হইত।

যাহা হউক, বামদেব স্বামীকে যেপ্রকার দেখিলাম, তাহাতে মনে হয় যেন ওঁর মন কোন শান্তির আকাশে বিশ্রাম করিতেছে। নহিলে ওঁর কথার সুরে অত শান্তি পেলামকেন? উহাঁর আকৃতিটী যেন শান্তি ঘন হইয়া গঠিত। উহাঁর দৃষ্টি যেন মহাশান্তির দৃষ্টি। যেমন বরফস্পর্শে উত্তপ্ত দেহ শান্ত হয়, উহাঁর আকৃতি দেখিলে, কথা শুনিলে উত্তপ্ত প্রাণ কিয়ৎ ক্ষণের জন্য শান্ত হয়। যেন অমৃতের ধারা রক্তে মাংসে মনে প্রাণে মিশিয়া এই জড়জগৎ হইতে আমাকে এক আনন্দ শান্তির জগতে লইয়া গেল। বামদেবের কাছে বসিয়া মনে হইল যেন আকাশ শান্তিতে মগ্ন—গাছ লতা

পাতা জল স্থল সবই যেন মহাশান্তিতে মগ্ন। আর এই অসীম শান্তির পর্ব্বতের বুকে বসিয়া বামদেব কি এক আলোকে আপনার ভিতরের অন্ধকার দূর করিয়া, আপনার আনন্দে যেন জগৎকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! যে কুকুরকে এত ঘৃণা করি, তাই যেন ওঁর ঈশ্বর! ধন্য বামদেব! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শান্তির এক কণা পাই। আমার বোধ হয়, যে আলোকে সৃষ্টির ভিতর বাহির ইহকাল পরকাল ভূত ভবিষ্যৎ এক সময়ে চির কালের জন্য আলোকিত হয়, বামদেব সেই আলোক পাইয়াছেন। নহিলে উঁহার অমন গাঢ় গম্ভীর অম্লান শান্তি কিপ্রকারে হইল! বাসনার মূল কি প্রকারে উৎপাটিত হইল! যে আলোর কাছে চন্দ্র সূর্য্যের আলো খদ্যোতের আলোর মত বোধহয়, সেই আলো না পাইলে, সেই আলোকে সমস্ত সৃষ্টির ভিতর বাহির আলোকিত না দেখিলে, মানুষের শান্তি কি সম্ভব? মানুষের বিরাট অভাব পূরণ কি সম্ভব? রাজকুমার এই প্রকার কত কি ভাবিতে ভাবিতে আবাসে ফিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

বিপদে বিপদ।

বামদেবের সহিত আলাপের পর, রাজকুমারের চিন্তা শীলতার বৃদ্ধি হইল। সে চিন্তা তাঁহাকে দুটী জগতে আকর্ষণ করে। একটী জগতে তাঁর পিতা মাতা ভগিনী স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয় বর্গ অর্থাৎ ঐহিকতা এবং অন্য জগতে তাঁর জীবনের মুক্তি, শান্তি, মহাসিদ্ধি অর্থাৎ ঐহিকতার নিবৃত্তি। একটী জগতে তাঁর অহং-কারের পরিপুষ্টি এবং অন্য জগতে তাঁর অহংকারের বিনাশ। একে অধীনতা অপরে স্বাধীনতা। একে ভোগ, অপরে বিরাগ। তাঁর এখন কর্ত্তব্য কোথায়? পিতা মাতা প্রভৃতি কয়দিনের জন্য? কিন্তু তাঁদের প্রতি তো কর্ত্তব্য আছে? পিতা মাতা তাঁর উৎপত্তির কারণ। যেমন মেঘ বৃষ্টির কারণ, ব্রহ্ম জগতের কারণ। দেহ মনের পুষ্টির কারণ যাঁহারা, তাঁদের প্রতি কি কর্ত্তব্য নাই? তবে এ সংসারে কর্ত্তব্য কোথা? কিন্তু বামদেব তো পিতামাতা ছাড়িয়াছেন। ছাড়িয়া শান্তির কোল পাইয়াছেন। তবে কি প্রত্যেকের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র? ইহাইবা কি প্রকারে সম্ভব? এই সব প্রশ্ন তাঁর জীবনকে অস্থির করিতে লাগিল। দিনের সূর্য্য রাত্রির অন্ধকারে ডুবিতেছে, আবার অন্ধকার ভেদিয়া আকাশে

আলো দিতেছে। তাঁর জীবনের আনন্দ সূর্য্য তাঁর বিষাদ রাত্রে ডুবিয়া গেল; আর উঠিতেছে কই? মুখে চখে আর সে আনন্দ জ্যোতি নাই, তাহাতে এখন বিষাদকালিমা। কপালে চিন্তা ক্রমশঃ গাঢ় হইতেছে। জীবনের অতীত দেশ স্মৃতির আলোকে আলোকিত। সেখানে পাপের শত শত চিতা সাজান; চিতায় পাপের মৃতদেহ পচিয়া উঠিতেছে। তার দুর্গন্ধে অস্তিত্ব সিহরিয়া উঠে। যেখানে পুণ্য পবিত্রতা সেখানে অন্ধকার। যুবা কেবল পাপ—পাপ—পাপই দেখিতেছেন। যেন সেই সব পাপ পচিয়া ফুলিয়া তাঁর ভবিষ্যৎ নরক রচনা করিতেছে। সেই পচা গন্ধ মৃত্যুনদী পার হইয়া, স্বর্গের দেবতাদিগকে অস্থির করিতেছে। এইরূপ চিন্তাস্রোত মস্তিষ্কে ধরিয়া, যুবা সন্ধ্যারপর মাঠে শ্মশানের ধারে, এক বট বৃক্ষতলে বসিয়া নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত উপায় চিন্তা করিতেছেন। অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠের মত বামদেবের মূর্ত্তি তাঁর অনুতাপানলকে প্রজ্বলিত করিতেছে। সে আগুণে হৃদয় প্রাণ পুড়িতেছে। যত পোড়ে ততই শান্তি। রাজকুমার ভাবিতেছেন, এই জ্বলনে সব পাপ পুড়িয়া ছাই হইলে, বোধহয়, জীবন পবিত্র হইয়া শান্তি লাভ করিবে। নতুবা, এই অনুতাপাগ্নিতে হৃদয় প্রাণ স্মৃতিস্পর্শে যত ধুধু করিয়া পোড়ে, ততই আরাম বোধ হয় কেন? যুবা অনেকক্ষণ সেই বটবৃক্ষতলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি, ঘন হইয়া আসিল। আঁধারে আকাশে নক্ষত্র সকল মিট্ মিট্ করিতেছে। মাঠে ঝিল্লিশব্দে পৃথিবী শব্দময়ী হইতেছে। দূরে গ্রামস্থ গৃহে প্রদীপের আলো আকাশের নক্ষত্রবৎ জ্বলিতেছে। তখন পৃথিবী নিদ্রারঘোরে আচ্ছন্ন। যুবা মানসনেত্রে দেখিতেছেন, মানবমনের ঝটিকা থামিয়াছে; দিনের তুফান নিরস্ত হইয়াছে;

সেই রাত্রির অন্ধকারেরমত মানবমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন; সেই অন্ধকারে যাতনা দগ্ধ মনের মূর্ত্তি কি ভয়ানক! সে যাতনার আদি মধ্য অন্ত কে বলিতে পারে? যে রমণী মুখের শোভায় চাঁদকে লজ্জা দেয়, চাঁদের কলঙ্ক অপেক্ষা তার দুঃখ কলঙ্ক অধিক। যে নবজাত শিশুর কান্তি দেখিয়া বনের ফুল মলিন হয়, সেই শিশুজীবনে দুঃখের সাগর লুকান দেখিলে ভয়ে প্রাণ সিহরিয়া উঠে। যে সতীর সাহস দেখিয়া আকাশে গ্রহ সকল ভীত হয়, সেই সতীর সমস্ত জীবনের দুঃখ এই রাত্রির মোহে সুসুপ্ত হইয়া, অজাগরের মত পড়িয়া আছে; নিদ্রাশেষে—তাহা ভীষণ ফণা তুলিয়া আবার সতী কে দংশন করিতে উদ্যত হইবে। তাঁর নিজের জীবনই বা কি? সেই প্রকাণ্ড দুঃখ মহাসাগরের একটী তরঙ্গমাত্র। তাঁর দেহ একটা জীবন্ত মৃতশরীর। মন একটা অদৃশ্য পিশাচ। যেমন পিশাচ গৃহবিশেষে নানাবিধ উৎপাত করে, লোকে দেখিতে পায় না; সেই রূপ এই দুরন্ত মন পিশাচের মত অদৃশ্য ভাবে কত দৌরাত্মই করিতেছে। এই পিশাচেরই পৈশাচিকতায় দেশে রক্তের নদী, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, নগরে মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় পাপের অভিনয় হয়। সংসার এই ভূতের আবেশে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছে। এই দুরন্ত পিশাচ আমার আমিত্বের দেবতা। আমার অহংকারের যথাসর্ব্বস্ব আমি পিশাচগ্রস্থ রাজপুত্র। আমার ঘাড়ের পিশাচ কে ছাড়াইবে? এভূত ছাড়াবার মন্ত্র কে জানে? এত কাব্য, এত দর্শন, এত শাস্ত্র পড়িয়াত এভূত ছাড়াবার মন্ত্র পেলাম না। বোধ হয় বামদেব এমন্ত্র জানেন। জানিয়া নিজের ও অপরের ভূত ছাড়াইয়াছেন, গুরুমন্ত্র নাকি সেই ভূত ছাড়াবার মন্ত্র। এত লোক তো গুরু মন্ত্র লয়, কিন্তু ভূত ছাড়ে

কই? আসল মন্ত্র সকলে বোধ হয় পায় না। বামদেব আসল মন্ত্রে মনের ভূত ছাড়াইয়াছেন।

রাজপুত্র এইরূপে কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মাঠের মধ্যে, শ্মশানের দিক হইতে, ঝিল্লীরবের সহিত এক গীত কাণে বাজিল। রাজকুমার আপনার চিন্তা বশত, তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু গীতের স্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যেন শত ভ্রমরের ঝঙ্কার। সেই ঝঙ্কারে যেন কে, মৃত আত্মীয়ের জন্য পাষাণ গলাইয়া, কাঁদিতেছেন :—

তার মুখ হয়েছে শিমুল চারা,
পা হয়েছে নোনা।
তথায় যেওনারে সোণা!
তার বুক হয়েছে উই এর ঢিপি
হাত হয়েছে ব্যাণা।
তথায় যেওনারে সোণা!
তার বাক হয়েছে কোকিলের রা
গুণে চাঁদের কোণা।
তথায় যেওনারে সোণা!

কে অপ্সরাকণ্ঠে ঝিল্লিরবের মিষ্টতায় অমৃতছড়াইয়া ব্যাকুল শোকে কাঁদিতেছে? রাজকুমারের কৌতুহল হইল। তিনি সেই গানের দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমাকাশে মেঘঅন্তরে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া, পৃথিবীকে মুহূর্ত্তমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী করিতেছে; সেই ক্ষণিক আলোকে শ্মশানের কলসী, কয়লা, আধপোড়া কাঠ, দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গীত শ্রুতিগোচর হইল; স্বর্গের অমৃত অনুভূত হইল; কিন্তু স্বর্গ দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজকুমার নীরবে সেইখানে

দাঁড়াইয়া থাকিলেন। গীত বন্ধ হইল। একটা বিকট হাস্যের রোল উঠিল হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ। এইরূপ হাসির সহিত প্রলাপ বাক্য সকল কত প্রকারে বাহির হইল। রাজকুমার তখন বুঝিলেন এসব শব্দ বৃক্ষের উপর হইতে আসিতেছে! তিনি শব্দের দিকে অগ্রসর হইলেন। আবার গীত হইতেছে ঃ—

আমি প্রেম পেয়ে প্রেম পাগল হয়েছি
আমি আর কি বাকি রেখেছি।
আমি প্রেমের গোরে প্রেমের শবে পুঁতে রেখেছি॥

লোকে বলে মরে গেছে
এই যে প্রেম বেঁচে রয়েছে।
তারে জলে স্থলে ছড়িয়ে দিয়ে শোভা করেছি॥

সে গীত ক্রমশঃ ক্রন্দনে ডুবিল "তা মরেছে মরেছে! তাতে হয়েছে কি? মরে যে মেরেগেছে সেরেগেছে! ভা'সয়েগেছে, পথের কাঙাল করেগেছে! আমার ভাতার—ভাতার! আমার সোয়ামী—সোয়ামী ঠিক্ এই থানটায় পুড়েছেল! আহা! আমি মুখপুড়ি, ভাতারখাকী, আহা! আহা! তেমন কচি দেহে আগুণ ধরয়েদিনু! আহা! পোড়ারমুখী! ভাতারখাকী! মরে বলে ভুত হয়; ও সব বাবা মিছেকথা! আমার ভাতার যেখানে মরে পুড়েছেল, সেখানে একটা বড় আকন্দ গাছ হয়েছে, একটা বাবলা চারা হয়েছে! খান কতক কয়লা এখনও আছে, আমি সেই কয়লার কালীমেখে, খোঁপায় ভাল ভাল আকন্দ ফুল দিয়ে, গাছ দুটোকে জড়য়ে শুয়ে থাকবো! ও আকন্দ গাছ! শুনছিস! তোর মাগের কথা শুনছিস! শোন শোন!

তার মুখ হয়েছে সিমুলচারা পা হয়েছে নোনা
তথায় যেগুনারে সোণা !

যাবনা ? খুব যাব ! হোঃ হোঃ হোঃ ! মরা প্রাণনাথের কাছে গিয়ে কি হবে বাবা ! বাবলা কাঁটায় ছড়ে মরবো ! জেন্ত প্রাণনাথ য আমায় জেন্ত পোড়াচ্ছে ! পোড়ার মুখোই তো আমায় মজয়ে-ছল ! আমার যখন চৌদ্দবৎসর বয়স ! আমি যখন চৌদ্দবছুরী করী – মদনের রতি। তখন তুমি আমার দিকে কত যে চাইতে গা ! তাকি মনে আছে ? সেই চাহনিতে যে আমার চৌদ্দবৎসরের লাতল ভেদ করে ফেলেছিলে বাবা ! মনে আছে ? বলি ও চাঁদ নে আছে ! সামনে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে হাসি হচ্ছে ! হাস ! হাস ! খুব াস ! চল তোমায় লয়ে আকন্দ তলায় ফুলশর্য্যা করি—হাঃ াঃ হাঃ—বলিয়াই ঝুপ করিয়া কে গাছ হইতে পড়িল। ভূমে ড়িয়া, বিকট হাস্যে, অন্ধকারকে ভীষণতর করিয়া নাচিতে াগিল।

অন্যকেহ হইলে; এইব্যাপারের প্রথম অভিনয়ে, পিশাচ ভাবিয়া, য়ে সেইখানে মুর্চ্ছিত হইত; কিন্তু রাজকুমার অসীম সাহসের ন্য, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উৎসাহের সহিত সব শুনিতে লাগিলেন। াকাশে বিদ্যুৎ কয়েকবার উপরি উপরি চক্ মক্ করিল। সেই ালোকে রাজকুমার দেখিলেন। একটী স্ত্রী লোক; গলায় ফুলের ালা; মাথায় ফুলের মালা, পরিধান চওড়াপেড়ে শাটী। রাজ-মার চিনিলেন। পলাইবার উদ্যোগ করিলেন। আস্তে আস্তে ন্ধকারের সাহার্য্যে স্থানান্তর হইতেছেন। আবার উপরি উপরি দ্যুৎ চক্ মক্ করিলে সেই রমণী রাজকুমারকে দেখিল—চিনিল জিল। আনন্দে অধীরা হইয়া সম্বোধন করিল "এস! এস!

প্রাণনাথ এস!" যুবার মাথায় বাজপড়িলে এত ভীত হইতেন না। এই সম্বোধনে ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

রমণী এমন সুবিধায় রাজকুমারকে কখনও পায় নাই। অতিশয় আশায় উন্মাদিনী হইয়া অন্ধকারে দেহ দুলাইতে দুলাইতে, নাচিতে নাচিতে যুবারদিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুৎ চক্ মক্ করিল। যুবা দেখিলেন যুবতী তাঁর দেহের অতি নিকট! যুবা দ্রুতবেগে মাঠের অন্যদিকে চলিলেন। যুবতী ছুটিয়া গিয়া সে পথ রোধ করিল। "এইবার প্রেমের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলেছি বাবা! আর পালাবে কোথা? এখন এই অন্ধকারে আমার যৌবন দখল কর।—" যুবতী কামোন্মত্তা হইয়া এই কথা বলিল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন অপেক্ষা রমণীর এই গর্জ্জন যুবার কাছে ভীষণতর বোধ হইল। যুবা তখন একটু চালাকি করিয়া বলিলেন "কে ও আহ্লাদ!" "হাঁ গো পেহ্লাদ! এখন আমাকে আলিঙ্গন কর—বলিতে বলিতে যুবাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে যুবা পিছু হাঁটিলেন।

সেই অন্ধকারে, যুবতীর উন্মাদগ্রস্থ মনে, কামরিপুর উত্তেজনায়, পূর্ব্বের আক্ষেপ, অভিমান, অপমান, আশা, ভরসা, জাগ্রত হইয়া উন্মাদিনী মূর্ত্তিকে যেপ্রকার ভীমা করিয়াছিল, রাজকুমার তাহা দেখিতে পাইলে; প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেন। প্রেতিনীর মূর্ত্তি সে মাঠের অন্ধকারে তত ভয়ঙ্করা হয় না। রাজকুমার মূর্ত্তি না দেখুন, মূর্ত্তির স্বরে অনেকটা বুঝিলেন—তাঁর আজ বড়ই বিপদ। হাতে একগাছি ছড়ি মাত্র সম্বল। কিন্তু স্ত্রীলোকের গায়ে তিনি কখনও আঘাত করেন নাই। উন্মাদিনী বলিল "আমি এই তোমার সঙ্গে গাছের উপরে ছিলাম, তুমি খপ্‌করে কখন নেমে এলে বাবা!" রাজকুমার ভাবিলেন, উন্মাদ অবস্থায় মানুষ কাল্পনিক

মূর্ত্তিকে প্রকৃত মনে করে, ইহার তাহাই হইয়াছে। সেই কথার উত্তরে উন্মাদিনীকে ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশে বলিলেন "আহ্লাদ! আমি তো তোমায় ছেড়ে কখনও থাকি না।" উন্মাদের স্মৃতিভ্রম মূহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সম্ভব, কুমার তাহা না বুঝিয়া ও প্রকার উত্তর দেওয়ায়, উন্মাদিনী রাগে জ্বলিয়া বলিল "মিছে কথা—ব্যাঙের মাথা! ব্যাঙ্ চরচড়ি তোমায় খাওয়াব! আমি তোর জন্য, কুলের যুবতী, চৌদ্দবছুরি, কড়েরাড়ি, শাড়ি, বাড়ি, মাঠে মাঠে গাছে গাছে বেড়াই তবে কেনরে? তোর কি ধর্ম্ম আছে তুই বেহায়া ভোমরা, আমার ফুলের মধু ছেড়ে বনলতার মধুতে ডুবদিলি, কেন বল দেখি? এখন, বনলতা কোথা পালাল?

কুমারের বুক ভয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। চুপ করিয়া কি একটা অতীতের কথা ভাবিয়া যাতনায় অস্থির হইতেছেন। উন্মাদিনী আবার বলিল "চুপ কেন? আমাকে কুলটা করেছে কে? তোর ওই চক্ষুর ধারে আমার যৌবনের পাঁজরা কাটিয়াছিস, তুই আমাকে কুপথে আনিয়াছিস। মনে পড়ে হে মদনমোহন! তুই তোর বইটকখানার ঘরে আমার যৌবনের মুখে চুম্‌খেয়েছিলি,—মনে পড়ে হে মদনমোহন! সেই চুমোতেই আমার সর্ব্বনাশ! মনে পড়ে হে মদনমোহন।" এক একটা কথায় শত বজ্র অনুভব করিতে করিতে যুবা সেই অন্ধকারে যেন বিলীন হইয়া থাকিলেন। আত্মগ্লানির গরল গীরি হইতে ইতিপূর্ব্বেই গরলোদগম অল্প অল্প হইতেছিল। এখন উন্মাদিনীর মুখ হইতে এই সব প্রকৃত কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার জীবনে সে উদ্গম ভীষণ হইল। যেন সমস্ত অস্তিত্ব কম্পিত হইল। বুকের ভিতরে যেন শাঁড়াশি দিয়া কে বুকের হাড় মাংস টানিতে লাগিল। এক একটা দীর্ঘ

নিঃশ্বাসে যেন পাঁজরার হাড় ভাঙিতে থাকিল। তখন উন্মাদিনীকে ভুলিয়া কুমার মাঠের উপরে বসিয়া আপনার ভিতরে একটা অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। নিজকৃত এক একটা পাপ যেন ভীষণ সংহারক মূর্ত্তিতে তাঁর রক্ত মাংসের ভিতরে লুকাইয়া আছে। যুবা বাহিরে অন্ধকারের মত স্থির গম্ভীর, ভিতরে যাতনায় অস্থির।

যুবতী বিদ্যুতালোকে যুবাকে সেই নির্জ্জন মাঠে অন্ধকারে আপনার কাছে দেখিয়া কামোন্মত্তা হইল। যুবাকে মোহিনী ভাষায় বলিল "আর ভাবনা কি প্রাণ। এখন আমায় সমস্ত রাত্রি ভোগ দখল কর।" যুবা তখন নরকে বসিয়া, জড়পিণ্ডের মত, একবারে সেই অন্ধকারে আপনার কাছে ফুলের গন্ধ, স্ত্রীলোকের মাথার চুলের গন্ধ, ঘন ঘন নিঃশ্বাস অনুভবে বড়ই ভীত হইলেন। তিনি তখন বল-বুদ্ধি-সাহস হারাইয়া ছুটিতে লাগিলেন। উন্মাদিনীও পিছু পিছু ছুটিল। যুবা জীবনে এত ছুটেন নাই। আজ প্রাণ ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। যুবতী অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল। যুবতী তখন নিরুপায় দেখিয়া বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল।

যুবরাজ আবাসে ফিরিলেন। আহার করিলেন না। আহারার্থ দাস দাসীদের অনুনয় বিনয়ের প্রত্যেক শব্দ তাঁর মনে আগুন জ্বালিল। তাঁর উপাদেয় আহার সামগ্রী দাস দাসীরা মহানন্দে ভাগ করিয়া খাইল।

কুমার দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিলেন। শয্যার প্রত্যেক সূত্র যেন বিষধরের দংশন। ঘরের টানাপাখার বাতাস সেই বিষে আগুন! শ্রবণে আগুন! আলোকে আগুন! অন্ধকারে আগুন!

বিছানা ভাল লাগিল না, উঠিয়া বারান্দায় গেলেন, ফুর ফুর বাতাস বহিতেছে, তাহাতে আগুণ! ফুলের গন্ধ আসিতেছে তাহাতে আগুণ! আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র জলিতেছে সবই আগুণে পোড়াবার জন্য জলিতেছে! চরাচরের আগুণে তাঁর ভিতরের আগুণ বাড়িতেছে। শরীর যাতনায় কাঁপিয়া উঠিতেছে! চক্ষু মুদিয়া আগুণে ডুবিয়া ভাবিতেছেন "এজীবন কেন? কারজন্য? কে চাহিয়াছিল? জীবকে পুড়াইবার জন্যই কি তুমি আকাশে এত আগুণ জ্বালিয়াছ?—অথবা ঐ আগুণ যেদিন নিবিবে সেই দিন বিশ্বের চিরশান্তি হবে! তোমার সৃষ্টিতে বিপরীত বস্তুরই যোগা-যোগ দেখি। তাই আশা হয়, যে, আগুণ নিবিলে, জীবনাধার শীতল হইলে, সব শীতল বোধ হইবে। ওহে! আমি এই আশাতেই আত্মহত্যা করি নাই, নহিলে মরণের নদী কি প্রকার অন্ধকারে কি প্রকার স্রোত লইয়া ইহকালকে পরকাল হইতে পৃথক করিতেছে, তাহা দেখিতাম। যে নদীর স্রোতে একবার পা দিলে বিশ্ববিজয়ী বীরও ফিরিতে পারেন না, সেই স্রোতে ভাসিয়া, ইহ-জীবনের ভীষণ বাত্যা অপেক্ষা পরলোকের ভীষণতর বাত্যায় উড়িতাম। সেই স্রোতে ভাসিয়া, যেদেশে যাইলে আর ফিরিতে হয়না, সেই দেশেরদিক শূন্য অসীমতায় আপনাকে হারাইতাম। যদি কেবল যাতনাই তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইত, তো, যেখানে যাতনা ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেইস্থানেই যাইতাম। কারণ সুখ দুঃখময় জগতে, সুখের আস্বাদনে দুঃখের যে যাতনা, তাহা আর সেখানে ভুগিতে হয় না। বিষের কীট বিষেই প্রকৃতিস্থ; অগ্নিকীট অগ্নিতেই প্রকৃতিস্থ। আমরা সেই যাতনাময় জগতে যাতনার কীট হইয়া যাতনাতেই প্রকৃতিস্থ হইতাম। আকাশে ঐ চাঁদ উঠিতেছে।

আমি চাঁদকে কতই ভালবাসি। কতরাত্রি নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া, উহার সৌন্দর্য্যে জীবন পূর্ণ করিয়াছি। অমন শীতল সুষমা আমায় আগুণে পোড়ায় কেন? উঃ—বুঝিয়াছি—উহার বিমল জ্যোতিকে যৌবনবিকারে কতবার বিকৃত করিয়াছি—উঃ কত সুন্দরীর সতীত্ব! বুক ফাটিয়াগেল! মাথা জ্বলিয়াগেল!—বাপ!” কুমার যাতনায় ভূতলে শয়ন করিলেন।

রাজকুমার শয়ন করিয়া যাতনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন দ্বারবান সঙ্গে আলোক সহিত সতীশচন্দ্র আসিয়া ডাকিলেন “দাদা। শীঘ্র উঠুন—আমার বড় অসুখ।” কুমার তাড়াতাড়ি উন্মাদের মত পিতাকে দেখিতে চলিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

শোক ও বৈরাগ্য।

পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের পর জ্ঞানদানন্দনের মনে ঝড় উঠিল। তিনি সেই বকুলের তলে, রাত্রিশেষে, বসিয়া ঝড়ের বেগ সহিতে থাকিলেন। পৃথিবীর ঝড়ে পাহাড়, নদী, সমুদ্র অস্থির হয়, আর মনের ঝড়ে মানুষের প্রাণ যায় যায় হয়। এই ভিতরের ঝড়ের কাছে বাহিরের ঝড় অতি সামান্য। জ্ঞানদা সেই ভিতরের ঝড়ে যায় যায় হইলেন।

প্রথমতঃ এই ভাব সমস্ত অস্তিত্বাকাশে মেঘের মত ব্যাপিয়া ফেলিল। "পিতামাতারই যখন অভাব হইল, তখন আর এ মায়ার সংসারে—মায়ার ঐশ্বর্য্যে থাকিব কেন? স্নেহের প্রস্রবণ যখন শুকাইয়া গেল, তখন আর এপর্ব্বতে থাকিয়া পিপাসায় জ্বলিয়া মরি কেন? অমন বনলতা যে সমাজে স্থান পাইল না,—আশ্রয় পাইয়াও পাইল না,—সে সমাজে থাকিব কেন? পিতামাতা আপনাদের রক্তমাংসময় এই আমার মূর্ত্তিকে শান্ত করিয়া, আপনারা শান্ত হইতেন; আর বনলতা পরের জন্য মরিতে পারিলে আপনাকে শান্ত বোধ করিতেন। তিন জনেই যখন আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আমি এ নশ্বর ঐশ্বর্য্য, কপট অত্যাচারী সমাজ না

ছাড়িব কেন? স্নেহ, প্রণয়, ভালবাসা লইয়াই সংসার;—যখন তাহার কিছুই থাকিল না তখন আমি থাকিব কেন? প্রেমদা! স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, রূপময়ী, সতীত্বময়ী প্রেমদা? প্রেমদার গুণের শেষ নাই। আমি সে দিন রাত্রে, একটীবার বলিয়াছিলাম, "আমার পা কামড়াচ্ছে,"—প্রেমদার তখন জ্বর, জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আমার পা টিপিতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, রাত্রি শেষ হইল, আমি নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখি, প্রেমদা ঢুলিতে ঢুলিতে পা টিপিতেছে। আমি চমকিত হইয়া বলিলাম "ঘুমাও নাই?" প্রেমদা হাসিতে হাসিতে বলিল "তাতে আর কি?" কথার সুরে বোধ হইল, আমার পদসেবার জন্য প্রেমদা আহার নিদ্রা সব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমদার মুখ চুম্বন করিলাম। সেই চুম্বনের তৃপ্তিতেই প্রেমদার নিদ্রার শত গুণ তৃপ্তি হইল। মুখ চুম্বনের পর আমার বুকে প্রেমদার মাথা ধরিয়া, কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলাম "প্রেমদা! ঘুমাও নাই কেন?"

প্রেমদা নীরবে মুচকিয়া হাসিতে লাগিল, আমার তখন সেই হাসির উপর হিংসা হইল, প্রেমদার সেই ভাবের উপর স্বামী সেবার উপর হিংসা হইল। চক্ষু মুদিয়া প্রেমদার অঙ্গস্পর্শ হইতে দূরে বসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে ভাবিলাম "হায়! হায়! এই হাসি যদি এই বিছানায় বনলতার মুখে দেখিতাম! এইরূপ পদ-সেবা যদি প্রেমদা না করিয়া বনলতা করিত। উঃ আমি এমনি পাষণ্ড যে এমন প্রেমদাকে ভাল বাসিতে পারিলাম না। ভাল-বাসা কি জোর করিয়া হয়? এমন অতুল ঐশ্বর্য্যের বুকে শুইয়া প্রেমদার মত স্ত্রীকে কয়জন বুকে ধরিতে পারে? এমন ভাগ্যবান

আর কে আছে? প্রণয়ে বুঝিবা বিধাতার হিংসা আছে? তিনি সমস্ত ভালবাসাকে এক চেটে করিতে চান বুঝি? নহিলে মানুষে মানুষে যেখানে প্রণয় সেখানে এত বাধা বিপত্তি কেন? প্রেমদার বয়স পনের বৎসর মাত্র। এই বয়সে যার এত ভালবাসা, সে মানবী নহে সাক্ষাৎ দেবী। এমন দেবীকে বুকে ধরিয়া, সংসারের সকল প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণা হাসিতে হাসিতে সহ্য করা যায়;—কিন্তু সে প্রকৃতি আমার নাই। কারণ আমি অনেক অনুসন্ধানে দেখিয়াছি, প্রেমদার যেমন আমাতে আসক্তি ভক্তি, আমার প্রেমদাতে তেমন কিছুই নাই। প্রেমদা একখানি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—দেখিতে অতি সুন্দর—ভাবিতে আরো সুন্দর। জ্যোতি ঘনমূর্ত্তি বটে—কিন্তু সে জ্যোতিতে প্রাণপোষক উত্তাপ বা শৈত্য পাই না কেন? আমার প্রকৃতিতে এমন পদার্থ নাই, যাহা ঐ মূর্ত্তি হইতে, সুখশান্তিলাভে কৃতার্থ হইতে পারে। আর বনলতা?—সেও জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি;—ইহাতে প্রাণপোষক উত্তাপও আছে শৈত্যও আছে। সে মূর্ত্তি দেখিবামাত্র—ভাবিবামাত্র—আমার নিস্তেজ জীবন সতেজ হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দে তৃপ্তিতে যেন উপচাইয়া উঠে, যেন শত মৃত্যু হইতে শত জীবন লাভ করি। এমন মূর্ত্তি হারা হইয়া, প্রেমদার উত্তাপ শৈত্য হীন সুন্দর ছবি খানি লইয়াই বা কি করিব? বনলতার অমন মূর্ত্তি অনন্ত সংসার সাগরে কোথায় ভাসিল—তাহা না দেখিয়া স্থির থাকিব কি প্রকারে? ঝড়ে জলে বজ্রে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায় না, ঝড় জল থামিলে আবার দেখা যায়, হারাণ মানিক আবার পাওয়া যায়। সংসারের ঝড়জলে আমার সে পূর্ণচন্দ্রমা কোথায় গেল আমি কি তাহা পাবনা? জানি পিতামাতাকে জীবনে আর পাবনা;—গঙ্গার কোলে তাঁহাদিগকে

ভস্ম করিয়াছি। যদি বনলতার স্বর্ণ অঙ্গকে ভস্ম করিতে পারিতাম, তো, সে ভস্ম গায়ে মাখিয়া—প্রাণে মাখিয়া—প্রাণের জ্বালা কথঞ্চিৎ শীতল করিতে পারিতাম। সেই চিতার উপরে স্বর্ণমন্দিরে স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিয়া, সেই মূর্ত্তির পূজা ধ্যানে মহাদেব হইতাম। সেইস্থানে অটল আসনে, অটল দৃষ্টিতে প্রকৃতির শোভায় সেই দেহের শোভা মিশিয়াছে ভাবিয়া, অশ্রুজলে জীবন গলাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহাও তো কপালে ঘটিল না। বনলতা কোথা—তার সন্ধান তো পাইলাম না—কেহ তো বলিল না। বামদেব কেবল বলিলেন "একদিন পাব"। এই কথায় আমার মৃত আশা জীবিত হইল। এখন ঐ কথায় এমনি বিশ্বাস হইয়াছে যে, জীবনের শেষে, এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিবার তরে, সহস্র বৎসরের জীবন অনাহারে অনিদ্রায় পৃথিবী রেণু রেণু করিয়া বনলতার অন্বেষণে অতীত করিতে পারি। সে দুর্লভ রত্ন সংসার সাগরের কোথায় তলাইয়া গেল, একবার প্রাণ থাকিতে ডুবিয়া দেখিব। যদি একান্ত না পাই,—না পাইয়া বাঁচিতে হয়, তো বামদেব যাহা পাইয়া শান্তি সাগরে স্থির হইয়াছেন, সেই শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিব"।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানদানন্দন রাত্রিশেষে সংসার ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সংশয়ের ভীষণ যাতনা।

প্রথমেই তারাপুরের দিকে চলিলেন। গাড়িতে উঠিয়া "মল্লারপুর" ষ্টেসনে নামিলেন। তথা হইতে পদব্রজে এক ক্রোশ দূরস্থ "তারাপুরে" গেলেন। রাজবেশ নাই, সামান্যবেশে, শুধু পায়েই যাইতেছেন। মাঠে কৃষকেরা মাঝে মাঝে সেইরূপের দিকে চাহিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতেছে :—

কৃ। ওরে ভাই ছিমন্ত! কে যাচ্ছে দ্যাখেছিস?

শ্রীমন্ত জমীতে লাঙ্গল দিতেছিল, হ্যাট্ হাট্ শব্দে গোরুর লেজ মলিতে মলিতে গোরুর চৌদ্দপুরুষান্ত করিতেছিল, সুতরাং কথাটা শুনিতে পায়নাই। কৃষকতাই জোরে বলিল "ওরে ভাই! একবার চেয়ে দ্যাখ?"

শ্রী। কি?

কৃ। ময়লা কাপড়ে ও কে যায় চিনিস? কি সোণার মত রং! মুখে যেন ডালিম ফ্যাটে পড়ছে! আহাহা! ও মনিষ্যি না দ্যাবদকরে।

শ্রী। হঁঃ তাই তো গা মামু যেন দ্যাখেছি। ও কোন আজপুত্তুর হবে, ঘর থেকে পেলয়ে এসেছে। কৃষক দুই জনের

দেখাদেখি আরও কয় জন কৃষক সেই ধাবিত দেবমূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ প্রকৃত দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করিল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। খুব বৃষ্টি হওয়ায়, মাঠে খুব লাঙ্গলের কার্য্য চলিতেছে। আকাশ মেঘে ঢাকা—যেন সমুদ্র গম্বুজাকারে পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র, বামদেবের আকৃতি, কথা, কথার সুর, প্রেমোন্মাদ, এই সব ভাবিতে ভাবিতে, এবং মাঝে মাঝে সংসারের অতীত স্নেহধারার কথা, অতীত জীবনের মধুময়ী ছায়ার কথা—অতীত সুখদুঃখ উভয়েরই মধুময়ী আকৃতির কথা, বৈরাগ্যের আগুণে ভস্ম করিতে করিতে যাইতেছেন।

একবার জীবনটা যেন মুখ ফিরাইয়া আপনার আপাদমস্তক দেখিতেছে।—সেই সুখের শৈশব, মার কোলে, মার বুকে, পিতার সবল বাহুঅবলম্বনে, পিতার গম্ভীর স্নেহদৃষ্টির কোমল আলোকে, আদরে আবদারে গদ গদ হইতেছে; একটী চাহিতে দশটী পাইতেছে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য মুকুরের ফাঁদে ধরিয়া আনন্দে স্ফীত হইতেছে; সে সুখের শৈশব জলবুদ্‌বুদের মত জনমের মত বিলীন হইয়াছে। হায় হায় এমন জীবনের মূল্য কি? যৌবনে মনে বাসনার সমুদ্র উথলিয়াছে—সে সাগরের হিল্লোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তলাইয়াছে—সেই বাসনার শত শত মূর্ত্তি এখন একটী মূর্ত্তিতে আমাকে অকুলপাথারে ডুবাইয়াছে। প্রথম বাসনা, ঈশ্বর যদি আছেন, মানুষ দেখিতে পারে কি না; অথবা ঈশ্বর মানুষকে দেখা দেন কি না? ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনা যায় অর্থাৎ মন বুদ্ধি প্রজ্ঞা, গভির আলোচনাদ্বারা, প্রাণের শান্তির জন্য ঈশ্বর (জগতের কর্ত্তা) সম্বন্ধে যে সব মীমাংসা করিয়াছে, সে সব মীমাংসাতো মানসিক। মন প্রশ্ন তুলিয়াছে—মনই উত্তর দিয়াছে—

যেমন আঘাত করিলেই প্রতিঘাত হয়। মনের এমনি গঠন, যে, যেমন প্রশ্ন তেমনি উত্তরও মনেই আছে। এমনি সুন্দর ভাষায়, গভির যুক্তিতে মন, জিজ্ঞাসু মনকে শান্ত করিয়াছে, যে, মন সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া আর থাকিতে পারে না। কিন্তু মনের ঐ বিশ্বাসের মত বস্তু কি বাস্তবিকই আছে? মহাপণ্ডিত ইমানুএল ক্যাণ্টের এই গভীর প্রশ্নের উত্তর কই? বোধ হয় এইখানেই বিচারশাস্ত্র সমাপ্ত। বিচারের আলোক ইহারপর আর দীপ্তি দিতে পারে না। ইহারপর যে গভীর অন্ধকার, সে অন্ধকারের আলো দর্শন বিজ্ঞানে নাই। বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রই সেই দেশ আলোকিত করিতেছেন। সাধু-সিদ্ধ-ভক্ত-যোগী সেই আলোকে বাস করিতেছেন। আমার বোধ হয়, এই আলোকে ইহকাল পরকাল ভূত ভবিষ্যৎ, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই আলোকিত। এই আলো প্রাণে জ্বলিলে, আর কোন আলোর দরকার হয় না। এই আলোকের কাছে দর্শন বিজ্ঞানের আলো সূর্য্যালোকে প্রদীপের মত। বামদেব বোধ হয়, সেই আলোক পাইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা, বোধ হয়, এই আলো জ্বালিয়া ভারতবর্ষকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। এই আলো নাই বলিয়া উরোপের বোধ হয় এত দুর্দ্দশা। এই আলো প্রাণে জ্বালিবার জন্যই বামদেবের কাছে যাইতেছি। যদি তিনি দেখাইতে পারেন, তবেই, সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া তাঁকে জানিব। তাঁর পায়ে জীবন বিকাইব। আর যদি দেখাইতে না পারেন——ভাবিবামাত্র রাজপুত্রের সমস্ত অস্তিত্ব ভয়ে দুঃখে যাতনায় শিহরিয়া উঠিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল—যুবা পথের মাটীতে হাত দিয়া বসিলেন। তখন ইহকাল পরকাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, যোগ ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্ম

সবই যেন লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় অন্তর্হিত হইল। সে সব যেন ঘন অন্ধকার, বিরাট কপটতা, ভীষণ ছলনা বলিয়া বোধ হইল। মাথার শিরায় শিরায় যেন বজ্র ছুটিতেছে, বুক যাতনায় যায় যায় হইতেছে—ভিতরে নীরব ভাবের অগ্ন্যুদ্গমঃ—উঃ গেলুম! বুক গেল! প্রাণ গেল! আশা ভরসা গেল! ইহকাল পরকাল গেল! আমি তবে কেন? কার জন্য? এত আশা, ভরসা, আয়াস, উদ্যোগ, সব কি শূন্যের বুদ্বুদ শূন্যে মিশাবে? গেলাম! গেলাম! এ যে বড় জ্বালা! এ যে ভীষণ রোগ! হায় আমার এ রোগের ঔষধ পৃথিবীর কাব্য দর্শনবিজ্ঞানে কোথাও নাই। কাব্য দর্শনবিজ্ঞান—(মানুষের বড় বড় কথার পাহাড়), সব রসাতলে যাক! হায় বুদ্ধদেব! হায় শ্রীগৌরাঙ্গ! হায় নানক! হায় মহম্মদ! হায় যীশু! লক্ষ লক্ষ লোক যে তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্বর্গ ভেদিয়া, শান্তিলাভের জন্য জীবন্ত মাথা কাটিতে কাটিতে আনন্দে হাসিতেছে, ইহা কি বিকার—প্রহেলিকা—তামাসা? উঃ গেলাম! বুকগেল! পাঁজর, হাড়, মগজ সব পুড়ে গেল! উঃ বিশ্বাসহীন প্রাণ! উঃ সংশয়! এ সংশয়রোগের ঔষধ কোথায়? দর্শনশাস্ত্রে? না না—ক্যাণ্টের একটা কথার আঘাতে আমার কাল্পনিক বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হইয়াছে। ক্যাণ্টের এই একটা কথার আঘাত শত বজ্র অপেক্ষা শক্তিশালী। ও কথার উত্তর কে দেবে? ভগবানকে না দেখিলে ও কথার উত্তর হবে না। দর্শনশাস্ত্র তুমি কি? এই অনাদ্যনন্ত বস্তুকে বিচারদ্বারা নির্ণয় করিতে যাওয়া? কি স্পর্দ্ধা! দর্শনশাস্ত্র? Philosophy? "It is a tale told by an idiot, full of sounds and fury signifying nothing" এইবার সিদ্ধপুরুষের শক্তিটা

বুঝিব। অন্ধকে চক্ষুদান করা তো চিকিৎসকের কার্য্য, মৃতকে প্রাণ দেওয়াও দ্রব্যগুণের কার্য্য। আমার ভিতরের অন্ধতা দূর করিয়া, যদি সেই ভূমান সচ্চিদানন্দকে দেখাইতে পারেন, তবে তিনি প্রকৃত সিদ্ধ।

আর একটী বাসনা আছে। তাহাও বামদেবকে পূর্ণ করিতে হইবে। সেটী আমার জীবনের মহাশান্তির বস্তু। বনলতাকে হারাইয়া অবধি এই আকাশে শূন্যতা বাড়িয়াছে, অন্ধকারে কাল রং বাড়িয়াছে, আলো—অন্ধকার হইয়াছে। আমার আশার মাথা ভাঙিয়া গিয়াছে, আনন্দের প্রাণ পলাইয়া গিয়াছে। সেই অবধি আর মস্তিষ্কে বল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই। বই পড়িতে গিয়া মানে বুঝিতে পারি না। ভগবানের পরই আমার বনলতা। ভগবানও চাই বনলতাও চাই। এই দুটী বস্তু যদি বামদেব দিতে পারেন, তবেই বাঁচিব, নহিলে নিশ্চয়ই মরিব। দুটীর একটী পাইলে জীবন থাকিবে। যদি ভগবানকে বাস্তবিক না পাই, তো, বনলতাকে পাইলে, এ আগুণে জল পড়িবে। আর বনলতাকে না পাইয়া যদি ভগবানকে পাই, তো, এ আগুণে জল পড়িবে। কিন্তু বনলতাকে না পাইয়া ভগবানকে পাইলে, মনে এই আক্ষেপ থাকিবে, যে ভগবান বনলতাকে কাড়িয়া লইয়া, আমাকে দর্শন দিলেন। বনলতাকে কাছে বসাইয়া যুগল মূর্ত্তিতে ভগবানের পূজা করিতে পাইলাম না—এই দুঃখের অশ্রুতেই ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত করিতে হইবে। হায়! ঈশ্বর! যদি তুমি থাক, আমার এই ভীষণরোগ, একবার দেখাদিয়া দূর কর! আমার কি একটা দুঃখ? প্রেমদার দুঃখ আমার কর্ত্তব্যজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। পিতৃমাতৃ শোকে আমার বুক ফাটিতেছে। বনলতার

অভাবে দুঃখ আমার ক্ষুদ্র জীবনে স্থান পাইয়া আমাকে চাপিয়া মারিতেছে—যদি আমি হিমালয়ের মত বড় হইতাম, তাহা হইলেও এ দুঃখের চাপ অসহ্য হইত। আবার ঈশ্বরের অভাবে আমার সসীম দুঃখ অসীম হইয়াছে। অনন্ত আকাশ আমার এ দুঃখ সহিতে পারে না। তরুলতা পশুপক্ষী সব যেন আমার দুঃখের এক একটী জীবন্ত মূর্ত্তি। যদি বামদেবের কাছে গিয়া, শান্তি না পাই, তো আত্মহত্যা করিব, না হয় উন্মাদ হইব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার একটু আগে রাজপুত্র তারাপুরে পঁহুছিলেন।

বামদেবের আশ্রমে গেলেন। সেখানে বামদেব নাই। তিন জন শিষ্য মাত্র আছেন। তাঁরা রাজপুত্রের সে বেশ দেখিয়া চমকিত হইলেন। একটী শিষ্যের খুব উন্নত অবস্থা। তিনি মনের ভাব বুঝিতে পারেন। তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি রাজকুমারকে বসিবার জন্য মৃগচর্ম্ম দিলেন।

রা। স্বামীজি কোথায়?

শি। তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।

রা। সর্ব্বনাশ! কবে আসিবেন?

শি। আসাআসি আর কি?

রা। কথাটা বুঝিতেছি না।

শি। সিদ্ধযোগীরা মনে করিলেই আসিতে পারেন।

রা। সূক্ষ্মদেহে না স্থূলদেহে?

শি। দুই দেহেই পারেন।

রা। আপনারা দেখিয়াছেন?

শি। প্রত্যহই দেখিতেছি।

রা। দেখাতে পারেন ?

শি। পারি বইকি।

রা। এখন দেখাতে পারেন না ?

শি। যদি আপনি বড় ব্যাকুল হন, তিনি আপনার ব্যাকুলতা বুঝিয়া দেখা দিবেন।

রা। কোথায় বসিয়া ব্যাকুল হইব বলুন ?

শি। ঐ যে দূরে সব পাহাড় দেখিতেছেন, ঐখানে নদীরধারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি তাঁকে চিন্তা করুন, কাঁদুন, ছট্‌ফট্‌ করুন, তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিবেন।

রা। ওরকম ছট্‌ফট্‌ করিলে, কাঁদিলে ভগবান স্বয়ং কি দেখা দেন না ?

শি। দেন বইকি।

রাজপুত্রের চক্ষুদিয়া জল পড়িল। শরীরে রোমাঞ্চ হইল। যেন সাহারায় বারিপাত হইল।

রা। ভগবানকে কি আপনি দেখিয়াছেন ?

শি। যদি বলি দেখিয়াছি, আপনার তাতে কি বিশ্বাস হবে ? নিজে যখন দেখিবেন, দেখিয়া পরীক্ষা করিবেন, তখন বিশ্বাস হবে। ভগবদ্বিশ্বাস অনেক জন্মের কঠোর তপস্যার ফল। সে বিশ্বাসের এক কণা যে পেয়েছে সে সংশয়ের জ্বালা, পাপের হাত হ'তে এড়য়েছে।

এক একটা কথায় রাজপুত্রের প্রাণে অমৃত সঞ্চার হইতেছে। আশ্বাসিত প্রাণে বলিলেন "আমার কি বিকার যাবে ?

শি। " সংশয়ের বৃদ্ধি যখন ষোলআনা হবে, তারপরই সংশয়

যাবে। এখন তো আপনার সংশয়ের এই সন্ধ্যা এখনও দ্বিপ্রহর রাত্রি আছে।

"উঃ গেলাম"—বলিয়া যুবা তাঁর সংশয়ের ভাবীভীষণ মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিয়া, মুর্চ্ছিত হইয়া ঘুরিয়া পড়িলেন। তখন শিষ্যগণ অতিযত্নে ব্যস্ত ভাবে রাজপুত্রের শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা পরে জ্ঞান হইল। উঠিয়া বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে প্রধান শিষ্যের লাবণ্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "অমাবস্যা কাটিবে তো ?"

শি। নিশ্চয় কাটিবে।

যুবার প্রাণে আশার জ্যোতি খেলিল।

শি। আপনার প্রকৃত সংশয় আসিয়াছে। এরূপ যাতনা পূর্ণ সংশয় প্রার্থনীয়। যে সংশয়ে যাতনা নাই সে সংশয় অতি সামান্য—কোন ফল দেয়না। ভীষণ যাতনা পূর্ণ সংশয়ের পরই বিশ্বাসের আলো আসে। এই সংশয় যাতনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়। শত পুত্র শোক এ যাতনার সমান নয়।

রা। মহাশয় আলোর কথা কিবলিলেন বুঝিতে পারিলামনা।

শি। ঘোর সংশয় তিমিরে যখন প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া, "সত্যের" জন্য ছট্ ফট্ করে, তখন ভগবানের প্রকাশ হয়। প্রথম প্রকাশে ভগবানের রূপ দেখাযায়— তেজোপূর্ণ রূপ—সেই রূপের আলোকে সংশয় অন্ধকার চির কালের মত দূর হয়। প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। যেমন খুব গরমের পরেই বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

রা। মহাশয়! আমার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেছেন। আমার রোগ আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আপনার কথায় আমার কতকটা বিশ্বাস হইতেছে।

শি। কি বিশ্বাস ?

রা। আজ রাত্রে ঐ পাহাড়ের ধারে বসিয়া আপনার গুরুদেবের ধ্যান করিলে, তাঁর জন্য কাঁদিলে, ছট্‌ ফট্‌ করিলে, তিনি দেখা দেবেন এই বিশ্বাস।

শি। আমি সংশয়ের তীব্র জ্বালায়, পাহাড়ে উঠিয়া যখন হাত পা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; তখন গুরুদেব আমাকে অকস্মাৎ ধরিয়া রক্ষা করেন।

রা। মহাশয়রা সাধুপুরুষ, আমি বিষয়ী। আপনাদের পবিত্র আশ্রম আমরা কলঙ্কিত করিতে আসি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার আজিকার বাসনা পূর্ণ হয়।

শি। আপনি প্রকৃত সাধু। কারণ প্রকাণ্ড বিষয় ছাড়িয়া ভগবানের জন্য ধাবিত হইতেছেন। এখন তারামার আরতি হবে, আরতি দেখিতে যাই চলুন। আরতির পর সাধনার জন্য ঐ পাহাড়ের কাছে নদীর ধারে যাইবেন।

সকলে আরতি দেখিতে তারামার বাড়িতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



প্রকৃতির ভিতরে।

রাজকুমার তারামার বাড়িতে আরতি দেখিতে গেলেন। শাঁক ঘণ্টা কাঁশর, ঘড়ি, ঢাক প্রভৃতির শব্দের সহিত মানুষের ভক্তির শব্দ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের আরতি হইল। অনেকে মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের প্রাণটা বড় গলিয়া গেল, চক্ষু, জলে ভরিল, কিন্তু আরতি শেষে পাহাড়ের দিকে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন "কাঁদিলাম কেন? বাল্যসংস্কার এমনি শক্ত যে কিছুতেই যাইবার নহে। ধর্ম্মও কি এই রকমের সংস্কার? এই সংস্কার নষ্ট হইলে কি ধর্ম্মভাব থাকিবে না? কত অসভ্য জাতির ইতিহাসে পড়িয়াছি তাহাদের ঈশ্বর ভাব কি নীতির ভাব আদতে নাই। যেখানে নাই সেখানে প্রকাশের অভাব, বুঝিলে দোষ কি? যেমন গান স্বরে রাগে সপ্তমে উঠে, সেইরূপ এই বিশ্ব একটি প্রকাণ্ড ভাব লইয়া তালে তালে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতেছে, বোধ হয়। কোথাও ভাব বিশেষের অপ্রকাশ দেখিয়া, ভাব প্রকৃতির গর্ভে নাই, বলা যুক্তি বিরুদ্ধ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া দেখিলেন, বৃক্ষ প্রাচিরের তরল অন্ধকারে আলো ফাসাইয়া, গোলাকার

চন্দ্র জগৎকে হাসিতে ভাসাইতে ভাসাইতে উঠিতেছে। কাঠে যেমন আগুন জ্বলে, মেঘে তেমনি জোৎস্না জ্বলিতেছে। রাজকুমার প্রকৃতির সে শোভা দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন "হায়! আমার সংশয়-অন্ধকারে কবে ওই রূপ বিশ্বাসের আলো হাসিবে।" বাস্তবিকই কি সব কল্পনা? এই চাঁদ অতুল রূপে জগৎকে ভাসাইতে আসিতেছে, একি কল্পনা—মিথ্যা—শূন্যজাত? আমার যেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আর এক ভাব দেখিতেছে, "এক মহারূপের সাগরে ডুব দিয়া সুন্দর হইয়া যেন ঐ চাঁদ আকাশে উঠিতেছে।" ও রূপ কখনই চাঁদের নয়; যদি জড়ীয় রূপ হইত তো আমার প্রাণ ও রূপের ভিতরে আর এক সূক্ষ্ম রূপ অনুভব করিয়া আনন্দে উন্মাদ হইত না। আহা! আমার বনলতার মুখ খানি ঐ রকমেই জানালায় প্রকাশ পাইত—ছাদের আকাশ আলোকিত করিত। বনলতার মুখ খানি যেমন আমার প্রিয়, ঐ চাঁদ মুখ খানিও আমার মত আর প্রেমিকের প্রিয়; নহিলে রাত্রে যখন সমস্ত ধরা ঘুমে অচেতন হয়, তখন ও মুখ খানি ধীরে ধীরে আকাশে নীরবে নীরবে সঞ্চরণ করে কেন? জড় জগৎ ও রূপের মর্ম্ম কি বুঝিবে? বড় বড় কবির কাব্য জ্যোতি ঐ রূপের একটী কণার সমানও নহে। অমন সৌন্দর্য্য ভোগের উপযুক্ত কবি এ মাটীর মহীতে নাই। বোধ হয় জগৎ-কাব্যকার ঐ কাব্যখানি নির্জ্জনে পড়িবার জন্য আকাশে রাখিয়াছেন। জগতে এমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি আর কোথাও নাই। চাঁদের জোৎস্না যদি চাঁদে না থাকিয়া কোন নরমূর্ত্তিতে থাকিত, তো, সকলেই ভগবান জ্ঞানে তাঁর পাদমূলে লুটাইয়া কৃতার্থ হইত। একটী গানে আছে "জানি কার রূপ সাগরে ডুব দিয়ে সে গৌর হ'য়েছে"। সেই পংক্তির গভীর অর্থ এই বিশ্ববিমোহিনী চন্দ্রমার

রূপ দেখিয়া বুঝিতেছি। এই যে আকাশের অনন্ত গাম্ভীর্য্য—ইহা কি জড়ের ধর্ম্ম? গাম্ভীর্য্য তো আত্মার ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ম্ম প্রাণে মনে হৃদয়ে খেলিয়া, চক্ষে, মুখে, শব্দে, ব্যবহারে প্রকাশ পায়। যদি এই আকাশে এক বিরাট আত্মা নাই তবে আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম আকাশে কোথা হইতে আসিল। আহা! সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিলে, এক বিরাট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয়ে ভক্তিতে মাথা নোয়াইতে হয়। যদি সমুদ্রে এক বিরাট আত্মা নাই, তো, আত্মিকধর্ম্ম যে গাম্ভীর্য্য, তাহা সমুদ্রে কোথা হইতে আসিল? প্রকাণ্ড হিমালয়ের কাছে দাঁড়াইলে, পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়;—আহা! এ গাম্ভীর্য্য কার? বজ্রের হুঙ্কার, সমুদ্রের কল্লোল—এ সবে কাহার গাম্ভীর্য্য? আর ঐ যে চাঁদের হাসিতে আকাশ, মাঠ, পাহাড়, তরু, লতা, ফল, ফুল সব হাসিতেছে,—ও হাসিইবা কাহার হাসি? হাসিতো আনন্দের ধর্ম্ম; আনন্দতো চৈতন্যের ধর্ম্ম। যদি ঐ জড়চাঁদে মহা চৈতন্য নাই, তবে অমন ভুবন ভুলান হাসি কোথা হইতে আসিতেছে? যেন সবই চৈতন্য, সবই তিনি, ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই একটী ছায়া মাত্র। হায় হায়! এই ছায়ার এত প্রভাব? এই ছায়া আমাকে লণ্ডভণ্ড করিতেছে। এই বিস্তৃত নীলাকাশ জ্যোৎস্নায় ঢল্ ঢল্ করিতেছে! যেন প্রেমাবেশে আত্মহারা। ঐ চারিদিকে পর্ব্বতমালা মেঘমালার মত, চন্দ্রকিরণে হাসি হাসি ভাবে প্রফুল্ল হইয়া যেন কৃতার্থ হইতেছে। আমার প্রাণ যেন জ্যোৎস্না পান করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের গুপ্তদ্বার খুলিয়া, জ্যোৎস্নাধারা ছুটিয়া আমার অস্তিত্বকে পূর্ণ করিতেছে। যেন অমৃতসাগরে তরঙ্গের মত প্রাণ নাচিতেছে। আহা! এইতো আমার সেই ভগবানের রূপ! যত ভাবি তাঁর

রূপ, চাঁদের নয়; তাঁর চাঁদ আকাশের নয়, তাঁর আকাশ শূন্যের নয়, ততই প্রাণে শান্তি বাড়ে। আর যত ভাবি তিনি নাই—উঃ কি যাতনা! সব শূন্য—সব শূন্য—আমি আর তখন থাকি না। যাহাতে যাতনা তাহাই অস্বাভাবিক—রোগ; আর যাহাতে আনন্দ, শান্তি, তাহাই স্বাভাবিক—স্বাস্থ্য। সবই তাঁর; রূপ তাঁর; গাম্ভীর্য্য তাঁর; হাসি তাঁর; আনন্দ তাঁর। দূর হইতে যাঁর আলোচনায় এত সুখ, তিনি কি মিথ্যা? আজ আমার মন প্রাণ আত্মা, আর এই আকাশ, মাঠ, গাছ, পাহাড় সব একাকার। আমি ইহাদের অংশ, ইহারা আমার যেন অংশ, এরূপ বোধ হয় এই বোধে—বিশ্বাসে আরাম শান্তি পাই কেন? ঐ জ্যোৎস্না-বিধৌত পাহাড়গুলি, ঊর্দ্ধমুখী বৃক্ষগুলি, যেন আমারই আনন্দের উচ্ছ্বাস—তাঁহারই আনন্দের উচ্ছ্বাস, এই আকাশ আমারই সূক্ষ্ম একটী দেহ, তাঁহারই স্থূল একটী দেহ;—এই সব নূতন ভাব আমার অস্তিত্ব ভেদিয়া, দেহ রক্তধারার মত, মনে প্রাণে প্রবাহিত হইতেছে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার নদীর-ধারে পঁহুছিলেন।

নদীর দুইকুল বালুকাময়। বালুকারাশিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রকণার মত বালুকাকণা সকল কোটি কোটি হীরকখণ্ডের মত চন্দ্রকিরণে চকমক্ করিতেছে। নদীর অগভীর অপ্রশস্ত জলধারা, কল্ কল্ স্বরে, সামান্য বাতাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া চক্ চক্ করিতেছে। নদীর স্বচ্ছজলে চন্দ্র ডুবিয়া, শত মূর্ত্তিতে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে এবং নক্ষত্রভূষিত স্থির আকাশকে জলের ভিতরে পুরিয়া, আপনার রূপমোহে জলের তরঙ্গের সহিত অস্থির করিতেছে। যেখানে জল শৈলখণ্ডে বাধা

পাইয়া, তেজে নাচাইতেছে—গর্জ্জিতেছে, সেখানে জ্যোৎস্নার চক্‌মকানি অধিক, যেন জ্যোৎস্না তরল জলের, কঠিন পাথরের কাছে, তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া, হাসিয়া ঢলাঢলি করিতেছে। পাহাড়ে গাছ, লতা, শ্বেত শিলা, লাল মৃত্তিকা, ঝরণার স্বচ্ছজল, সব যেন জ্যোৎস্নায় মজিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপর হইতে ঝর্ ঝর্ শব্দে জল পড়িতেছে, পাথরের নুড়িতে লাগিয়া, তাহাকে একটু একটু নাড়িয়া সেখানকার জ্যোৎস্নাকে নাচাইয়া আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে।

রাজকুমার জ্যোৎস্নার চাকচিক্য, নৃত্য. স্বপ্নাবেশ, দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। আনন্দে আপনার নাম ধাম, সুখ দুঃখ, বনলতা প্রেমদা, সংশয়বৈরাগ্য, সব ভুলিয়া সেই আনন্দসাগরে তরঙ্গের মত ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন; তাঁর মন প্রাণ আশা ভরসা সব প্রকাণ্ড হইয়া সেই অনন্ত আনন্দমূর্ত্তিকে যেন আবরিয়া ফেলিতেছে। সেই সৌন্দর্য্যস্পর্শে, সৌন্দর্য্যসম্ভোগে যেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শত দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; মেধা, স্মৃতি, বিচার সব সম্ভোগের তৃপ্তিতে বিভোর হইতেছে। যেন রাজকুমারের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সৌন্দর্য্যস্পর্শে দেহপিঞ্জর হইতে দৈববলে মুক্ত হইয়া, মহাশক্তিতে সূক্ষ্মদেহ প্রসারে প্রকৃতির রূপের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভোজ্যবস্তুলাভে কৃতার্থ হইতেছে, এই যাত্রী বিদেশ ছাড়িয়া, সৌন্দর্য্যের জগতে স্বদেশ পাইয়া প্রকৃতির প্রাণে মিশিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে সেই শোভার সমুদ্র হইতে এক নীরব বজ্রনাদ হইল "যাহা কিছু দেখিতেছিস, সবই আমি।" যুবা তখন চমকিয়া উঠিলেন—প্রাণ মন বুদ্ধি ভক্তিতে গলিয়া-গেল—প্রকৃতির রেণুতে রেণুতে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি হইল।

সমস্ত জ্যোৎস্নার মাধুরি সেই শব্দের সুরে ঘন হইয়া, সমস্ত জগতের গাম্ভীর্য্য সেই স্বরে একত্র হইয়া, সমস্ত জ্ঞান সেই শব্দে গাঢ় হইয়া, তাঁহার সংশয়ের অন্ধকার দূর করিয়া জীবনে জ্ঞানের ভিত্তি* সংস্থাপিত করিল।

রাজকুমার নবজীবন লাভ করিলেন। প্রকৃতির ভিতর হইতে কে এই মধুর গম্ভীরস্বরে উপদেশ দিলেন! স্পষ্ট—এত স্পষ্ট মানুষে বলিতে পারে না—আর কেহ শুনিল না কিন্তু আমার প্রাণে যেন বজ্রধ্বনির মত বোধ হইল। এখন বেদান্তের কথাই ঠিক বোধ হইতেছে, একবস্তুই বহুবস্তুতে বহুমূর্ত্তিতে বহুসুখে দুঃখে, আপদে সম্পদে, কোমলে কঠিনে, তরলে গম্ভীরে প্রকাশিত; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। জীবনে তিনটী জ্ঞানীর কথা পূজা করিয়া আসিতেছিলাম। একটী ব্যাস, একটী প্লেটো, একটী ক্যাণ্ট। এখন এই তিনের মধ্যে ব্যাসের কথাই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। প্লেটো বা ক্যাণ্ট বোধহয় আপন আপন বিচার বুদ্ধি আলোড়নে আপনাদের শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন আর ব্যাস আকাশ মন্দিরে ঐ অদ্বিতীয় মহাগুরুর মুখে শুনিয়া অক্ষয় অভ্রান্ত আলোক রাশির মত অগাধ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা জগতে জ্ঞানে সিদ্ধ, তাঁহারা এই আকাশ বিদ্যালয়ের অগম্য অগোচর মহাগুরুর

* জ্ঞানের ভিত্তি—প্রত্যাদেশজাত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শ্রুতি বা বেদ। জ্ঞানের তিনটী অবস্থা একটী সংস্কারজাত জ্ঞান, একটী বিচারজাত জ্ঞান, একটী প্রত্যাদেশজাত জ্ঞান। মানুষ যখন বিচারের শেষ সীমায় উঠিয়া অন্ধকার দেখে (রাজকুমারের মত) এবং প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হয় তখন ভগবান স্বয়ং বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়া অভ্রান্ত জ্ঞানামৃতদানে মানুষকে কৃতার্থ করেন। ইহাই Inspiration.

মুখের কথা; শুনিয়া, অক্ষয়জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনে মহাশান্তি পাইয়াছেন।

এই রূপ মহা আনন্দে জ্ঞানচিন্তায় বিভোর রহিয়াছেন, এমন সময়ে কে কুমারের মস্তকস্পর্শ করিলেন। কুমার চমকিত হইয়া, ফিরিয়া দেখিলেন "এক জটাজুট বিভূষিত ঋষিমূর্ত্তি"। চিনিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে পা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে গদ গদ ভাবে বলিলেন "প্রভু! আমায় রক্ষা করুন"।

ঋ। রাজকুমার বাবা! তারামার কৃপা হয়েছে গো! মার কথা শুনলে তো? তবে আর ভাবনা কি বাবা!

রাজকুমার বামদেবের পায়ে মাথা রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ ভক্তিতে স্থির হইয়া থাকিলেন। বামদেবের কাছে প্রধান শিষ্য দাঁড়াইয়া, শিষ্যের দিকে চাহিয়া বামদেব বলিলেন শিষ্যের মত ভক্তি যে গো! দীক্ষা দিলেই হয়"।

দীক্ষার কথা শুনিয়া বলিষ্ঠপ্রাণে রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে বলিলেন "বাবা! আমার শান্তি কি হবে না?"

বা। তারা-সমুদ্রে ডুবে থেকেও বাবার শান্তি হচ্ছে না?

রা। বাবা! গণ্ডারের চামড়া—অসাড় জীবন—কিছুই টের পাই না।

বা। এখন এখান হতে আশ্রমে চল।

রাজকুমার তাঁহাদের সঙ্গে আশ্রমে চলিলেন। আশ্রমে পঁহুছিলেন—তখন রাত্রি দুইটা। বামদেব রাজকুমারকে কাছে বসাইলেন। রাজকুমারের গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন "বাবা! মাতে বড় সন্দেহ হয়েছিল—তা ভাল বাবা

ভাল। মা আমার শ্মশান বাসিনী। তোমার জীবনটা এখনও শ্মশান ঠিক হয় নাই। শীঘ্রই হবে।

রা। কবে হবে।

বা। শ্মশানে বামুন চণ্ডাল সব সমান—সেখানে মান অপমান হিংসা বিদ্বেশ স্নেহ প্রণয় সব পুড়িয়া ছাই হয়। তোমার জীবনে যখন সব পুড়িয়া ছাই হবে—সবে সমান বোধ হবে, আপনার মত জ্ঞান হবে, তখনই শ্মশানবাসিনী বেটীর দেখা পাবে।

রা। সে দশা কবে হবে বাবা! কবে শ্মশানবাসিনী মাকে দেখিব?

বা। বাবা! আমি এখনি তোমাকে মাকে দেখাতে পারি—কিন্তু দেখাবনা।

শি। এখনও সময় হয় নাই। পানা পুকুরের পানা ঠেলে সরিয়েদিলে আবার পানা এসে জল আচ্ছন্ন কর্‌বে। একবারে পানা মরে যাওয়া চাই।

বা। জল নির্ম্মল হলেই পানা যাবে—মায়া কাটবে। তবে একবার সে রূপ দেখলে লোভ হবে—মাঝে মাঝে মনে পড়লেই প্রাণটা মার জন্য কেঁদে উঠবে।

শি। সেই বেটীই ভুলিয়ে রাখবে।

বা। কত ব্রহ্মাবিষ্ণু তাঁর মায়ায় বোকা, মানুষে কি করবে?

রা। বাবা! এখন একবার মাকে দেখাতে আপত্তি কি?

বা। বাবা! মাকে কি ষোল আনা চাও? ঠিক বল দেখি?

রাজকুমার চুপ করিয়া বনলতার মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বা। ঐ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বনলতার আসক্তি দূর হউক।

এই কথায় রাজকুমার ভয়ে সিহরিয়া উঠিলেন। মনে ভাবিতেছেন "বামদেব মনের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পান—কিছুই লুকাবার যো নাই।"

বা। আজ আর নয় রাত্রি সামান্যই আছে। আমরা একটু শুই। তুমি বাবা ঐ মৃগচর্ম্মে একটু শুয়ে নিদ্রা যাও।

সকলে শয়ন করিলেন। রাজকুমার মৃগচর্ম্মে শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁর সেই গ্রামে বনলতাকে পাইয়াছেন। আপনার সেই পুকুরের অট্টালিকায় বনলতাকে লইয়া দিন দিন আমোদ করিতেছেন। বনলতার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল। দুটী কন্যা জন্মিল। পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ হইল। এই প্রকার ত্রিশ বৎসর হিসাবে অতিবাহিত করিলেন। বনলতার মৃত্যু হইল! রাজ-কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখেন বামদেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে রাজকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া বামদেবকে প্রণাম করিলেন। বামদেব কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন "কি বাবা! বনলতার ক্ষোভ মিটিল?"

রাজকুমার চুপ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। বামদেব জিজ্ঞাসিলেন "বাবা কাঁদ কেন?"

রা। বাবা! আমার এক চমৎকার জ্ঞান হইয়াছে।

বা। কিগা বাবা।

রা। আমি বনলতাকে লইয়া ত্রিশটী বৎসর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ এই দুই ঘণ্টা রাত্রের মধ্যে কি প্রকারে করিলাম। মায়া যে কি তাহা বেশ বুঝিলাম। দুই ঘণ্টার ভিতরে প্রত্যহ নিয়মিত কার্য্যাদি করিয়া—প্রত্যেক দিনে তের চৌদ্দ ঘণ্টা জাগ্রত থাকিয়া এবং অবশিষ্ট কাল ঘুমাইয়া—এই প্রকারে দিনেরপর দিন কাটাইয়া,

তিনটী পুত্র ও কন্যার পিতা হইয়া—তাহাদের প্রত্যেকের বিবাহ দিয়া—ত্রিশটী বৎসর অতিবাহিত করিয়া বনলতাকে যমের মুখেদিয়া নিদ্রোত্থিত হইলাম। এরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন জীবনে হয় নাই। আর এই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া তো বোধ হইতেছে না। এখন এই অতীত ঘটনাগুলি স্বপ্ন কি জাগরণটা স্বপ্ন এই লইয়া মনে সন্দেহ হইতেছে। এই জন্যই ভাবিতেছি জীবনের রহস্য কি অদ্ভুত অবোধ্য ব্যাপার।

বা। এখন ওসব যা হক—বনলতার প্রতি আসক্তি আছে?

রা। আর কিছু আসক্তি নাই—ইহা আরও আশ্চর্য্য।

বা। বাবা! নশ্বর রূপের আসক্তি কতদিন থাকে? তুমি বনলতার রূপে মুগ্ধ ছিলে। কিন্তু বনলতা তোমার রূপে মুগ্ধ নয়। তোমার ভিতরে মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া সে মজিয়াছে—তার আসক্তি কিছুতেই যাবে না। তুমি যদি বনলতার রূপে ভগবতীর রূপ দেখিতে, তো, কারসাধ্য সে আসক্তি নাশ করে? সেই আসক্তি তোমার আকাশ-গঙ্গায় হবে। হলে তোমার শান্তি হবে। যাহা হউক এখন তুমি ঘরে যাও। বিষয়ের বন্দবস্ত দশ বার বৎসরেরজন্য করগে। প্রেমদার মন ঠাণ্ডা করগে। স্ত্রীর দুমাস গর্ভ। তোমরা এখনও টের পাও নাই। একটী বংশধর হবে! পুত্রের অন্নপ্রাসনের পর, স্ত্রীর অনুমতি লয়ে, সতীশকে বিষয়ের কর্ত্তা করে, দশ বৎসরের জন্য বনযাত্রা করিবে। আমি স্থান ঠিক করিয়া দেব। সেইখানে সাধন করিবে। মহামায়া মাকে দেখিয়া চির শান্তি লাভ করিবে।

আমি আজই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইব। তুমি পুত্রের অন্নপ্রাসনের পর, চন্দ্রনাথতীর্থে একলা যাইবে। সেখানে তোমাকে দীক্ষাদিয়া তোমার তপস্যার ব্যবস্থা করিব। তুমি তারামাকে প্রণাম করিয়া এখনি রওনা হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——০ঃ*ঃ০——

পতিগতভাব।

রাজকুমার তারাপুরে আসিবার দুই দিন আগে প্রেমদার ঘরে বসিয়া নিস্তারিণী ও হেমন্ত, প্রেমদার সহিত কথা কহিতেছেন ঃ—

হে। বউ দিদি! একটা কথা শুনেছ?

প্রে। কি কথা ঠাকুর ঝি?

হে। দাদাবাবু! দিনের বেলা কোথায় থাকেন, তা জান?

প্রে। জানি।

হে। কি জান?

প্রে। দীঘির বাড়িতে বই পড়েন, লেখেন আবারকি করবেন!

হেমন্ত মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিস্তারিণী একটু কাতর হইয়া বলিলেন "হাসির কথা নয় লো—হাসির কথা নয় বড় অমঙ্গলের কথা"।

"অমঙ্গলের কথা"—শুনিবামাত্র প্রেমদা হাঁ করিয়া চৈতন্য হীনার মত উহাদিগের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসিলেন, কি অমঙ্গল ভাই! তাঁর কোন বিপদ হয়নি তো?" তখন নিস্তারিণী একটু মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "না গো রাণী না—বিপদ নয় কলঙ্ক,কলঙ্ক"।

প্রমদা অন্য ধরণে ভীতা হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিলেন "কার কলঙ্ক গো! আমার নাকি"?

নি। তাঁর হলেই তোমার, তোমার হলেই তাঁর, অর্দ্ধাঙ্গ তো।

প্রমদার ভয় বিস্ময় বাড়িল। কাতর সজল রক্তিম চক্ষে হেমন্তের হাত ধরিয়া বলিলেন "মাথাথাস ঠাকুর ঝি! সব খুলে বলভাই"!

হেমন্ত একটু বিকৃত স্বরে বলিলেন "শুনে আবার সেদিনকার মত রাগ না কর ভাই"।

নি। রাগ করা করি আবার কি! আমার ভাতার হলে মুড়ি খ্যাংরায় ঠিক্ করতাম। বাপ হকনা কেন সত্যিকথা বলবো।

প্রেমদার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, লাল মুখে নীল রং দেখা দিয়াছে, গলায় কথা আটকাইতেছে। তখন হেমন্ত বলিলেন "বউদিদি! তুমি যদি সেয়ানা হতে, তো, বের পরই দাদাবাবুকে বাগাতে পারতে—তুমিভাই বড় বোকা মেয়ে"।

প্রেমদা ভয়ে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ঠাকুরঝি! তোদের পায়ে পড়ি কি খুলে বল?"

হে। কেন জানিস না, "দাদাবাবু বনলতার সঙ্গে আছে"।

প্রেমদা কাঁদিয়া ফেলিলেন, ধীরে ধীরে সে ঘর পরিত্যাগ করিলেন। উহারা যেন দুখানা ছুরি দিয়া প্রেমদাকে আঘাত করিতেছিল, সেই আঘাতের জ্বালা এড়াইবার জন্য প্রেমদা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যঘরে গেলেন। তখন হেমন্ত নিস্তারিণী বড় বিপদে পড়িলেন।

নি। ওকি ভাই! কেঁদে যে উঠেগেল। সেবারেও উঠে গেছলো।

হে। মার কাছে বুঝি গেল। এমন জানলে কেবলতো !

নি। তুই গিয়ে হাতে পায়ে ধরে এখনি নিয়ে আয়।

হেমন্ত বড়ই ব্যস্ত ভাবে প্রেমদাকে সান্ত্বনা করিতে গেল। প্রেমদার হাত ধরিল। মুখের দিকে চাহিয়া, চক্ষে জলদেখিয়া, হেমন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বউদিদি ! তোমার দুটী পায়ে-পড়ি, আমাকে ক্ষমাকর্—তোর ঘরে চ(অ)।

হেমন্তের কাতরতা দেখিয়া আপনার চক্ষের জল আঁচলে মুছিয়া, হেমন্তের সঙ্গে আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। অবনত মস্তকে ভাবিতেছেন "কিপাপ করেছি, যে তাঁর নিন্দাশুনতে হল"।

নিস্তারিণী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন "হাঁ বউমা। কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলে কেন" ?

প্রে। তোমাদের কথা শুনে প্রাণেবড় কষ্ট হল, তাই উঠে-গেলাম, যে এমন বিষ আর না খেতেহয়।

নি। তা যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, সেটার জন্য সতর্ক হওয়া কি ভাল নয় মা !

হে। দাদাবাবুকে তুই একটু শোধরাবার চেষ্টা কর্।

প্রেমদার রাগ হইল। রাগের প্রকোপ কতকটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তাঁর কি দোষ যে আমি শোধরাব ?"

নি। বনলতার কথা কি শুন নাই ?

প্রে। শুনিব না কেন ?

নি। কার কাছে ?

প্রে। তাঁর কাছে।

হে। কি শুনেছ ?

প্রে। বনলতা কোথায় নিরুদ্দেশ।

হেমন্ত নিস্তারিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রে। হাসছ যে?

হে। দাদাবাবু তোকে বোকা বানয়েছে।

প্রে। তিনি তবে মিথ্যাবাদী। অমন পণ্ডিত, বিদ্বান, ধাম্মিক যিনি তিনি মিথ্যাবাদী!

দুজনে আবার মুখ চাপিয়া, হাসিতে লাগিল। প্রেমদার রাগ বাড়িল "কি ভাই তোমরা খালি হাসছ কেন? আমি বড় বোকা তোমরা খুব সেয়ানা। কি? বনলতার কি হ'য়েছে খুলে বল না?

হে। ঐতো আগে ব'লেছি, তুমি যে কেঁদে উঠেগেলে!

প্রে। ওসব মিথ্যাকথা। আমি গরিবের মেয়ে তাই আমাকে ওসব কথা ব'লে হাসছ। যদি রাজার মেয়ে হতাম কি শ্বশুর শ্বাশুড়ি বেঁচে থাকতো, তো, এসব কথা ব'লতে কারও সাহস হ'তো না।

হে। তা যদি ভাই রাগ কর তো, ওসব কথায় দরকার কি? তোমার ভাতার তাই বলছিলাম। ভাতার খারাপ যদি হয়, তো স্ত্রী যত্নক'রে শোধরাতে পারে।

প্রেমদা কথাগুলিতে তীব্র বিষ অনুভব করিয়া, তাড়াতাড়ি আবার অন্য ঘরে চলিয়াগেলেন। গিয়া ঘরের মেজেতে শুইয়া, ভাবিতেছেন "ও রূপে কি কলঙ্ক সম্ভব? চাঁদে কলঙ্ক থাকিলেও, চাঁদ ভুবন আলো করিতেছে। যদি তাঁর কিছু দোষ থাকে, তো, সে চাঁদের কলঙ্কের মত। হয়তো, কাকেও কখনও একটু চড়া কথা বলেন, কি কাকেও একটী চড় মারেন; এই রকমের কিছু দোষ থাকিতে পারে। তা এ আবার দোষ কি? পুরুষ মানুষের মেজাজ কি মেয়েমানুষের মত হবে? কিন্তু মাসীমার আর ঠাকুর

ঝির কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ ছোট কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে মাঝে মাঝে শোনাতে আসেন। ছি! ছি! যদি আমার শ্বাশুড়ি ব'লতেন তবুও বিশ্বাস ক'রতাম না। আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন মনে হয়, সুখের পাহাড়ের চূড়াতে উঠেছি। যখন "প্রেমদা" বলিয়া ডাকেন, তখন পৃথিবীতে যেন নব-বসন্তের উদয় হয়, আমি তখন দেহ ছাড়িয়া, তাঁর ঐ ডাকে মিশিয়া যাই। আমাকে উনি এত ভালবাসেন। ওঁর নামে এইসব কলঙ্ককথা! ছি! ছি! ঠাকুরঝির মনহ'তে এ বিশ্বাসটী দূরকয়ে তবে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কব। যদি ঠাকুরঝি আবার ওকথা বলে, তো, জীবনে আর কথা কব না। নিজেদের ভাতার-দের মত সকলের ভাতার মনে করে।"

যেদিন রাত্রিশেষে স্বামী তারাপুরে গুপ্তবেশে পলায়ন করেন, স্বামী বিছানা হইতে কখন উঠিয়াগিয়াছেন তাহা প্রেমদা জানেন না। প্রেমদা স্বপ্ন দেখিতেছেন; স্বামী গভীর রাত্রে গৈরিকবসনে প্রেমদাকে ফেলিয়া পলাইতেছেন। প্রেমদাও গৈরিকবসনে গহনা ফেলিয়া, পিছু পিছু যাইতেছেন। পিছুতে যে স্ত্রী আছেন, স্বামী আদতে জানেন না। গ্রাম ছাড়িয়া স্বামী যখন মাঠে পড়িয়াছেন, তখন পিছনে ফিরিয়া দেখেন প্রেমদা। স্বামী চমকিত হইয়া বলিলেন "একি! তুমি বউ মানুষ এরাত্রে কোথা যাও?"

প্রে। আমি যাদের কাছে বউমানুষ, তাদের কাহারও সঙ্গে সঙ্গে তো যাচ্ছি না। যাঁর সঙ্গে ইহকাল পরকালের সম্বন্ধ, যাঁর আমি অর্দ্ধাঙ্গ, তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

স্বা। আমি একলা যাইব, তুমি ফিরিয়া ঘরে যাও।

স্ত্রী। আমাকে লইয়া তুমি একলা, আমাকে ছাড়িয়া তুমি

আধখানা। তুমি যেখানে সেইখানে আমার ঘর। তুমি যদি ঘর ছাড় সে ঘর আমার বিদেশ। তুমি আমাকে ফেলিয়া যাবে কেন? আমার কি দোষ?

স্বা। আমি তোমাকে ভালবাসি না, তাই তোমাকে ফেলিয়া যাব।

স্ত্রী। আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমার সঙ্গে যাব।

স্বা। আমি যখন ভালবাসি না, তখন তোমাকে কিপ্রকারে সঙ্গে লইব বল?

প্রে। আমি সঙ্গে যাইতেছি, মনে না ভাবিতে পার।

স্বা। কি ভাবিব?

স্ত্রী। তুমিও পথিক আমিও পথিক। পথিকের সঙ্গে একজন পথিক সংসার অতিক্রম করিতেছে, এই ভাবিতে পার। বিদেশীর সঙ্গে কি বিদেশী পথ চলে না?

স্বা। শুধু সঙ্গে থাকিয়া কি লাভ?

স্ত্রী। কাছে কাছে থাকিয়া তোমার রূপ দেখিব, এই লাভ।

স্বা। তাহাতে তো পেট ভরিবে না।

স্ত্রী। পেটের জন্যই কি মানুষের জন্ম? পেট তো ইতর জন্তুরাও স্বচ্ছন্দে ভরায়।

স্বা। না খাইয়া মরিবে কেন?

স্ত্রী। তোমাকে না দেখিয়া মরা অপেক্ষা, তোমাকে দেখিতে দেখিতে অনাহারে মরা ভাল।

স্বা। বনে২ হয়তো আমি ফিরিব। বাঘেরমুখে হয়তো পড়িব।

স্ত্রী। ঘরে তোমার বুকে থাকিলে যে সুখ, গৃহের বাহিরে তোমার সঙ্গে থাকিলে সেই সুখ। বনে যদি পায়ে তোমার কাঁটা

ফোটে তো কাঁটা বাহির করিয়া যে সুখ পাব, তোমাকে ছাড়িয়া, ঘরে ফুলের বিছানায় সে সুখ পাব না। বাঘের মুখ দেখিলে, আগে আমি সে মুখে পড়িব, আমার দেহ খাইয়া শেষ না করিতে করিতে, তুমি সেই অবসরে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে।

স্বা। কিন্তু তোমাকে দেখিলে যখন আমার কষ্ট হয়, তখন তোমার ঘরে ফেরাই ভাল।

স্ত্রী। আমাকে দেখিলে যদি তোমার কষ্টই হয় তবে তোমাকে কষ্ট দেব না।

বলিয়া প্রেমদা মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বিছানায় স্বামী নাই। প্রেমদা ভাবিলেন "বোধহয়, গরমে বাহিরে গিয়াছেন"।

প্রাতঃকাল হইলে, রাজকুমারের দেখা না পাইয়া, চাকরেরা এবাটী ওবাটী, এদিক ও দিক খুঁজিতে লাগিল। সতীশ বাবু, বড়ই ভাবিত হইলেন। আকাশে বেলার সঙ্গে লোকের ভাবনা বাড়িতেছে। প্রেমদার যাতনা সকলের অপেক্ষা অধিক। সন্ধ্যা হইল, রাজপুত্রের সন্ধান পাওয়া গেলনা। সতীশ নিজে দুইজন দ্বারবান সঙ্গে তারাপুরের জন্য ট্রেণে উঠিলেন। ভোরে গাড়ি মল্লারপুর ষ্টেসনে থামিল। সতীশ পাল্কি করিয়া যাইতেছেন। দুই জন দ্বারবান অগ্র পশ্চাতে ছুটিতেছে। খানিক দূর গিয়াই পথে রাজপুত্রের দর্শন পাইলেন।

রাজপুত্র বামদেবের উপদেশানুসারে পুত্রের অন্নপ্রাসনের পর, বিষয়ের বন্দবস্ত করিয়া, প্রেমদার অনুমতি লইয়া, শ্বশুর খাশুড়ির অনুমতি লইয়া, চন্দ্রনাথতীর্থে যাত্রা করিলেন। বনলতার কথা আদতে ভাবেন না' ইহাই বড় আশ্চর্য্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

চন্দ্রনাথ তীর্থ।

"বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে,—এই শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, জ্ঞানদানন্দন একলা তীর্থস্থলে গুরুদর্শনে গেলেন। রেলগাড়িতে চাপিয়া চন্দ্রনাথ ষ্টেসনে পঁহুছিলেন। গাড়ি হইতে পাহাড়ের আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া, ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিলেন। যেন অসংখ্য মন্দিরের মালা পর্ব্বতাকারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রাজপুত্র গাড়ি হইতে নামিলে, পাণ্ডারা তাঁর আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া, মধুর কলসিতে মক্ষিকাদলের মত ঝুঁকিয়া পড়িল। এ বলে আমার বাড়িতে চলুন, ও বলে আমার বাড়িতে চলুন। রাজপুত্র কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, একবারে মোহান্তের বাড়িতে গেলেন। মোহান্ত আপনার বাটীতে সে মদনমোহনমূর্ত্তি দেখিবামাত্র, অতি যত্নে অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজকুমার একটী ভাল চেয়ারে বসিলেন, মোহান্ত আর একটী ভাল চেয়ারে বসিলেন।

মো। মহাশয়ের নাম ?

রা। আমার নাম বাটী সব পরে জানিতে পাইবেন। এখন আমাকে আগে একটী খবর দিন ?

মো। আপনার আকৃতিতে বড় লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাহউক কি খবর চান বলুন?

রা। এখানে তো অনেক সাধু সন্ন্যাসী থাকেন, আপনি কারে কারে চিনেন?

মো। চিনি তো অনেককে।

রা। এঁদের মধ্যে ভাল ভাল লোক যাঁরা তাঁদের কিছু পরিচয় দিন?

মো। এখানে সীতাকুণ্ডুতে একটী সাধু মাসাবধি বাস করিতেছেন। তিনি অনেকের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন। যাত্রীরা তাঁকে আগ্রহের সহিত দেখিতে যান। আমি দুইদিন গিয়াছিলাম।

রা। নামটী বলিতে পারেন?

মো। বামদেব স্বামী।

শুনিবামাত্র কুমারের চক্ষে জল আসিল। ভক্তিতে গদ গদ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "চেহারাটী কি প্রকার"?

মো। ঠিক তারামূর্ত্তি। দাড়ির জন্যই পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। চেহারাটী উগ্রতারামূর্ত্তির। প্রথমতঃ দেখিলে ভয় হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ করিলে আর ভয় থাকে না, ভক্তিতে গলিয়া যাইতে হয়। মদটা বড় বেয়াদা খান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মদে মদের গন্ধ নাই ফুলের গন্ধ, মদের স্বাদনাই পবিত্র চরণামৃতের স্বাদ। আমি নিজে খাইয়া দেখিয়াছি। এখানে তিনি কথাদ্বারা দুটি লোকের কুষ্ঠ আরাম করেছেন। সেইঅবধি লোকের বড় ভিড়হয়। ভিড়ের ভয়ে এখন অগ্নিকুণ্ডের মাঝ খানে যোগাসনে বসিয়া থাকেন। সে আগুণের কাছে দাঁড়াইলে, গায়ে ফোস্কা

পড়ে, কিন্তু তিনি শিবকৃপায়, নিরাপদে মিলিত চক্ষে বসিয়া থাকেন। তাঁর "রসিকানন্দ" নামে একটী শিষ্য আছেন। তিনি কুণ্ডের বাহিরে বসিয়া থাকেন। ইনিও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। ইহাঁর কাছেই এখন যত লোকের ভিড়। রোজ দুইশত টাকা, পয়সাতে, আহুলিতে, টাকাতে পড়িতেছে। শিষ্য সব গরিব দুঃখীকে দান করিতেছেন। যে যাহা চাহিতেছে সেই তাহা পাইতেছে। এই সব কথা শুনিতে শুনিতে রাজপুত্র ভক্তিতে কাঁদিতেছিলেন। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "সীতাকুণ্ড এখান হইতে কত দূর?"

মো। দেড় ক্রোশ।

রা। হাঁটিয়া যাইতে হয়?

মো। রেলে যাওয়া যায়। আজ চন্দ্রনাথ দর্শন করুণ, কাল সকালের ট্রেণে যাবেন।

রা। এখন কি ট্রেণ পাওয়া যাবে না?

মো। একঘণ্টা পরে একখানা গাড়ি পাবেন।

রা। আমি তবে এখনি ষ্টেসনে যাই। সাধু দর্শন আজই-করিব। তিনি যেমন আদেশ করিবেন সেইভাবে তীর্থসেবা করিব। রাজকুমার আর বিলম্ব না করিয়া, মোহান্তকে প্রণাম করিয়াই উঠিলেন। তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে হাঁটিয়া চলিলেন।

রাজকুমার চলিয়া যাইলে, মোহান্ত মনে মনে ভাবিলেন "চেহারা দেখিলে তো রাজারাজাড়া বলিয়া বোধ হয়—ব্যক্তিটা কে? রাজা যশোদানন্দনের মত চেহারা—তাঁরই ছেলে হবে না তো? কিন্তু এরূপ বেশেই বা আসিবে কেন?

রাজকুমার ষ্টেসনে গিয়াই গাড়ি পাইলেন। সীতাকুণ্ড ষ্টেসনে

নামিয়াই, দ্রুত বামদেবের আশ্রমে গেলেন, দেখিলেন যাহা, তাহা জীবনে দেখেন নাই। প্রকাণ্ড কাষ্ঠরাশি ধুধু করিয়া, জ্বলিতেছে, আর অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মে বামদেব তারা মার মত বসিয়া ধ্যানস্থ। অগ্নিকুণ্ড হইতে পাঁচ হাত দূরে মানুষের গোল প্রাচীর। সেই প্রাচীরের কাছে, একটী বড় বেল গাছের তলায়, বড় বেদীতে ব্যাঘ্রচর্ম্মে রসিকানন্দ বসিয়া একটি ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিতেছেন। সেখানে অনেক গুলি লোক দাঁড়াইয়া, বসিয়া, রহিয়াছে। রসিকানন্দের সম্মুখে টাকা, আদুলি, সিকি, দোয়ানি, পয়সা, আলু, বেগুণ, বেল, কলা, ক্রমাগতই পড়িতেছে। একজন কুষ্ঠ রোগী হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে।

রাজকুমার ভিড় ঠেলিয়া রসিকানন্দের কাছে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। কথাটা হইতেছে অবতার তত্ব লইয়া। রসিকানন্দ বলিতেছেনঃ—"কৃষ্ণ সত্য হউন বা মিথ্যা হউন, যদি কেহ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তো যিনি ভগবান তিনি কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁর উদ্ধার করিবেন। যদি কেহ গৌরাঙ্গকে বা রামকৃষ্ণপরমহংসকে অবতার বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে, তো, বিশ্বাসীর বিশ্বাসবলে অবতারত্ব ফুটিবে।

আসল কথা বিশ্বাস লইয়া। বিশ্বাসএকটি স্বতন্ত্র জগৎ। শক্তিরই একটী বিশেষ অবস্থা। বিশ্বাসের শক্তি সকল শক্তির উপরে। বিশ্বাসে "নাই" বলিলে "নাই," "আছে" বলিলে আছে"।

ভদ্র লোক কথা শুনিতে শুনিতে ভক্তিতে কাঁদিতেছেন। রাজপুত্র ভদ্রলোকের পিছনে দাঁড়াইয়া কথা শুনিয়া প্রাণে বড়

আরাম পাইতেছেন আর ভাবিতেছেন "বিশ্বাসে নাই" বলিলে নাই "আছে" বলিলে "আছে"—এ কথা অতি সত্য কিন্তু এ কথার Philosophy কি ?

হঠাৎ রাজকুমারের দিকে রসিকানন্দের দৃষ্টি পড়িল। রসিকানন্দ চমকিত হইয়া, "আরে আপনি এসেছেন ? বসুন—বসুন"। বলিয়া একটি মৃগচর্ম্ম বিস্তার করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ধুলাতেই বসিলেন।

র। বাটির খবর ?

রা। সব ভাল।

র। পুত্রের অন্নপ্রাসন হয়েছে ?

রা। অন্নপ্রাসনের পরই এসেছি।

র। একবারে এখানে ?

রা। চন্দ্রনাথের মোহান্তের বাড়িতে গিয়া, আপনাদের কথা শুনলাম, শুনিয়াই তখনি রওনা হইলাম। আগে জানিলে, বরাবর এখানে আসিতাম।

র। চন্দ্রনাথ দর্শন হয় নি ?

রা। গুরুদেবের আদেশানুসারে সব করিব।

র। আচ্ছা আমি তাঁকে বাতাস দি, বলিয়াই রসিকানন্দ চক্ষু মুদিলেন। দুমিনিট পরেই বলিলেন, এক ঘণ্টা পরে কুণ্ডের বাহিরে আসিবেন"।

রা। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?

র। মনে মনে টেলিগ্রাফ্ হয়।

রা। বড়ই আশ্চর্য্য! তখন সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন "বিজ্ঞানে তো এ সব কিছু বলে না"।

রা। একেবারে যে, বলে না তা নয়। একবার দুই জন বৈজ্ঞানিক পর্ব্বতের খুব উপরে উঠিয়া দুই জনের মনের ভাব দুইজনে বলিতে লাগিলেন, খানিকটা নীচে নামিয়া আর বলিতে পারিলেন না। আর বিজ্ঞান তো বিশ্বের অনন্ত ব্যাপার অধ্যয়ন করে নাই। গোটাকতক ব্যাপারের উপর উপর দেখিয়া এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছে মাত্র। তাও কতক ঠিক, কতক বেঠিক। পৃথিবীর স্থিরতা সম্বন্ধে টলোমির মত পনের শত বৎসর অভ্রান্ত সত্য বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়াছিল। তার পর এখন আর সে মত কে মানে? নিউটন যে সব কথা ঠিক করিয়াছেন, তাহাদেরও অনেক ভুল বাহির হইয়াছে।

ভ। এই যে সব কল কারখানার আবিষ্কার হইতেছে, এ সব তো বৈজ্ঞানিকেরাই করিতেছেন?

রা। বৈজ্ঞানিকরা উপলক্ষ মাত্র, করাচ্ছেন আর এক জন। বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রে শক্তিরই কার্য্য। বৃষ্টির জল বাঘমুখো নল দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া যখন পড়ে, তখন শিশু ভাবিতে পারে—জল বাঘ মুখো নলের। কিন্তু বয়স্কের জ্ঞান অন্য রকমের। বয়স্ক জানে বৃষ্টির জল ছাদে পড়ে, সেই জল নল দিয়া নীচে পড়ে। সেইরূপ মহা চৈতন্যের ভাব, ভাবুকের মন দিয়া, মুখ দিয়া বা কলম দিয়া বাহির হয়। বৈজ্ঞানিক নিজে একথা স্বীকার করেন, যে, কোন বিষয়ের মীমাংসায় যখন কাতরতা ঊর্দ্ধতম সীমায় উঠে, প্রাণ যাতনায় পাগলের মত হয়—তখন ধাঁ করিয়া সত্যের জ্যোতি মন প্রাণকে আলোকিত করে—তখন ভাবময়ী ভাষার নীরব বজ্র ধ্বনিতে সব অন্ধকার দূর হয়—কেমেন্ বুদ্ধির মধ্যে চুপে চুপে বজ্রগম্ভীর রবে কথা কহে। মহাভাবুক লেখক এমর্সণ

এ বিষয়টী বড় সুন্দর কথায় বুঝাইয়াছেন। তিনি ইহাকে inner whisper (ভিতরে চুপি চুপি কথা)" বলিয়াছেন। মহা কবির সৌন্দর্য্য প্রবাহ এই পথে—মহাবীরের ব্যূহ রচনা বা সৈন্য-চালনাও এই পথে। নেপোলিয়ন নিজে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই সক্রেটিসের স্বর্গীয় নেতা (Genious)। ইহার কথাতেই সক্রেটিস সত্যের জন্য হাসিতে হাসিতে বিষ পান করেন। যে মানুষ এই "চুপি চুপি কথা" শুনেন, তিনিই মহাপুরুষ—প্রতিভাশালী। এই যে ভাব প্রবাহ, ইহা প্রকৃতির একটী গ্রাম। ইহাই বাণীর দেশ—মা স্বরস্বতীর রাজ্য। এখানে মানুষ যখন উঠে, তখন আর পুস্তক পড়ার দরকার থাকেনা। মানুষ এখানে উঠিলে অভ্রান্ত হয়। নিউটন, গ্যালিলিও, এই থানকার কথা শুনিয়া বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কালীদাস, সেক্সপীয়র এই দেশ হইতে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ ধরিয়া সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন। কঠ, কেন, প্রভৃতি ঋষিরা এই থান হইতে উপনিষদের রচনা করিয়াছেন। ব্যাস, বুদ্ধ, যীশু এই বিদ্যালয়ে পড়িয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মাচার্য্য হইয়াছেন।

র। মহাশয়ের ভাবগুলি অতি সত্য। গুরুদেব ঐ কথা অনেক বার বলিয়াছেন। আমি এখন ঐ কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কথা কহিতে কহিতে রসিকানন্দ হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইলেন। রাজকুমার চাহিয়া দেখেন, বামদেব পিছনে দণ্ডায়মান। অমনি সমস্ত লোক লুণ্ঠিত হইয়া "বামদেবকে" প্রণাম করিলেন। বামদেব রসিকানন্দের আসনে বসিলেন। রসিকানন্দ ভূমে বসিলেন।

বা। বাবা! তুমি যা বলছিলে তা সত্য। প্রকৃতির ভিতর দেখিবার চক্ষু তোমার ফুটেছে। এই ক্ষমতাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য

পাণ্ডিত্যের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। লোকে মনে করে ঋক্, যজু, সাম, ও অথর্ব্ব এই চারি পুস্তকের যে ভাষা তাহাই বেদ। বেদের ভাষা যে সব ভাবের প্রকাশক, সেই সব ভাব প্রকৃতির এক রাজ্যের অন্তর্গত। বাবা ভূগোলে পড়েছ "সাহারা"—ম্যাপেও তার চিত্র দেখেছ; কিন্তু "সাহারা" চক্ষে নাদেখিলে কি সাহারার প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে? প্রেম যার না হয়েছে সে কি প্রেমের শাস্ত্র বুঝিতে পারে? আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা যে, প্রকৃত বস্তু না দেখে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়। এই জন্য যার যেমন রুচি ও বিদ্যা সে তেমনি ব্যাখ্যা করে। রসিক বাবা! তোমার সেই ভূদেব বাবুর গল্পটা বলতো?

র। যখন জগৎবল্লভপুরের স্কুলে 'সেকেণ্ডবুক" পড়ি, তখন আমার বয়স ১২ কি ১৩ বৎসর। ক্লাশে ১৫।১৬ জন ছাত্র, ভূদেব বাবু তখন স্কুল ইনেস্পেক্টর, তিনি স্কুল দেখিতে এসেছেন। আমাদের ক্লাশ দেখছেন, ব্যাকরণের পরীক্ষা হচ্ছে, প্রশ্ন করেছেন "অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে "ঐ" স্থানে কি হয়? আমরা কেহই উত্তর করতে পাচ্ছি না। ছেলে মানুষ—পাড়া-গেঁয়ে, ভূদেব বাবু গম্ভীর মূর্ত্তিতে চেয়ারে বসেছেন, হেড্ মাষ্টার যমমূর্ত্তিতে গোঁপে তা দিচ্ছেন, দাড়ি মোচড়াচ্ছেন, সেক্রে-টরী মহাশয়—গ্রাম্য জমিদার তিনি দাড়ি ও ভুঁড়িতে ঘড়ির চেনের বাহার দিয়ে আমাদের দিকে কটমটয়ে চেয়ে আমাদের পেটের বিদ্যা ভস্ম করছেন, আর পণ্ডিত মশাই আমরা কেউ কিছু বলতে পারছিনা বলে রেগে চক্ষু দিয়ে, আগুণ বার করছেন আমরা ১৫।১৬ জন ছেলে ভয়ে কাঁপছি, পণ্ডিত মহাশয় "তুমি বল" "তুমি বল" শব্দে যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছেন, তার

বুকের টিপ্ টিপিনিতে বাক্‌রোধ হয়ে আসছে, এ অবস্থায় বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌তে হয়, তার উপর আবার সরস ব্যাকরণের সরস প্রশ্নের উত্তর, কেউতো বলতে পারছেনা; পণ্ডিত রাগে ভয়ে কাঁপছে, আর অঙ্গুলি বা বযদণ্ড নির্দ্দেশে' 'তুমি'—'তুমি" করে "তুমির" কচি "তুমির"কে মুচড়ে ফেলছে; এমন সময়ে অশ্লেষা মঘার শুভ দৃষ্টিতে পণ্ডিত মহাশয়ের উপস্থিত বুদ্ধির প্রকাশ হল। উত্তরটি পণ্ডিত মহাশয়ের গলাতেই বিধাতা কৃপাগুণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের গলদেশে একটি বৃহৎ "আব্" ছিল। অসমান স্বর পরে থাকিলে "ঔ" স্থলে "আব্" হয়, আমরা তাহা ভুলিয়াছিলাম। উপস্থিত ও অনুপস্থিত বুদ্ধির জোরে গলার "আব্" এর কথা পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হইল, আর অমনি শিকার বধের মত শশ-ব্যস্তে পণ্ডিত মহাশয় জামার বোতাম খুলিয়া, এক দিকে চাদরের দেয়াল দিয়া, (ভুদেব বাবু, হেড্ মাষ্টার কি সেক্রেটরি না দেখিতে পান) অপর দিক ছাত্রদিগের চক্ষের দিকে খুলিয়া সেই ব্যাকরণপ্রশ্নের সাকার উত্তরটি বাম হাতে ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে এক একটি ছাত্রের দিকে ইসারা দ্বারা "তুমি ? তুমি ? বলিতেছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সে "নেত্র কোণার" টেলিগ্রাফ্‌টা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে, রামচন্দ্র ঘোষ নামক কোন বুদ্ধিমান ছাত্র (সে প্রত্যহ লাষ্ট থাকে) বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পণ্ডিতের দিকে চাইতে চাইতে, পণ্ডিতের মৃতপ্রায় জীবনে প্রাণ-ধারা সিঞ্চিয়া বলিতেছেন "আমি বলবো—আমি বলবো"। পণ্ডিত অমনি চতুর্গুণ উৎসাহে বলিতেছেন "আরে বল্ বল্—এত করে শেখাই কেউ বল্‌তে পারিস না"। তখন রামচন্দ্র ঘোষ অতি

দ্রুতগতিতে উত্তর করিল "অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে "ঔ" স্থলে "গলগণ্ড" হয়, সর্ব্বনাশ আর কি। ছাত্র "আব্"কে "গলগণ্ড" বলিয়া ঠিক কথাই বলিয়াছিল; এবং বলিতে বলিতে একটা পুরস্কারের বা বাহবার প্রত্যাশায় আশ্বাসিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভূদেব বাবু, হেড্ মাষ্টার, সেক্রেটরি ও অন্যান্য ছাত্রদের ভীষণ হাস্য ধ্বনিতে (রামচন্দ্র ঘোষ ধপ্ করিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া মুখ হেঁট করিয়া থাকিল) পণ্ডিত মহাশয়ের আত্মা-পক্ষী ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দে দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলায়নোদ্যত হইয়াও পলায়ন করিল না, পণ্ডিতের ব্যাকরণ বোধের সেই সাকার মূর্ত্তি "আব্" পৃথিবীর বায়ুতে মিশিয়া যায় না অথবা পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হয় না, যদি পৃথিবী কৃপা করিয়া স্থান দিতেন তো পণ্ডিত মহাশয় তৎক্ষণাৎ সীতা দেবীকে স্মরণ করিতে করিতে পাতালে মহীরাবণের সভাসদের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিতেন, কিন্তু কেহ তাঁকে কৃপা করিলেন না, পণ্ডিত মহাশয় চাকুরি যাবার ভয়ে বলিদানের পাঁটার মত থর্ থর্ কাঁপিতেছেন।

র। তোমরা বাবা হেস না, এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের শাস্ত্র ব্যাখ্যাও ঐরূপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দুর্দ্দশাতেই দেশের অধঃপতন হয়েছে, এঁরা প্রকৃতি ভুলিয়া কৃত্রিমতার দাস হয়েছেন।

তার পর বামদেব রাজকুমারকে বলিলেন, আজ বাবা চন্দ্রনাথ যাও, মোহান্তের বাড়িতে থাকগে, কাল চন্দ্রনাথ বিরূপাক্ষ চন্দ্রশেখর দর্শন করে পরশু এখানে আসবে, পরশু খুব ভাল দিন, ঐ দিনে তোমায় অন্য স্থানে লয়ে গিয়ে দীক্ষা দেব।

বামদেবও রসিকানন্দকে প্রণাম করিয়া রাজকুমার চন্দ্রনাথের মোহন্তের বাড়িতে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

উরোপীয় জ্ঞান ও ভারতীয় জ্ঞান।

পরন্ত দিন ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাজপুত্র গুরু স্থানে চলিলেন, গুরু তাঁকে এবং রসিকানন্দকে সঙ্গে করিয়া ১২।১৩ ক্রোশ দূরে যাত্রা করিয়া সমুদ্র তীরে কয়েকটী পাহাড়ের কাছে পঁহুছিলেন।

চারিটি পাহাড় পর পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, প্রথম দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ উপত্যকায় রাজপুত্রকে বামদেব লইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

উপত্যকার ভিতর যাইতে যাইতে, বামদেব বলিতেছেন, বাবা যোগবলই প্রধান বল, ভারতের ইহাই সম্বল, এই শক্তিতেই ভগবান জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। উরোপীয়রা যে বিজ্ঞান শক্তির এত গর্ব্ব করেন উহা যোগবলের কাছে কিছুই নহে। উরোপের গোলা গুলির শক্তি আর সিংহের নখ দাঁতের শক্তি একই বস্তু। পাশব বলে উরোপ কতদিন টিকিবে? ভারতের কৃপায় উরোপে যোগবলের সামান্য উন্মেশ হইতেছে। ভারত এই বলের জননী। ভারতে এ বলের যত উৎকর্ষ হইবে, অন্য কোথায় তাহা হইবে না। কারণ ভারতে হিমালয় পর্ব্বত আছে। ছয়টা ঋতু আছে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আছে। উরোপে ভারতের

মত বড় পর্ব্বত নাই। ষড় ঋতু নাই। সকল বস্তু নাই। গঙ্গা যমুনার মত রোগবীজহীন নদী নাই। মানুষের মনের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ বশতঃ যে মানসিক উন্নতির সুযোগ, তাহা যেমন ভারতে আছে, তেমন পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ভারত মানে ইংরাজী ভূগোলের ভারত নহে। ভারত বলিলে এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ এবং ওদিকে কাবুল, বেলুচিস্থান, তিব্বত এবং আসিয়িক রুশিয়া পর্য্যন্ত বুঝায়। পৃথিবীর সকল বস্তুর সমাবেশ ভারতে আছে বলিয়াই মানুষের সর্ব্বপ্রকার শক্তির পূর্ণ বিকাশ ভারতেই সম্ভব। ভারত উরোপ অপেক্ষা কিসে হীন বল?

রা। বিজ্ঞানে নয় কি?

বা। বাহ্য বিজ্ঞানের উন্নতি ভারতে যাহা হইয়াছিল, উরোপে তাহার কিছুই হয় নাই। এখনও আমরা সোণা তৈয়ার করিতে পারি। যে সোণার জন্য উরোপীয়রা ধর্ম্ম ভুলিয়া আকাশ পাতাল অসুরের মত তোলপাড় করিতেছে; মনুষ্য রক্তে পৃথিবীকে কলুষিত করিতেছে, সে সোণা আমরা তৈয়ার করিতে পারি। মিশ্রণেই বিজ্ঞানের শক্তি। কিন্তু কোন বস্তুর সৃষ্টি কি বিজ্ঞান করিতে পারে? আমরা সৃষ্টি করিতে পারি। ধরণা কেন—আয়ুর্ব্বেদ এত হীনাবস্থা হইয়াও ইহাতে যে সব ঔষধ আছে সেরূপ ঔষধ উরোপীয় চিকিৎসায় নাই। ধাতুর ব্যবহার কবিরাজ মহাশয়েরা যেরূপ জানেন উরোপীয় চিকিৎসকেরা তাহা জানেন না। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আমাদের কত পুঁথি, কত বিদ্যা, প্রচারের অভাবে এবং মুসলমানের অত্যাচারে নষ্ট হইয়াছে।

রা। এই যে টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, রেলগাড়ি এ সব কি আমাদের আগে ছিল?

বা। এখন বাহ্য টেলিগ্রাফ হইয়াছে। তখন অন্তর টেলিগ্রাফ ছিল। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংবাদ যে টেলিগ্রাফে পাইয়া অন্ধ রাজাকে শুনাইতেন, সে টেলিগ্রাফশক্তি কি এই বাহ্য টেলিগ্রাফ অপেক্ষা ভাল নয়। হিন্দুরা ভিতর লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না। কারণ তাঁরা জানিতেন আগে ভিতর, পরে বাহির।

রা। সে যুদ্ধসংবাদ কেবল রাজা এবং রাজপরিবারস্থ লোকেরাই জানিতে পাইতেন কিন্তু বাহিরের লোকেরা তো জানিতে পাইতেন না। এখনকার টেলিগ্রাফে সকল লোকেরাই সংবাদ পায়।

বা। তখন যেরূপ দেশ ও সমাজের ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সকল লোকের যুদ্ধ সংবাদ জানা দরকার ছিল না। তখন দেশ রাজ্যতন্ত্রের ছিল প্রজাতন্ত্রের ছিল না, প্রজা শক্তি একটা স্বতন্ত্র শক্তি ছিল না। রাজা যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। রাজারা সিদ্ধ পুরুষদিগের দ্বারা চালিত হইতেন। রাজার পাপ চাপা থাকিত না। কারণ অন্তর টেলিগ্রাফ বশতঃ ঋষিরা তাহা জানিতে পারিতেন। জানিবা মাত্র ঋষি আসিয়া রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতেন। এখনকার টেলিগ্রাফ বাহিরের সংবাদ লেজা মুড়া বাদ দিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া প্রকাশ করে। তখনকার অন্তর টেলিগ্রাফ অসত্যের হাওয়া পাইলে কাজ করিতে পারিত না। কারণ মন নির্ম্মল যার নয়, সে কখনও ভিতর দেখিতে পাইবে না। সুতরাং তখনকার অন্তর টেলিগ্রাফে খাঁটি সত্যটি জানা যাইত। ইহাতে রাজনীতির গূঢ়ত্ব ও গাম্ভীর্য্য সবই বজায় থাকিত। তখন সিদ্ধ ঋষিরাই দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজারা তাঁদের

ভৃত্য ছিলেন মাত্র। রাজ্যমধ্যে যেখানে যা সদসৎ অনুষ্ঠান, মন্ত্রণা হইত বা হইবার সম্ভব হইত, তাহা ঋষিরা অন্তরতারে অভ্রান্ত রূপে জানিতে পারিতেন। এখন যাঁহারা রাজ্যের নেতা, তাঁহারা কি দেশের সদসৎ ব্যাপার বাহ্য তারে বা বাহ্য সংবাদ পত্রে অভ্রান্ত রূপে জানিতে পারেন? কখনই নহে। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন্ টেলিগ্রাফ ভাল। হিন্দুদের এই টেলিগ্রাফ্ এখনও আছে—তবে ইহা দ্বারা রাজ্য শাসন হয় না। আর যুদ্ধের সংবাদ বা বর্ণনা সকলের জানা ঠিক নয়। মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির কথা এখন বালক বালিকারা পর্য্যন্ত পড়িতেছে। ইহাতে বিশেষ কুফল হইতেছে। ঐ সব পড়িয়া কচি মনে কাটা কাটি মারামারির ভাব প্রবল হইতেছে। দেশ আসুরিক ভাবে উৎসন্ন যাইতেছে। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ব্যবহারে কেবল সাত্ত্বিক ভাবেরই বৃদ্ধি হইত, রাজসিক ও তামসিক ভাব নিস্তেজ হইয়া যাইত।

রা। হায়! হায়! আমরা কি ছিলাম কি হলাম! এত বড় সভ্যতার তুলনায় উরোপীয় সভ্যতা বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বা। উরোপীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের "অকাল কুষ্মাণ্ড" ইংরাজি শিক্ষিতেরা তাহা বুঝেন নাই।

রা। এনিবেসন্তের মত অদ্বিতীয়া ইংরেজ মহিলারা যাবনিক আহার ছাড়িয়া হিন্দুর পবিত্র আহার অবলম্বনে জীবন সার্থক ভাবিতেছেন; আর আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের পুত্রীরা পেয়াজ রসুন ওক্যাকড়ার শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমাদের আর উন্নতি কিহবে ?,

বা। আমাদের মানেকি বাবা ? যাহারা মানেনা তাঁহারা উৎসন্ন যাচ্চে কেন যাচ্চে, দেখনাকেন ? যারা ইংরাজী চালচলেন তাঁদেরই নানা রোগ, আর যারা ঠিক প্রাচীন অনুষ্ঠানে আছে তারা অধিকাংশই নিরোগ দেহে দীর্ঘজীবী হচ্ছে।

রা। আচ্ছা আমাদের যদি বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছিল তবে ক্ষীর সমুদ্র সুরা সমুদ্র ইক্ষু সমুদ্র প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের কথা পুরাণে আছে কেন ? ওসবতো মিথ্যা।

বা। মিথ্যা কে বলিল বাবা ? উরোপীয় ভূগোলবেত্তারা বলেন নাই তাই। যদি লবণ সমুদ্র সত্য হইতে পারে তো সুরা সমুদ্র সত্য না হবে কেন ? যদি জল হ'তে লবণ পাওয়া যায়; তো জল হতে চিনি পাওয়া যাবেনা কেন ? আর চিনি তো জল হতেও পাওয়া যায়। তুমি বলিতে পার উরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ স্বীকার করেন নাই। উহারা আগে ভূত স্বীকার করেন নাই এখন করিতেছেন। সেই রূপ পুরাণোক্ত সপ্ত সমুদ্র এখন স্বীকার করিতেছেন না ; কিছু কাল পরে যখন দেখিবেন, তখন স্বীকার করিবেন।

রা। পুরাণোক্ত সপ্ত সমুদ্র যে বাস্তবিক আছে তার প্রমাণ কি ?

বা। আমাদের শাস্ত্র বলেন পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। এক একটী দ্বিপ অণ্ডাকৃতি। লম্বালম্বি ভাবে একটী ডিম্বের পর আর একটী ডিম্ব পর পর রাখিলে যেরূপ বিন্যাস হয়, সেইরূপ বিন্যাসে সাতটী দ্বীপে পৃথিবী রহিয়াছেন। আমরা যে দ্বীপে আছি তাহার নাম লবণ সমুদ্র বেষ্টিত 'জম্বু' দ্বীপ। এই রূপে সাতটি সমুদ্রে সাতটী দ্বীপ আছে। তাহা হইলেই উত্তর দক্ষিণ দিকেই পৃথিবীর দৈর্ঘ, এবং পূর্ব্বপশ্চিম দিকে পৃথিবীর বিস্তার। উরোপীয়

পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে পূর্ব্বপশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। সুতরাং আর কয়টি দ্বীপ কিপ্রকারে দেখিবেন। কেবল জম্বুদ্বীপটাই পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাঁরা লবণ সমুদ্রের খবরই রাখিলেন। উত্তর দক্ষিণে পৃথিবীকে কি বেষ্টন করিতে পারিয়াছেন? আগে উত্তর দক্ষিণে বেষ্টন করিয়া আসুন। তখন যদি বলেন লবণ সমুদ্র ভিন্ন আর সমুদ্র নাই তখন আমাদের শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিব।

রা। আপনি বড়ই প্রামাণিক কথা বলিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কেহ কি সপ্ত সমুদ্র দেখিয়াছেন!

বা। বাবা! দেখিয়াছি তাইবলিতেছি এবং তোমাকে দেখাইব বলিয়াই বলিতেছি। সেখানে বড় শীত বাবা! এ স্থূল দেহে আমরা যাইতে পারিনা। আমার গুরু স্থূল দেহে গিয়াছেন। আমাকে সূক্ষ্ম দেহে লইয়াগিয়াছিলেন। তোমাকে সূক্ষ্মদেহে আমি লইয়া যাইব।

রা। আমার এমন কি সৌভাগ্য হবে?

বা। তোমার খুব সৌভাগ্য বাবা!

রা। আপনার গুরুদেব কোথায় থাকেন?

বা। তিনি মানস সরোবরের তীরে থাকেন বাবা! তাঁকে তুমি এখনি দেখিবে।

রাজকুমারের দেহে রোমাঞ্চ হইল। গদ্ গদ্ ভাবে জিজ্ঞাসিলেন "তাঁর নাম"?

বা। তাঁহাকে সকলে "মানস সরোবরের পরম হংস" বলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে আমাকে এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ইনি দীক্ষা দিয়াছেন।

রা। বিজয় বাবু তো ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি কি আবার "মন্ত্র" লইয়াছিলেন।

বা। তিনি যোগ বল প্রত্যক্ষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন, তিনি যা যা দেখিয়াছিলেন তুমিও তাই তাই দেখিবে।

রাজকুমারের চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

বা। বাবা! তুমি বড় সত্যবাদী—ধর্ম্মপিপাসু পণ্ডিত, তাহাতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তুমি এইসব দেখিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইবে। তার পর ঘরে ফিরিয়া যোগধর্ম্ম ভারতে মুখে এবং লেখায় প্রচার করিবে, শুধু ভারতে নহে। চীন, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মনি এই সব দেশে যোগধর্ম্ম প্রচার তোমাদ্বারা ভগবান্ করাইবেন। তুমি যে এত ভাষায় পণ্ডিত হইয়াছ সে পাণ্ডিত্য এই বার সার্থক হইবে।

যখন এই সব কথা শুনিতেছিলেন তখন যুবার শীরায় রক্ত স্রোতে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল—প্রাণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উৎসর্গ করিতেছিলেন এবং ভারতের প্রধান সম্পত্তি যে "যোগ বল" তাহাকি আয়ত্ত করিতে পারিব;—এই ভাবিয়া কাঁদিতে ছিলেন।

বামদেব হঠাৎ দাঁড়াইয়া কাহাকে প্রণাম করিলেন। রসিকানন্দও প্রণাম করিলেন। রাজকুমার শেষে এক জটাজুট বিভূষিত ঋষিমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিলেন—[কারণ উলঙ্গ মূর্ত্তিতে এমন গম্ভীর্য্য ও তেজ কখনও দেখেন নাই]—তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে তৃণপূর্ণ ভূতলে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

যোগবল।

সেই ঋষিমূর্ত্তির কাছে বামদেব বসিলেন। রাজপুত্র ও রসিকানন্দ উহাঁদের সম্মুখে বসিলেন। জ্যোৎস্নায় ঋষিমূর্ত্তি কুটীর শোভায় রাজপুত্র যাহা সম্ভোগ করিলেন তাহা সমস্ত জীবনের সাধনারই উপযুক্ত। অনেক কথোপকথন হইল। তন্মধ্যে আমরা এই কয়টী পাইয়াছি :—

ঋ। মহামায়াকে না পাইলে মায়া কাটিবেনা। বিদ্যামায়া-দ্বারা অবিদ্যামায়াকে কাটাইতে হইবে। মহামায়া সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি বা রূপ। এইরূপ দেখিলে অবিদ্যা মায়া কাটে। মহামায়ার ভিতর দিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মা কোটি কোটি বিষ্ণু, ও কোটি কোটি মহেশ্বর বাহির হইয়া তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। তিনিই আদর্শ মূর্ত্তিতে মানুষ, দেবতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদকে বিকশিত করিতেছেন। মানুষ তাঁহাকে আপনার আদর্শ মূর্ত্তিতে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হন। কখনও মা, কখনও বাবা, কখনও সখা, কখনও পুত্র বা কন্যা, কখনও স্ত্রী বা স্বামী ভাবে আলাপ করিয়া শান্তিলাভ করেন। কখনও ঐ সমস্ত ভাবগুলি একত্র করিয়া মানুষ তাঁহাকে সম্ভোগ করেন—ইহাই রাধা ভাব বা মধুর ভাব”।

"এই আদর্শমূর্ত্তির দর্শন পাইলে আর তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সাধকের স্পৃহা হয় না। জ্ঞানীরা অদৃশ্যভাবে এই মহামায়ার কৃপায় তুরীয় ব্রহ্মে লীন হয়। তুরীয় ব্রহ্মে লীনতাই মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের ভাব। তুরীয় ব্রহ্মভাব অচিন্ত্য বস্তু। তাঁর সাধন, ভজন, পূজা, আরাধনা, স্তব, স্তুতি অসম্ভব। তাঁহাতে রস নাই, রূপ নাই, শব্দ নাই অথচ সবেরই সম্ভাবনা আছে।"

"আমরা, তুরীয় ব্রহ্মের যে সচ্চিদানন্দময় রূপ, সেই রূপসাগরে ডুবিয়া আনন্দে বিভোর থাকি এবং শিষ্যদিগকে সেইরূপ দেখাইয়া দি। তোমাকে সেইরূপ ধরিতে হবে। সেই পথের দীক্ষা তোমায় আমরা দেব। দীক্ষা দেবার আগে তোমায় কিছু যোগবল দেখাইব এবং যোগবলে বলী করিব"।

পর দিন প্রাতে বামদেব এবং তাঁর গুরুদেব রাজকুমারকে যোগ দেখাইবার জন্য পাশাপাশি বসিলেন। বামদেব বলিলেন "বাবা তুমি যোগশাস্ত্রে পড়িয়াছ যোগীর দেহ কত লঘু হইতে পারে। আমরা দুই জনে বসিয়াছি, এইবার দেখ, এই দেহকে আকাশের মেঘের উপরে উত্তোলন করিব"।

রাজকুমার আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছেন, দুটী দেহ ঈষৎ কাঁপিতেছে; কাঁপিতে কাঁপিতে জলে ভাসা জিনিসের মত দুলিতেছে দুলিতে দুলিতে মাটীর উপরে উঠিল—দুই আঙুল উপরে উঠিয়া যেন ভাসিতে লাগিল—একবার এদিকে একবার ওদিকে ভাসিতে লাগিল। ভাসিতে ভাসিতে একবারে একহাত উপরে উঠিল। উঠিয়া আবার এদিকে ওদিকে ভাসিতে লাগিল। তারপর শাঁ করিয়া একবারে তালগাছের মাথার কাছে গিয়া স্থির হইল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া এদিকে ওদিকে না ভাসিয়া শাঁ করিয়া একবারে

পাহাড়ের মাথার কাছে উঠিল। সেখানে একটু থামিলে একটা চিল উড়িতে উড়িতে বামদেবের মাথায় বসিল। একটা পক্ষী দুটী দেহের আশে পাশে, উপরে নীচে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। দেহদুটী অল্পক্ষণ পরে দুলিতে দুলিতে ক্রমাগত উপরে উঠিতে থাকিল। উঠিতে উঠিতে মেঘের সঙ্গে মিশিয়া গেল—আর দেখা যায়না।

রাজকুমার রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সময় গ্যাসে গ্যাসে মিশাইয়া কত আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃত অগ্নি শিখা সতত সমভাবে জ্বলিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সীতাকুণ্ড প্রস্রবণে জলের উপরে সতত প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগীদ্বয়ের মানবদেহে বেলুন যন্ত্রবৎ কার্য্য দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভক্তি ও বিস্ময়ে ডুবিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি চক্ষে আনিয়া, আত্মসব ভুলিয়া, কেবল ঐ দেহ দুটী দেখিতে লাগিলেন।

দেহ দুটী মেঘে মিশিয়া গেলে, আর দেখিতে না পাইয়া, ভীত হইয়া রসিকানন্দের দিকে চাহিলেন। রসিকানন্দকে জিজ্ঞাসিতে গিয়া, ভাববশে কথা বাহির হয় না। অনেক কষ্টে আবেগ চাপিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসিলেন "আর যে দেখা যায় না"।

রসিকানন্দ অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন "ভয় নাই, এখনি নীচে আসিবেন। ঐযে যেন দুটী দাগ দেখা যাইতেছে না ?

রাজকুমার অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন" দাগ দুটী ক্রমশঃ বড় হইতেছেনা ?

র। হাঁ—এইবার দেখুন ঐ মেঘ খানা যেন দাগ দুটীকে ঢাকিতেছে।

রা। ঐ যা! মেঘে একবারে ঢাকিয়া ফেলিল—এখন উপায়?

র। মেঘ হইতে একটু যেন আলাদা হইয়াছে দেখিতেছেন কি?

রা। বোধহয় দুটী শকুনি নী নী করিতেছে।

র। না—না ঐযে দেখুন না—একটা দাগ অনেক তফাতে গিয়াছে।

রা। হাঁ—হাঁ এইবার স্পষ্ট দেখিতেছি, গোলাকার ক্রমশঃ লম্বা হইতেছে।

র। ঠিক্ ঠিক্—এইবার যেন মাথা ও বুক স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

রা। মাথা, বুক্, হাত, পা স্পষ্ট বোধ হইতেছে—নিশ্চয়ই নীচে আসিতেছেন।

র। গুরুদেব নীচে, আর মহর্ষি একটু বোধহয় উপরে।

দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিদুটী অনেক নীচে নামিল। কয়েকটা ক্ষুদ্র পাখী দেহ দুটীর তলা দিয়া, পাশ দিয়া, মাথার উপর দিয়া, উড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। সেই চিলটী বামদেবের মাথায় যেমন তেমনি বসিয়া আছে, এখন মাটীতে বোধহয় মানুষ দেখিয়া, হুস্ হুস্ করিয়া উড়িয়া গেল।

তাঁহারা মাটীতে নামিলেন। দুইজন দুই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে রাজপুত্রকে বামদেব বলিলেন "বাবা! এই দেহ কত হালকা হইয়াছিল দেখিয়াছ। আবার কত ভারি হইতে পারে, একবার পরীক্ষাদ্বারা দেখ। আমরা এই যোগাসনে বসিয়াছি, তোমরা দুজনে ধরিয়া আমাদের একটী আঙুল নাড় দেখি?

রাজকুমার ও রসিকানন্দ বামদেবের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ধরিয়া

প্রাণপণে নাড়িতে চেষ্টা করিলেন, আঙুলটী যেন দশমণ লোহা—একটু নড়িলনা।

বা। আচ্ছা বাবা। মাথার একগাছা চুল নড়াও দেখি?

দুইজনে ধরিয়া কস্তাকস্তি—তদ্রূপ, দশমণ লোহা। রাজকুমার ভাবিতেছেন "আমি এসব কি দেখিতেছি! যেন স্বপ্ন বোধ হইতেছে"! মুখ চোখ রগড়াইয়া আপনার ধাত্ দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন "এ সত্য বস্তুই দেখিতেছি! আহা! জীবন আজ ধন্য"!

ভাবিয়া ভক্তিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছেন হায়! হায়! যে ভারতে এমন সব লোক, সে ভারতের এত দুর্দ্দশা কেন?

রাজকুমারের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহর্ষি বলিলেন "বাবা! পঞ্চপাণ্ডবের মত বীর কোথাও হইয়াছিল?"

রা। না।

ঋ। শক্তি বলের অভাব ছিল?

রা। না।

ঋ। তবে অত দুর্দ্দশা হইল কেন?

রা। অদৃষ্ট।

ঋ। অদৃষ্টের দুঃখভোগ কি মঙ্গল জনক নয়?

রা। মঙ্গল জনক।

ঋ। অত দুঃখভোগ না করিলে, বীরের বীরত্ব বা ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব ফোটেনা। ভারতবর্ষ পঞ্চপাণ্ডবের পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, এদুর্দ্দিন থাকিবেনা। বিরাট ভবনে যেমন পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মবেশে নীচলোকের মত জীবনপাত করিতেন, ভারতবর্ষ সেইরূপ নীচ-

লোকের মত ইংলণ্ডের আশ্রয়ে জীবনপাত করিতেছেন। নীচ-লোকেরমত থাকিয়া ভারত ইংলণ্ডের অনেক উপকার করিবে। শুধু ইংলণ্ডের নয় সমস্ত উরোপের উপকার করিবে, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মত ধার্ম্মিকা মহারাণী কি উরোপে এপর্য্যন্ত দেখিয়াছ? ইহাঁর রাজত্বে যেমন ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—এমন কি উরোপে কোথাও হইয়াছিল? এই ভারতেশ্বরী কে? ইনি আমাদের সেই মহাসতী চিতোর পদ্মিনী। ইহাঁকে ভারতের মহান্তরা "চিতোর পদ্মিনী ভিক্টোরিয়া" বলিয়া পূজা করেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমারের শরীর কণ্টকিত হইল, চক্ষু সজল হইল।

ঋ। বাবা প্রকৃত পক্ষে ভারত এখনও পরাধীন নয়। ইংরেজের অধীনে যত দিন থাকিবে তত দিন ভারত একপ্রকার স্বাধীন।

রা। বুঝিতেছিনা।

ঋ। বাবা! মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন আমাদের হিন্দুসতী বিদেশিনীর রক্তমাংসে গিয়া আমাদের রাণী হইয়াছিলেন সেইরূপ এড্‌ওয়াডও একজন হিন্দুমহাপুরুষ বিদেশীয় রক্তমাংসে গিয়া আমাদের রাজা হইয়াছেন। এইরূপ হিন্দু ইংরেজ রাজা বা রাণী যত দিন চলিবে তত দিন ভারত পরাধীন হইয়াও স্বাধীন। বাবা! স্বাধীনতা কাকে বলে? মনের বিকাশের স্বাধীনতা হিন্দুরা ইংরেজ রাজত্বে পাইয়াছেন সেরূপ চিন্তার স্বাধীনতা রুষের প্রজারা কি পাইয়াছেন? রুষের প্রজা অপেক্ষা ভারতের ইংরেজ প্রজা স্বাধীন। আমরা যত মানসিক গুণে উপযুক্ত হইব—ইংরেজও আমাদিগকে তত অধিকার দিবেন।

রা। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কি উপকার করিবেন বলিতেছিলেন?

খ। ইংলণ্ডের মহা বিপদের দিনে, যখন সমস্ত পৃথিবী (দুইটী জাতি ছাড়া) ইংলণ্ডের বিপক্ষ হইবে তখন ভারতের ঋষিশক্তি অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী শিখ গুরখার পল্টনে প্রবেশ করিয়া মা ইংলণ্ডকে ভুবন বিজয়ী করিবেন। তখন ভারত মাতা ও ইংলণ্ড মাতা—এই দুই মার আমরা সন্তান—এই ভাব ভারতের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিবে। তখন ইংলণ্ডবাসীগণও ভারতকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিবে। ভারত যতদিন ইংলণ্ডের হাতে থাকিবে তত দিন ইংলণ্ডও পৃথিবীতে অদ্বিতীয় রাজ শক্তি। ভারতবর্ষের কাছে ইংলণ্ড ধর্ম্ম শিখিবেন, ও রাজভক্তি শিখিবেন। ভারত ইংলণ্ডের কাছে বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি ও স্বদেশ প্রেম শিখিবেন। পৃথিবীতে ইংরেজের মত বড় জাতি নাই। হাজার বৎসরের মধ্যে কোন জাতী ইংরেজকে হারাইতে পারিবেনা। ফ্রান্সের মত অনেক জাতি উঠিয়া পড়িবে, কিন্তু ভারতের ঋষিদের আশীর্ব্বাদের বলে ইংলণ্ড অনেক কাল পৃথিবীতে অদ্বিতীয় রাজশক্তি রূপে বিরাজ করিবে। ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর ভাষা হইবে।

আর অন্য কথায় কাজনাই, তোমাকে যোগবলের আরো কয়েকটী কার্য্য দেখাইব।

বা। তুমি বাবা! এই পাহাড়ের উপরে উঠ। ইহার শিখরে বসিয়া দুইদিক দেখিতে পাবে। আমরা পিতাপুত্রে এই দেহ লইয়া পাহাড় ভেদ করিয়া যাইব। তুমি শীঘ্র পাহাড়ে উঠ।

রাজকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে রোমাঞ্চিতদেহে মহোৎসাহে সিংহবলে গাছপালা লতা পাতা কাঁটা ভাঙিয়া পাহাড়ের মাথায় উঠিলেন, সেথানে বসিলেন। তখন দুই যোগী পাহাড়ের কাছে দাঁড়াইয়া এক হুঙ্কার দিলেন। মানুষ যেমন জলে ডুব দেয়,

যোগীদ্বয় সেইপ্রকার পাহাড়ে ডুব দিলেন। রাজকুমার দেখিলেন যোগীদ্বয়ের দেহ দুটী দেখিতে দেখিতে পাহাড়ে পুঁতিয়াগেল বা পাহাড়রূপ জলতরঙ্গে ডুবিয়াগেল। রাজকুমারের সমস্ত অস্তিত্ব তখন একটী বিস্ময়ের মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, চক্ষু জলে ভাসিতেছে, পাহাড়ের ভিতর হইতে মেঘ-গর্জ্জনে শব্দ হইল, "পাহাড়ের অপরদিকে চাহিয়া দেখেন, মানুষ যেমন জলের ভিতর হইতে উঠে, যোগীদ্বয় সেইরূপ পাহাড়ের ভিতর হইতে উঠিলেন। বামদেব বলিলেন "বাবা! এইবার নামিয়া এস।" রাজকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কাছেগিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন।

বা। আমাদের দেহে একটী আঁচড় লাগে নাই দেখ।

রাজকুমার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন দুইজনের দেহে একটী দাগ নাই, আঁচড় নাই, ধূলা নাই।

বা। ঐ পাহাড়টাও ভাল করিয়া দেখ—যেমন পাহাড় তেমনি আছে।

রাজকুমার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন পাহাড়ের ঘাস, লতা, পাতা, গাছ যেমন তেমনি আছে, কোথাও একটী কণা সরে নাই।

বা। গুরুদেবকে আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই—উনি বিশ্রাম করুন।

রাজকুমার যেন দুটী ভগবানের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। এখন একটী অন্তর্হিত হইবেন, ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে ঋষি বলিলেন "বাবা! তুমি ভগবানকে পাবে"।

অমনি মহর্ষির দেহের চারিদিকে যেন একটা কোয়াশা বা

ধোঁয়ার আচ্ছাদন পড়িল। দেখিতে দেখিতে সে কোয়াসা অন্ত-র্হিত হইল—ঋষি মূর্ত্তি আর নাই।

তখন রাজকুমার ভাবে বিস্ময়ে কাঁপিতেছেন, পাহাড়গুলাও যেন তাঁর মত ভাবে বিস্ময়ে কাঁপিতেছে, পার তলার মাটীও যেন ভাবে বিস্ময়ে কাঁপিতেছে।

বামদেব রাজকুমারের স্নায়ুর চাঞ্চল্য বুঝিয়া, তাঁর মাথায় হাত দিয়া শক্তিসঞ্চারে বলিলেন "বাবা! শরীরটা বড় গরম হয়েছে একটু স্থির হও"। বামদেবের হস্তস্পর্শ বশতঃ একটা তেজ রাজ-কুমারের মস্তক দিয়া সমস্ত অস্তিত্বে বলবৃদ্ধি করিল। তিনি আবার সিংহবলে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, আমার দেহে এখন শত হাতীর বল হইয়াছে। বামদেব তখন রসিকানন্দকে সেইখানে বসিতে বলিয়া, রাজকুমারকে লইয়া সমুদ্র তীরে গেলেন। সমুদ্রের বালুকা রাশি পার হইতে হইতে দেখেন একটা মড়া জোয়ারের তরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে। বামদেব সেই মড়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলিলেন "বাবা! কি ভাসিয়া আসি-তেছে দেখিতেছ।

রাজকুমার নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "একটা মড়া বোধ হয়"।

বা! হাঁ বাবা! মড়া—মড়া—আমি ঐ মড়াতেই প্রবেশ করিব। মড়া এই চড়ায় বেড়াতে বেড়াতে কথা কবে, তুমি শীঘ্র গিয়া, ঐ মড়াকে টানিয়া তীরে আন।

রাজকুমারের মড়া বলিয়া আর ঘৃণা থাকিল না। যে সব ব্যাপার দেখিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় বামদেব একটা জীবন্ত ভূতকে ধরিয়া আনিতে বলিলে রাজকুমার তাহাতেই প্রস্তুত।

বামদেবের কথা শুনিবামাত্র রাজকুমার ছুটিতে লাগিলেন। মহোৎসাহে সমূদ্রের জলে নামিলেন। সমুদ্রের জেয়ার হুহু করিয়া তীর ডুবাইতে ডুবাইতে আসিতেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ জলময় প্রাচীরের মত হুহু শব্দে তীরভূমি ডুবাইয়া তীরে মিশিতেছে। যখন একটা তরঙ্গ মড়াটাকে তীরে দিয়া একটু পিছাইয়াগেল, সেই অবসরে রাজকুমার মড়ার পা ধরিয়া টান দিলেন, কিন্তু আবার প্রাচীরবৎ তরঙ্গ সম্মুখে দেখিয়া মড়া ছাড়িয়া, পিছু হাঁটিয়া, তরঙ্গের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তরঙ্গ ফেণা ও জলকণা ছড়াইয়া কুমারকে স্নান করাইয়া, তীরে আঘাত করিয়া, মড়াটাকে আরো উপরে ঠেলিয়া দিয়া যেই ফিরিল, কুমার অমনি দ্রুত গিয়া মড়ার পা ধরিয়া প্রাণপণে টান দিলেন—মড়াকে অনেক উপরে লইয়াগেলেন। মড়াটা জলে ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে, পেটটা জলে ফুলিয়া জালারমত, পা হাত সবই ফুলিয়াছে; বোধ হয় মানুষটা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

মড়াটা টানিতে টানিতে পেটের জল মলদ্বার, মুখদ্বার ও নাসিকাদ্বার দিয়া ঝরিতে লাগিল। সেই নির্গত জলের সঙ্গে পচা বিষ্ঠা, বমি, ও ময়লা নির্গত হইল। বালুকার উপরে ঘর্ষণ জন্য পেটের চামড়া ছিঁড়িয়া বিকট সাদা রং বাহির হইল, মুখটা একপশে হইয়া জল উদ্গার করিতে লাগিল। রাজকুমার নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া যতটা পারেন টানিয়া একস্থানে রাখিয়া বামদেবের কাছে গিয়া বিকৃতমুখে বলিলেন "বাবা! ও পচা মড়ায় আর কি কাজ হবে। আমি যা দেখেছি তাতেই যোগবলে বিশ্বাস হ'য়েছে, আর যোগবল দেখাবার প্রয়োজন কি?

বা। প্রয়োজন আছে চল(অ)।

বলিয়া রাজকুমারকে অগ্রসর করিয়া মড়ারদিকে চলিলেন। খানিকটা গিয়াই রাজকুমার বিকৃতমুখে বলিলেন "বাবা! বড় দুর্গন্ধ আর টেকা যায় না।

"কোন বস্তুকে কি ঘৃণা ক'রতে আছে বাবা!" বলিয়া বামদেব দ্রুত গিয়া, মড়ার হাত দাঁতে কামড়াইয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া আনিলেন। রাজকুমার দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে সিহরিয়া উঠিলেন। বামদেবের দাঁতে মুখে ঠোঁটে মড়ার গলা মাংস ও রস লাগিয়া, দুই কস বাহিয়া ঝরিতে লাগিল, যেন শৃগাল কুকুরের ব্যাপার। রাজকুমারের চক্ষুদিয়া জল পড়িল, তিনি ভাবিতেছেন "হা ভগবান! সমজ্ঞান কি এরেই বলে? উঃ বামদেবের কি সাধন! মানুষে কি না পারে? ইহাই মানুষের মহত্ত্ব!"

বামদেব পচা গলা মড়ার মাসরসযুক্তমুখে বলিলেন "আমি এইবার এই মড়ার ভিতরে প্রবেশ করি, তুমি বাবা! ভয় পেয়ো না। যদি বড় ভয় পাও তো আমার সমাধিস্থ দেহেরদিকে চাহিয়া আমাকে স্মরণ করিবে; আমি অমনি পরদেহ ছাড়িয়া, নিজদেহে প্রবেশ করিব। কথা শুনিয়া রাজকুমারের সমস্ত প্রকৃতি ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইল, রাজপুত্র কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেন। বামদেব কুমারের অবস্থা বুঝিয়া, তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্রে, হাতদিয়া আবার শক্তিসঞ্চার করিলেন, মাথাদিয়া হুহু করিয়া যেন দেহে মনে প্রাণে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল; কুমার আবার বীরেরমত সাহসী হইলেন। যদি সে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মৃতদেহ আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া অট্টহাস্যের রোলে পৃথিবী কম্পিত করে, তো ভয়ে সমুদ্র শুকাইতে পারে, কিন্তু রাজকুমার সাহসে অটল থাকিবেন।

বা। বাবা! আমি এইবার যোগাসনে সমাধিস্থ হইয়া, সূক্ষ্ম-

দেহে এই মড়ার ভিতরে প্রবেশ করি। মড়াটা তাজা হইলে আমার কষ্ট কম হইত।

বলিয়াই যোগী মহাশয় যোগাসনে বসিলেন। রাজকুমার তন্ময়-প্রাণে বামদেবের ভাবভঙ্গী দেখিতেছেন, আর কৌতুকে ফুলিতে ফুলিতে মড়াটারদিকে চাহিতেছেন। যোগী চক্ষু মুদিলেন, নিঃশ্বাস রোধ করিলেন, অমনি দেহ কাষ্ঠবৎ হইল। বামদেবের দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহে উত্তাপ নাই—দেহ হিম—মৃতবৎ। হাত দেখিলেন হাত স্থির, বুক দেখিলেন—তাহাও স্থির—ঠিক মড়ার বুক। তখন মড়ারদিকে চাহিলেন; সে সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ সব রাজকুমারের জ্ঞান হইতে বিলুপ্ত হইল। কেবল সেই যোগীদেহ এবং মৃতদেহ তাঁহার চৈতন্য আবরিয়া রহিল। তখন আকাশে সূর্য্য মাথার উপরে উঠিয়াছে, মেঘ সূর্য্যকে ঢাকিয়াছে, সমুদ্রে মেঘের কাল ছায়া পড়িয়া সমুদ্রকে ভয়ানক করিয়াছে। মেঘ, মৃতদেহ, যোগীদেহ ও কুমারদেহকে ছায়ায় শীতল করিতেছে। রাজকুমারের সে সব জ্ঞান নাই। রাজকুমার একবার যোগীদেহ দেখিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, আরবার সেই মৃতদেহকে নিরীক্ষণেই যেন স্পর্শ আঘ্রাণ করিতেছেন। মৃতদেহ স্থির, মাছির দল দেহের উপর ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে, সমুদ্র পক্ষীরা দেহের কাছে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে; কিন্তু মানুষের ভয়ে অধিক অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না। রাজকুমার ভাবিতেছেন "গুরুকে কি হারালাম।" এই চিন্তায় বুক যাতনায় ভাঙিবারমত হইল, একদৃষ্টে মড়ারদিকে চাহিয়া আছেন; কল্পনায় মনে হইল যেন মড়া মাথা নাড়িল, হাত একটু নাড়িল, কুমার নিকটে গেলেন, কই? সব স্থির—মড়াও স্থির এবং যোগাসনে যোগীদেহও

স্থির। বাবারে! ও কি গো! হঠাৎ যে মড়াটা পাশ ফিরিল! পাশ ফিরিয়া মাথাটা তুলিল, মাথা তুলিয়াই আবার উপুড় হইয়া পড়িয়াগেল। আর নড়ন চড়ন নাই। আধঘণ্টা মড়াও স্থির, যোগীদেহও স্থির। আধঘণ্টা পরে, ও আবার কিগো! দুহাতে ভর দিয়া মাতালেরমত টলিতে টলিতে মড়া উঠিয়া বসিল। মুখটা হেঁট, চক্ষু দুটার পোঁটা পট্ পট্ শব্দে ঝুলিয়া পড়িল। পট্ পট্ শব্দে কাণের চামড়া ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। মিনিট কয়েক পরেই মড়াটা উপুড় হইয়া পড়িয়াগেল, আবার প্রায় দশ মিনিট মড়াটা স্থির থাকিল।

ও আবার কি? মড়া ফিরিয়া চিত হইল, চিত হইয়া ঠোঁট্ নাড়িল, ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে দাঁত বাহির করিল। দাঁতের মাড়ি পচিয়াছে—সেই কদর্য্য মূর্ত্তিতে দাঁত দুপাটি বাহির হইল। তারপর দুইটা দাঁতপাটী পৃথক হইয়া একটু একটু ফাঁক হইল; ফাঁক হইতে হইতে মুখটা খুব হাঁ করিল। রাজকুমার মনেপ্রাণে সমস্ত শক্তিতে দেখিতেছেন, সেই হাঁর ভিতরে জীবটা নড়িতেছে; জীবটা নড়িতে নড়িতে খাড়া হইল। তারপর সমস্ত মুখগহ্বরে একটা বিকট আবর্ত্তনসহ শব্দ হইল "আ—আ—আ।" শব্দ করিতে করিতে প্রবল শক্তিতে একবার মাথা নাড়িয়া মড়া ঘাড় তুলিল, পিট বুক তুলিয়া বসিল; বসিয়া হাঁ করিয়া শব্দ করিল "ধর—ধর।" কুমার দুইহাতে মড়ার বগলের কাছে ধরিলেন, সেখানকার মাংস নরম পচা। হাতে রস লাগিল। কুমার যেই ধরিয়াছেন, অমনি ধড়মড় করিয়া, হাঁ করিয়া যেন কুমারকে গিলিবার জন্য, কলের পুতুলের মত মড়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তখন কুমারের ভয় হইল, ছাড়িয়া দিয়া কুমার সরিয়া পড়িলেন। মড়া পড়িয়াগেল, সেই

পতনে মড়ার পেট ছিড়িয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইল। এদিকে যোগীদেহ নড়িয়া উঠিল, যোগী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বা। বাবা! পচা মড়া, এজন্য বড় আমার কষ্ট হ'য়েছে। তাজা মড়া হ'লে, সহজ মানুষেরমত আচরণ করিতাম। এখন পরকায়া প্রবেশ কি দেখিলে।

কুমার ভক্তিতে গদগদ হইয়া বলিলেন "বাবা! যা দেখালেন, তা দেখিয়াও স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, যারা দেখে নাই তাদের তো অবিশ্বাস হবেই।

বা। বাবা বিশ্বাস জোর করিয়া কাহারও হয় না; যেমন জোর করিয়া কাহারও দাড়ি গোঁপ হয় না। বিশ্বাস একটা মনের বয়স। যেমন দাড়ি গোঁপ বয়সে আপনি হয়, বিশ্বাসও তেমনি মনের বয়সে আপনি হয়।

তারপর দুইজনে সমুদ্রে স্নান করিতে নামিলেন। সমুদ্রজলে দাঁড়াইয়া বামদেব বলিলেন "এই যোগবল কি পেতে ইচ্ছা হয়?"

রাজপুত্র চুপ করিয়া থাকিলেন। কুমারের মনের ভাব বুঝিয়া বামদেব বলিলেন "আমি তোমাকে এই সব শক্তি, এখনি দিতে পারি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে শক্তির প্রলোভনে আসল বস্তু হারাও, বাবা! অনেকে বিষয় সম্পত্তির আসক্তি ছাড়িয়া, সাধনপথে এই শক্তিরলোভে পড়িয়া ভগবানকে হারাইয়াছে; এজন্যই বাবা! ভয় হয়।"

রা। আপনি যখন আছেন তখন আবার ভয় কি? শক্তির লোভ হইতে আপনি রক্ষা করিবেন।

বা। তবে তুমি বাবা! স'রে এস।

রাজপুত্র-সরিয়া যাইলে, বামদেব এক গণ্ডুশ জল মন্ত্রপুত

করিয়া কুমারকে খাওয়াইলেন। খাইবামাত্র কুমারের এক আশ্চর্য্য শক্তি হইল। চক্ষে দৃষ্টি বাড়িল, কর্ণে শ্রবণ বাড়িল, স্পর্শে স্পর্শ বাড়িল, স্মৃতি বাড়িল, বুদ্ধি বাড়িল, আর এক নূতন চক্ষু খুলিল—তাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দেখিতে লাগিলেন।

প্রথমেই সমুদ্রজলে দাঁড়াইয়া, সমুদ্রটা শাখাপ্রশাখা সাগর মহাসাগর সহিত আদি অন্ত দেখিলেন। আকাশেরদিকে চাহিলেন—আকাশ অতি প্রকাণ্ড—আকাশের গুম্বুজমূর্ত্তি আর নাই—আকাশ সমতল—আদি অন্তহীন—যতই দৃষ্টি স্থির রাখেন, ততই আকাশ দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। আপনার দেহের উপরে চাহিলেন অমনি দেহের শিরা, প্রশিরা, হাড়, রক্ত, নাড়ি, ভুঁড়ি, মস্তিষ্ক সব যন্ত্রবৎ দেখিয়া সিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

দুইজনে সমুদ্র হইতে উঠিলেন। বামদেব একটী পাহাড়ে একটী গুহা দেখাইলেন। সেই গুহায় কুমার ও রসিকানন্দের সাধনার আশ্রয় হইল।

বা। বাবা! কিছুকাল এই যোগবল সম্ভোগ কর। ইহাতে যখন অশান্তি হইবে, তখন শান্তির পথ দেখাইব।

এই বলিয়া বামদেব যোগবলে অন্তর্হিত হইলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০ঃ০—

অদৃষ্ট শক্তি।

রাজকুমার সেই গুহায় বসিয়া, যোগ চক্ষু দ্বারা সমস্ত সৌর জগৎ স্পষ্ট দেখিতে পান।

একদিন দেখিতেছেন, "কয়েকটী পাহাড়ের মধ্যে একটী গুহার বাহিরে একখানি লাবণ্যময়ী ছায়ার মত কোন যুবতী বাকল পরিধানে একখানি পত্র পড়িতেছেন। পত্রের এক একটী হরপ যেন এক একটী চাঁদের মত বোধ করিতেছেন। রমণী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সেই পত্র বেদ মন্ত্রের মত আবৃত্তি করিতেছেন। সে পত্রে লেখা আছে ঃ—

"আশীর্ব্বাদ জানিবে,

আর দেরি কেন? তোমার জন্য আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। তোমারও যদি সেই ভাব হয়, তো, লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া আজ রাত্রি ১২ টার সময় মাঠের ধারের দীঘির পাড়ে আমার দেখা পাইবে। আমাকে একবার দেখিয়াই ঘরে ফিরিবে, আমি তোমার সহায়, কোন ভয় নাই। কিন্তু অনিচ্ছায় কোন লোভে আঁসিও না, কেবল আমার লোভে পার তো আসিবে।

তোমারই জ্ঞানদা।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া যুবতী ভাবিতেছেন, ' গুরুদেব বলিয়াছেন, জীবনে একবার দেখিতে পাব। এত সৌভাগ্য কি আমার হবে? সাগরে যে মাণিক হারাইয়াছি, সে মাণিক সাগর শুকালে যদি পাই তো সাগরের তীরে বসিয়া থাকিতে পারি। একবার পাব—এই আশায় সহস্র বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় অক্লেশে কাটাইতে পারি। এক বার সেরূপ দেখিতে পাব—এই আশাই আমার জীবনীশক্তি, এশক্তি যাইলেই মরিব।

যুবতীকে এই ভাবে দেখিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে ফিরিলেন। আপনার ঘরের দিকে চাহিলেনঃ—তাঁহার বিশ্রামোদ্যানের বড়ই দুর্দ্দশা। বকুলতলের সানের মেজেটী, পক্ষীর বিষ্ঠায়, গাছের পাতায়, মাকড়শার জালে, মৃত ভেকে, সাপের খোলসে পরিপূর্ণ। উদ্যানের ফুল গাছ গুলি, ঘাসে আগাছায় একাকার। আপনার পুস্তকালয়েরও সেই দশা। আপনার শয়ন গৃহে প্রেমদা রুক্ষ কেশে, মলিন বেশে, মেজেতে শুইয়া ধ্যান নিরতা যোগিনীর মত স্বামী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে অশ্রুমোচন করিতেছেন। একটী আট মাসের ছেলে কাছে বসিয়া, রাঙা মুখের লাল ফেলিয়া ভুড় ভুড়ি কাটিতেছে—ভুড় ভুড়ির বাতাসে রাঙা অধরে একটা জলবুদ্‌বুদের মত বস্তু দেখিয়া হাসিতে হাসিতে দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কচি হাতের কচি গ্রাসে সেই বুদ্‌বুদটীকে ধরিয়া বিলীন করিতেছে। তার পর সেই লালাস্রোত ধরিয়া বুকে, হাতে, হাঁটুতে মাখিতে মাখিতে কচি চাঁদমুখের রাঙা মাড়িতে হাসির লহর তুলিয়া "বুহু বুহু" শব্দে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। আবার হামাগুড়ি দিয়া, মার পিটে বুক দিয়া শুইয়া, কোমল কাল মাথাটী উন্নত করিয়া, মুখের লালায় মার পিটের কিয়দংশ ডুবাইয়া, ছোট

রাঙা হাতের চাপড় মারিয়া হাত নাড়িয়া মার পিটকে যেন অমৃতে রঞ্জিত করিতেছে।

রাজকুমার সেই বালককে দেখিয়া "কালের হাতে আমার এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খানি আমার এখনকার মূর্ত্তিতে বর্দ্ধিত হইবে," ভাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত দৃষ্টি ফিরাইলেন।

রাজপুত্র যোগবলে সবই দেখেন, সবই শুনেন, সবই বুঝেন, অথচ শান্তি নাই। যোগবলে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের ভাষা বুঝেন অথচ শান্তি নাই। যোগবলে আকাশে উড়েন, উড়িতে উড়িতে মেঘের ভিঃরে বিদ্যুতের চকমকানি দেখেন। সমুদ্রের জলে ডুবিয়া জল জন্তুর ঘাড়ে চাপিয়া বিচরণ করেন, অথচ মনের শান্তি নাই।

এই প্রকারে এক বৎসর গেল। কুমারের আবার যাতনা বাড়িল। কুমার রসিকানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন "এত শক্তিতেও মনের শান্তি নাইকেন ?

র। ভাই! শান্তির জিনিস তো শক্তি নহে ভক্তি।

রা। ভক্তি হয় কই ? প্রাণ যে যায়।

কুমারের মনের যাতনা ধু ধু করিয়া আগুণের মত জ্বলিতেছে। তিনি যাতনায় গুহার বাহিরে জলহীন মাছের মত চৈতন্য হারা হইয়া আছেন। মনে ভাবিতেছেন "এজীবন আর রাখিয়া ফল কি ?" গুরুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন, গুরু আসিলেন না। করযোড়ে চক্ষু মুদিয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুকে কাঁদিতে কাঁদিতে কত ডাকিলেন, গুরু দেখা দিলেন না। এই রূপ যাতনায় একমাস কাটাইলেন। অনাহারে অনিদ্রায় একমাস কাটাইলেন।

দেহ শোভাহীন, শক্তিহীন। মন প্রাণ পুড়িয়া পুড়িয়া যেন দগ্ধকঙ্কর। যাতনায় প্রাণ যায় যায়—বুকের পাঁজর ধসিয়া গেল, গুরু দেখা দিলেন না। তখন রাজপুত্র স্থির করিলেন, আর না—ঈশ্বরহীন, ভক্তিহীন জীবন লইয়া কি কাজ? এ জীবন চাই না।

একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এই রূপ চিন্তায় অধীর হইয়া, গুহা ত্যাগ করিয়া একদিকে চলিলেন। আকাশেরদিকে চাহিয়া মনের আবেগে বলিলেন "হে আকাশের চাঁদ! কার রূপে তুমি অতসুন্দর হইয়াছ, তাহা আমাকে বলিলেনা? হে নক্ষত্র সকল! কার আদেশে অনন্ত আকাশে কর্ত্তব্য সাধন কর, তাহা বলিলেনা? হে পর্ব্বত সকল। কার জন্য তোমরা এত উৎসাহে ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সহিতেছ বলিলেনা? তোমরা এতকাল নীরবে চেতনাহীন হইয়া কার জন্য কেন আছ বুঝাইলেনা? তোমাদের অচেতনত্বে তোমরা ধন্য! জ্বালা নাই, ভাবনা নাই, পরমা শান্তিতে আছ। কিন্তু চৈতন্যধর্ম্মী মানুষের চেতনাকে ধিক! তোমাদের উপরে আমার মত মানুষের কর্ত্তৃত্বে ধিক! যে যোগবলে শান্তি পেলামনা এমন যোগবলে ধিক! তুমি চন্দ্র! আপনার রূপে জগৎ পুলকিত করিতেছ, তুমি ধন্য! আর আমি চৈতন্যে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও তো কাহারও উপকারে লাগিলামনা। কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হইলাম! এত ব্যস্ত হইয়াও নিজের কিছুই করিতে পারিলামনা। আমার এ চৈতন্যধর্ম্মে ধিক! ওহে সূর্য্য! তুমি নিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রমে অত দূরে থাকিয়াও, সু, কু, বিচার না করিয়া লোকের উপকার করিতেছ। কিন্তু আমি পৃথিবীর খাইয়া পরিয়াও যে কোন উপকার করিতে পারিলাম না!

হে ক্ষুদ্র তৃণ! তুমি সবুজ বর্ণে কত লোকের চক্ষু জুড়াও, কিন্তু আমি এত পাণ্ডিত্যে এত যোগবলে কি করিলাম? আমার চেতনা যে যাতনা হইয়া, আমাকে উন্মাদ করিতেছে। উঃ প্রাণ! তুমি যদি যাও তো বাঁচি। এই পাহাড়ের মত মাটীর সঙ্গে মাটী হইয়া নিশ্চিন্ত হই। তুমি প্রাণ হইয়া আমার যাতনার কারণ হইয়াছ। হায়! হায়! ভক্তিহীন প্রাণ কি যাতনা! কি নরক! এ প্রাণ যখন যাতনা তখন এ প্রাণ নহে। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যখন শীতল জল পান করি তখন সে জলকে প্রাণ বলিয়া তৃপ্তি পাই। প্রাণের ধর্ম্মই তৃপ্তি দেওয়া। কিন্তু যখন এই প্রাণই যাতনার কারণ তখন এপ্রাণ প্রাণ নহে। এপ্রাণের অতীত স্থলে কোন বস্তু আছে, তাহা এ যাতনায় যদি পাই, তবেই তিনি প্রকৃত প্রাণ। এ কথা দুঃখে না পড়িলে, প্রাণের আগুণে না পুড়িলে কেহ বুঝিবেনা। এই প্রাণই বুঝি মহাপ্রাণ, জগতের প্রাণ। আচ্ছা এই জগৎপ্রাণকে পাইয়া লাভকি? তিনি যদি থাকেন, আমার প্রাণেই আছেন। প্রাণে মনে দেহে রক্তে যখন আছেন, তখন তো তাঁকে পাইয়াই আছি। সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রভাবেই তো আছি। তবে শান্তি হয় না কেন? হাহাকার ঘুচে না কেন? তবে শান্তি তিনি দিতে পারেন না? ভক্তি যদি তাঁতে না হয়, তো শান্তি তিনি দিতে পারেন না, অথবা ভক্তির ভিতর দিয়া শান্তি দেন। শুধু তাঁহাকে দেখিলে শান্তি হয়না। তাঁহাকে দেখিয়া যদি ভক্তিহয় তো শান্তি হয়। আর তাঁহাকে না দেখিয়াও যদি ভক্তি হয় তো কেবল ভক্তিতেই শান্তি হয়। ভগবদ্ভক্তিই তবে শান্তির কারণ। মুক্তিতে যে শান্তি, সেটা বোধ হয় তাঁতে লীন হইয়া শান্তি। আর ভক্তিতে যে শান্তি সেটা তাঁহা হইতে পৃথক

থাকিয়া শান্তি। সুতরাং ভক্তিতে যে শান্তি তাহা মানুষের শান্তি আর মুক্তি বা নির্ব্বাণে যা শান্তি তাহা ব্রহ্মের শান্তি। এখন যে ভাবেই হউক, শান্তি পাইলে যে বাঁচি। শান্তি পাই কই? ভক্তি পাই কই? ভক্তি ভক্তি করিয়া প্রাণ কাঁদে, কিন্তু ভক্তি পাই কই? ভক্তি মানুষের সাধ্যাতীত বোধ হয়; নহিলে এত সাধনাতেও ভক্তি পাইলাম কই? বুদ্ধি স্মৃতির উৎকর্ষে যে জ্ঞান, তাহা ভিতরের জিনিস কালে প্রকাশ পায়। ভক্তি কালের অতীত বস্তু। যদি প্রকৃতিগত বস্তু হইত তো ভক্তি বালকে দেখি বৃদ্ধে দেখি না কেন? ভক্তি পণ্ডিতে দেখি না মূর্খে দেখি কেন? সাধুর সাধনায় দেখি না অসাধু মহা পাপীর অসাধনায় দেখি কেন? কোন্ নিয়মে কোন্ পথে ভক্তি আসে কেহবলিতে পারে না কেন? এই জন্যই কি ভগবান বলিতেছেন :—

"মুক্তি দিতে পারি আমি ভক্তি দিতে পারি কই"? কথাটা বড় সত্য—কিন্তু বোধ হয় এই সত্যে একটু গুপ্ত কথা আছে। কারণ ভগবান কিনা দিতে পারেন? তবে যদি সর্ব্ববস্তুর মধ্যে তাঁর একটী প্রিয়তম বস্তু থাকে—তো ভগবান তাহা অন্তরের অন্তর করিয়া লুকাইয়া রাখেন। মুক্তি তিনি সকলকেই দিতে প্রস্তুত, উহা তাঁহার প্রিয়তম বস্তু নহে, উহা ভগবানের একটা সামান্য বস্তু। মুক্তিতে সাধক ভগবানে গমন করেন, আর ভক্তিতে ভগবান ভক্তেতে গমন করেন। মুক্তিতে সাধক ভগবানে মিশিয়া ভগবান হন, তাঁর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনা। আর ভক্তিতে ভগবান সাধকে মিশিয়া মানুষ হন—আদর্শ মানুষ হন—অবতার হন। মুক্তিতে মানুষ ভগবানে বিক্রীত ভক্তিতে ভগবান মানুষে বিক্রীত। মুক্তি দিয়া ভগবান মানুষকে ক্রয় করেন এবং ভক্তি

দিয়া মানুষ ভগবানকে ক্রয় করেন। এই জন্য ভগবান ভক্তি সহজে মানুষকে দিতে চাননা, আপনাকে বিক্রয় করিতে সহজে কে চায়? কিন্তু উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া ভগবান যেন সাধককে বলেন :—

তুই ধন নে।

সা। ধন অতি তুচ্ছ

ভ। যশ ?

সা। অতি তুচ্ছ।

ভ। জ্ঞান ?

সা। অতি তুচ্ছ।

এই কথা শুনিয়া ভগবান ভয়ে ভয়ে যেন লুকান। কিন্তু সাধকের যাতনা দেখিয়া আর থাকিতে পারেন না। তিনি আবার বলেন :—

তুই কি চাস ?

সা। আমি আপনার পদসেবা করিতে চাই।

ভ। তুই সামান্য মানুষ অতি ক্ষুদ্র—অতি পাপিষ্ঠ, আমার পা স্পর্শ আমি ভিন্ন আর কে করিবে ?

সা। আমি ক্ষুদ্র হই পাপী হই—ঐ রাঙা পাদুখানি যদি একবার স্পর্শ করিতে পারি, তো আর ক্ষুদ্র থাকিব না, পাপী থাকিবনা।

ভ। তাইতো নির্ব্বাণ মুক্তি দিতেছি—আমাকে স্পর্শ করিবি আর আমি তোকে আমাতে মিশাইয়া আমার সঙ্গে এক করিব।

সা। প্রভু! আপনার সঙ্গে এক হইব—এ অহংকার আমার যেন না থাকে —আপনাতে মিশিয়া আপনাকে বড় করিতে পারিব না, যদি পারিতাম, না হয় এক হইতাম। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আপনার পদসেবা করিয়া যে শান্তি পাইব—সেই শান্তিবারি জগতের দুঃখসন্তপ্ত জীবের প্রাণে কথঞ্চিৎ ছিটাইয়া তাদের দুঃখের প্রকোপ কমাইতে পারিব।

ভ। জগতের লোকের শান্তি আমি দিব—তোমার তাতে অধিকার কি?

সা। অধিকার যদি নাই প্রভু! তবে জীবের দুঃখে প্রাণ কাঁদে কেন? জীবের দুঃখ দেখিয়া এ প্রাণে যাতনা হয়—এইযে দয়া, এতো আপনার সৃষ্টি। ঠাকুর! লোকে দুঃখীকে অন্নদান করে, তাতেও দুঃখীর দুঃখ ঘোচে না। আশ্রয় দান করে তবুও দুঃখ ঘোচে না। কারণ দেখিয়াছি যাদের বাহিরের দুঃখ নাই—সোণার অট্টালিকায় শুইয়া বাহিরে কুসুমাবৃত দেহে, ভিতরে নরকের আগুণে জলিয়া মরিতেছে। আবার দেখিয়াছি অন্নহীন আশ্রয় হীন হইয়া বৃক্ষতলে শুইয়া ভিতরের শান্তিতে এমনি বিভোর—যে সে শান্তির বাতাস একটু পাবার জন্য শত শত রাজা সোণার সিংহাসন ছাড়িয়া সেই বৃক্ষতলবাসী উলঙ্গের পদতলে লুন্ঠিত হইয়া তৃপ্তি পাইতেছে। শুনিয়াছি প্রভু! আপনার প্রতি ভক্তি পাইয়া এই বৃক্ষতলবাসী দরিদ্ররাই জগতের দুঃখ দূর করিতেছেন। প্রভু! পরের দুঃখ মোচন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। দুঃখ নানা প্রকারের। সকল দুঃখের মধ্যে অশান্তির দুঃখই বড় দুঃখ। এই অশান্তির দুঃখ যিনি দূর করিতে পারেন তিনিই

জগতের পরমদয়ালু। এই যে অশান্তি দূর এ যে ভক্তি না হইলে হয় না। প্রভু! যে জ্ঞানে আপনাতে একলা মিশিয়া একলা শান্তিলাভ করিতে হয়, সে স্বার্থপর শান্তির প্রয়াসী নই। যদি আমার সঙ্গে সমস্ত জীবের মুক্তি দেন, তবে আমাকে জ্ঞানজনিত মুক্তিদান করুন।

ভ। তাহাতে যে আমার সৃষ্টিনাশ হবে।

সা। ঠাকুর সেই জন্যই তো বলিতেছি অমন স্বার্থপর শান্তি চাই না।

ভ। ওরে তোর কথায় আমি বড়ই তৃপ্তি পাইলাম। আমার পাদপদ্ম এইতো কাছে, স্পর্শ কর।

সা। ঠাকুর! কি দিয়া স্পর্শ করি।

ভ। কেন হাত দিয়া

সা। যে হাতে অসদাচরণ করিয়াছি সে হাত দিয়া ঐ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রেরঈপ্সিত ধন স্পর্শ করিতে যে সাহস হয়না প্রভু!

ভ। তবে আর আমার পাদস্পর্শ করিতে পাইবি কিপ্রকারে?

সা। আপনি সে উপায় করিয়া দিন।

ভ। আমার ভক্তি নামে একটী দুর্লভ বস্তু আছে—তাহা আমার হৃদয়ের রক্ত। এই রক্তের কণিকা তোর হৃদয়ের রক্তে মিশাইয়া দিলে তোর সবই ভক্তিময় হইবে। তখন তোর হাত পা, মুখ, চোখ, কাণ সব ভক্তিময় হইবে। তোর স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণ দেহকে আবৃত করিয়া একটী চিন্ময়দেহ হইবে। তখন তোর হাত আমারপাদপদ্ম স্পর্শে এমনি কৃতার্থ হইবে, যে অনন্ত ক্লেশে ডুবিয়া জগতের দুঃখ দূরের জন্য প্রস্তুত হইবি। তখন আমার এইসংসারটা তোরই সেবার বস্তু হইবে। এই জন্য বাবা!

"ভক্তি" আমার প্রিয়তম বস্তু—অতি গুপ্ত—গুহ্যতম বস্তু। সাধনায় কেহ এ পায় না। আমি কৃপা করিলে, সামান্য পশুতেও প্রাপ্ত হয়।

আহা একথা গুলি ভাবিতে ভাবিতে যেন একটু শান্তির ছায়া পাইতেছি। দূর হইতে যে বস্তুর আলোচনায় এত সুখ না জানি সে বস্তু লাভ হইলে কতসুখ। আহা হা! আসল বস্তু পাব কবেরে! প্রাণযে যায়! গেলাম। বুক গেল! মাথা গেল! পাগল বুঝি হলাম! শরীর কাঁপছে! মাথা ঘুরছে"!

যুবা যাতনায় মৃতপ্রায় শুইয়া থাকিলেন। দুইঘণ্টা শুইয়া, সেখানকার মাটীকে কাদা করিয়া, কাদামাখামুখে উঠিলেন। যাতনার জগতে, যাতনার দেহ, যাতনায় ঠেলিয়া যাইতেছেন। একটা যাতনার পাহাড়ে উঠিলেন। অত্মঘাতী মূর্ত্তিতে, ভাবিতেছেন "আর কেন? এখান হইতে পড়িয়া মরি"। আবার ভাবিতেছেন, "মরিয়াও যদি না মরি। দেহ ছাড়িয়াও যদি থাকি, তো, এ অন্তরের যাতনা কখনই যাবেনা। যদি তিনি থাকেন, তো, তাঁর সৃষ্ট দেহকে আমি নষ্ট করি কেন? এদেহ ছাড়িলেই যে যাতনা হইতে উদ্ধার পাব, তার প্রমাণ কি? উঃ তোমার এতই বুদ্ধি যে জীবকে এমনি অন্ধকারের কারাগারে ফেলিয়াছ যে, সে কারাগার ভাঙিবার যো নাই। উঃ যদি থাকো ভগবান্! এ অধীনকে দেখা দাও! না—দেখা দিলেনা, কথা শুনিলেনা, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, অদৃষ্ট যখন সত্যই বোধ হইতেছে, কার্য্য-কারণ যখন প্রকৃত বোধ হইতেছে, তখন আর ভাবিকেন? যাহা অদৃষ্ট শৃঙ্খলে গাঁথা আছে, তাহা যখন হবেই হবে, তখন আর মরিতে ভয় কি? নরক ভোগ যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে কে তাকে

খণ্ডাইবে ? তবে আর ইহকাল পর কাল ভাবিবনা। পড়িয়ামরি। হে নিম্ন মৃত্তিকা ! আমার দেহকে কোল দাও ! আমার হাড়গুলিকে শান্তি দাও! এইবার পড়ি—একি! আমি হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে যাইতেছি, আর আমার প্রকৃতিতে প্রবল হইয়া এক মহাশক্তি আমার উদ্যমকে বাধা দিতেছে। বাধা কখনই মানিবনা, আমার স্বাধীনতা আছে, এখনি মরিব' তুমি বাধা দাও কে? অলক্ষ্যে বাধা দাও কে? ক্ষমতা থাকে দেখা দিয়া বাধা দাও। দেখা তো দাওনা—তবে পড়িয়া মরি। ওকি? কি আশ্চর্য্য! একটা শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার হাত পা, মন, প্রাণ যেন চাপিয়া বাধা দিতেছে। যেন বিবেককে ছাপাইয়া, ইচ্ছাকে চাপিয়া, হাত পাকে টানিয়া ভিতর হইতে বাধা দিতেছে। এখন স্পষ্ট দেখিতেছি, এক মহাশক্তি আছেন, যিনি আমার জীবনের নেতা। এই মহাশক্তি আমার মন বুদ্ধি অহংকারের অতীত, তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। আহা! তুমি কে? আমাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে, আমাকে অন্ধকারে অলক্ষ্যে টানিতেছ তুমি কে? তুমি যে মহাশক্তি, তাহা বুঝিতেছি। তুমি যে অন্ধনও তাহাও বুঝিতেছি। তুমি যে পরমাত্মীয় তাহাও বুঝিতেছি; কিন্তু অনেকে তো আত্মহত্যা করে, সেখানে তুমি বাধা দাওনা। যখন দেখিতেছি তুমি থাকিতেও লোকে আত্মহত্যা করিতেছে, তখন তুমি আত্মহত্যায় সহায় হও। এত বৎসর নানা শাস্ত্র পাঠে, নানা বিচারে যাহা বুঝিতে পারিনাই, আজ জীবনের পথে ঘোর শঙ্কটে গভীর দুঃখে তাহা বুঝিলাম। মানুষে দুটা শক্তি আছে, একটা তার অহংএর, আর একটা তার অহংকে নিয়মিত করিবার। যখন তোমার সহিত অহং এর শক্তির বিরোধ হয়, তখন

অহং কিছুই করিতে পারে না। "অহং"এর ইচ্ছা অনেক—ইচ্ছা পূর্ণ করিবার শক্তি তোমার। তুমি পূর্ণ না করিলে অহং কিছুই পারে না, অহং এর কার্য্য করিবার একটা ঝোঁক আছে—এই ঝোঁক টাই স্বাধীনতা, কিন্তু ঝোঁক কার্য্য করিতে পারে না। ঝোঁক যখন তোমার সাহায্য পায়, তখনি কার্য্য হয়, নতুবা কার্য্য অসম্ভব। আচ্ছা আমি মরিতে পারিলাম না, অনন্ত যাতনায় আমাকে দগ্ধ কর, আমি প্রস্তুত হইলাম। দেখি আজ রাত্রে, এগুহায় না শুইয়া, ঐ বনে বাঘের আড্ডায় শয়ন করি, দেখি তুমি বাঘের মুখ হইতে কিপ্রকারে রক্ষা কর,,।

রাজপুত্র সমস্ত রাত্রি বাঘের আশ্রমে শুইয়া, মনের যাতনায় কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে একটা বাঘ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, লক্ষ্য করিল, বাঘ লক্ষ্য করিয়া স্থির ভাবে আছে এমন সময়ে হঠাৎ এক ঋষি মূর্ত্তি, বাঘের কাছে দাঁড়াইলেন, বাঘের দৃষ্টির উপরে দৃষ্টি রাখিলেন। বাঘ সে ঋষি দৃষ্টির সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ তেজ সহিতে না পারিয়া, ভীত হইয়া পলাইল। ঋষি রাজকুমারের পৃষ্ঠে চাপড় মারিলেন "বাবা! উঠ! তোমার দীক্ষার সময় হইয়াছে"।

বহুবৎসর অনাবৃষ্টির পর, প্রচুর বৃষ্টিপাতে পৃথিবীর যেমন আনন্দ হয়, এত যাতনায় বামদেবের দর্শন লাভে রাজকুমারের সেইরূপ আনন্দ হইল। রাজকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর পা জড়াইয়া বলিলেন "বাবা! তোমার মত দয়াল আর কেহ নাই, এমন বিপদে যখন এসেছ তখন বোধহয় ভগবানের দয়া আছে, বাবা! যদি না আসিতে, তো, আমার দশা কি হইত!" বলিতে বলিতে কুমার বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা! ভক্তি টক্তি জানি না। এখন শান্তি যাতে হয়,

তাহা করুন, না হয় আমার অস্তিত্বকে একবারে ধ্বংশ করুন। হ্যাঁ বাবা! অস্তিত্বের ধ্বংশইকি শান্তি? রাজপুত্র যদি তাই হয় তো তাই করুন, কারণ শান্তি হীন জীবনই মৃত্যু এবং শান্তি পূর্ণ মৃত্যুই জীবন।

বামদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বাবা! খুব রৌদ্রে পুড়িয়া শীতল জল পান করিলে জল অধিক শীতল বোধ হয়। এই প্রকার সংশয়ের যাতনায় পুড়িতে পুড়িতে যখন মানুষ মহা-শান্তির মূর্ত্তিকে দেখে তখন শান্তির শান্তিত্ব বুঝে। বাবা! ঐ পাহাড়ের উপরে চল তোমাকে তারাসমুদ্রে স্নান করাইয়া শান্ত করিব"।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

দীক্ষা।

পরদিন প্রাতে মহাভক্ত বামদেব, ও, রাজপুত্র জ্ঞানদানন্দন সমুদ্রে স্নান করিলেন। স্নানের পর বামদেব সমুদ্র গর্ভস্থ এক পাহাড়ে শিষ্যকে লইয়া উঠিলেন। একটী সমতল প্রস্তর খণ্ডে শিষ্যকে যোগাসনে বসাইলেন। বসাইয়া উপনিষদের "ব্রহ্মজ্ঞান" সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তার পর কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন "—"। সেই একাক্ষরী মন্ত্র কর্ণ কুহরের পটাহ ভেদ করিয়া মনে প্রাণে এক নূতন তেজ ও আলো লইয়া প্রবেশ করিল। শিষ্যের সমস্ত শরীর ভক্তিতে কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু জলে ভরিয়াগেল, মাথার চুল সজারুকাঁটার মত খাড়া হইল। সেই শব্দ মন্ত্র রূপে, গুরুরূপে, বেদ রূপে, ব্রহ্ম রূপে, ব্রহ্মাধিক রূপে, তাঁর অস্তিত্বের ময়লা ভস্ম করিতে লাগিল। যেমন কয়লাতে আগুন প্রবেশ করিলে কয়লা আগুন হয়, সেই রূপ মন্ত্রাগ্নিস্পর্শে অস্তিত্ব আগুন হইল। শিষ্য চক্ষু মুদিয়া, "হরি বোল,""হরি বোল" বলিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দুবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিবোলের বর্ণে বর্ণে আনন্দ ধারা মনপ্রাণের গহ্বর বাহিয়া উথলিতে থাকিল। হৃদয়ের গুহায় প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে "হরিবোল"। শিরায় রক্ত স্রোতে শোণিত লাফাইয়া বলিতেছে

"হরি বোল"। স্মৃতি সমস্ত সুখ দুঃখকে সুখময় করিয়া বলিতেছে "হরি বোল"। আর সুখ দুঃখ প্রেমের আলিঙ্গনে এক হইয়া বলিতেছে "হরিবোল"। পৃথিবী ভক্তের নৃত্যস্পর্শে; বৃক্ষ লতা ফুল ফলের সঞ্চালনে নাচিয়া বলিতেছে "হরিবোল"। সমুদ্র গম্ভীর রবে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিয়া বলিতেছে "হরিবোল"। যতই বলেন 'হরিবোল" ততই ভক্তির তেজ বাড়িতেছে, মন প্রাণ ততই আকুল হইয়া আনন্দে স্ফীত হইতেছে। মনে হইতেছে, সমস্ত জগৎ অনাদি কাল হইতে যাহা কিছু করিয়াছে, এই হরিনামে তাঁহাকে নাচাইবার জন্য। তিনি শতজন্মের দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন এই হরি নামে নাচিবার জন্য। শতবার আত্মহত্যা করিতে গিয়া ফিরিয়াছিলেন এই হরি নামে নাচিবার জন্য। আবার মনে হইতেছে, জীব যখন সম্পদে বিপদে ঘুরিতে ঘুরিতে "হরিনামে" নাচে, তখন বিপদ সম্পদের কোলে উঠিয়া মধুর হয়। জীব যখন সংশয়ে বিশ্বাসে ঘুরিতে ঘুরিতে "হরিনামে" নাচে, তখন সংশয় বিশ্বাসের কোলে উঠিয়া মধুর হয়। এই সুখদুঃখময় জীবনে, দুঃখের আধিক্যে যখন জীব "হরিনামে" নাচে, তখন সুখ দুঃখের বিবাহোৎসব হয়। যখন জীব মরিতে মরিতে "হরি নামে" কাঁদে তখত মরণে নবজীবন লাভ হয়।

নাচিবার সময় এই রূপ কতকি মধুর ভাব ভক্তের প্রাণে ভাসিতেছিল। "হরি বোল" বলিতে বলিতে আনন্দের ভার সহিতে না পারিয়া, ভক্ত পাহাড়ে পড়িয়া গেলেন।

বামদেব কর্ণে মন্ত্র দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন। ভক্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, সেই পাহাড়ের তৃণকঙ্করের উপরে শুইয়া, আপনার হৃদয় গহ্বরের ভিতরে আকাশ অপেক্ষা বড় এক ভাবসমুদ্র

দেখিলেন। সেই সমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানের জলরাশি। সেই জলে বিবেকবাণীর মত শব্দরাশি, সমুদ্রের কল কল ধ্বনির মত নীরব বজ্রনাদে উঠিতেছে। এত দিন যেন একটা পাহাড়ের চাপে সে সমুদ্রের সহিত তাঁর সম্বন্ধ আবদ্ধ ছিল, এখন হরিনামের দ্রাবকে সে পাহাড় গলিয়া সমুদ্রে মিশিয়া গেল। যেমন সমুদ্রে আকাশের ছায়া, সেই রূপ সেই ভাব সমুদ্রে এক অনন্ত সচ্চিদানন্দময় পুরুষের চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দেখিয়া, ভক্ত চিদানন্দে বিহ্বল হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখকে সুখময় দেখিতেছেন। যে দুঃখকে অসীম দেখিতেন তাহা সেই অনন্দ ঘন মূর্ত্তিকে ধরিবার উপায় মাত্র; এই জন্য দুঃখকে মনে মনে প্রণাম করিলেন। আগে কখনও কখনও ভাবিতেন, যদি বিধাতাকে দেখিতে পাই, তো জিজ্ঞাসিব, প্রভু! জগতে এত দুঃখের স্থষ্টি, না করিলেইতো পারিতেন। কিন্তু এখন প্রভুকে ভাবসাগরে প্রতিভাসিত দেখিয়া, সে রূপে আনন্দোন্মত্ত হইয়া, জগতের দুঃখরাশিকে সুখ স্বরূপ বোধ করিলেন। তাই কর যোড়ে বলিলেন "প্রভু! কাঁটাগাছে গোলাপ কমল ফুটাইয়া ভালই করিয়াছেন"। প্রভু! আপনি কে? দেখিয়া যে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। প্রভু! সমুদ্রে পূর্ণিমার শোভা পাহাড় হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছি, কিন্তু আমার ভাবসমুদ্রে আপনার বিরাট চিদ্‌ঘন ছায়া দেখিয়া যে, লক্ষ দুঃখে কোটি সুখ ভুঞ্জিয়া আপনার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। সে রূপ দেখিতে দেখিতে মন, বুদ্ধি, অহং কিছুই স্মরণে নাই। স্মরণ মনন, শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন সব জমাট বাঁধিয়া কোটি জন্মের সুখ দুঃখকে সেই রূপের পাদপদ্মে পুস্পাঞ্জলি দিতেছে। এমন সময়ে ধাঁ করিয়া সে সুখ ভাঙিয়া গেল। ভক্ত যাতনায় আকাশকে-হৃদয়ে পুরিয়া,

সেই হারাণ নিধিকে প্রাণে ধরিবার জন্য, মহাশক্তিতে পূর্ণ হইয়া, আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে বিশ্বব্যাপী মনে করিতেছেন। এমন সময়ে সন্মুখে দেখিলেন, তাঁর গুরু পাহাড়ের উপরে যোগাসনে বসিয়া আছেন, আর সেই ভাবসাগরের চিদানন্দরূপ, বালিকা মূর্ত্তিতে তাঁর কোল আলো করিয়া, পাহাড় আলো করিয়া, সমস্ত আকাশ আলো করিয়া, তাঁর মন প্রাণকে ভক্তিতে আকুল করিতেছেন। জ্যোৎস্না ঘন হইয়া, যদি একটী অবয়ব হয়, তো বালিকার দেহ খানি তাই। সূর্য্য ছোট হইয়া যদি চক্ষু হয় তো বালিকার চক্ষু তাই। অমাবস্যার রাত্রি ঘন হইয়া যদি কেশ রাশি হয় তো, বালিকার কেশদাম তাই। বিদ্যুৎ কোমল হইয়া, যদি মানব চক্ষে প্রবেশ করে তো, বালিকার স্নেহ দৃষ্টি তাই। এমন মূর্ত্তি দেখিবামাত্র ভক্ত উন্মত্তবৎ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু কাছে গিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন প্রাণে বড়ই যাতনা হইল। যাতনায় জ্বলিতে জ্বলিতে, গুরু কোথায় ? গুরু কোথায় ? বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। আধঘণ্টা পরে ভক্ত ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিলেন। সম্মুখে বামদেব। আনন্দে উৎসাহে তখনি উঠিয়া, দ্রুত গিয়া বামদেবের পা জড়াইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। গুরু জিজ্ঞাসিলেন "বাবা! যাহা দেখিলে, তাহা কি সত্য বোধ হয়" ?

শি। বাবা! ইহা যদি মিথ্যা হয়, তো মিথ্যাই পূজনীয় আর সত্য অগ্রাহ্য। মিথ্যা কি সত্য তাহা জানি না, যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি আর দেখিতে পাব না ?

বা। তাহা আবার একবার দেখিবার জন্য কি করিতে পার ?

শি। দুঃখ যাতনা কোটি বৎসর সহিতে পারি, সেই রূপ একবার দেখিবার জন্য।

বা। বাবা! ভগবান তোকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। ছায়া দেখিয়াই যখন এত আনন্দ, উৎসাহ; তখন ছায়ার ভিতরে কায়া দেখিলে, নাজানি; তোমার কত আনন্দ উৎসাহ হবে।

শি। বাবা! এই ছায়ার ভিতরে কি আবার কায়া আছে?

বা। হাঁ বাবা! আসল বস্তুর ছায়া দেখিয়াছ, এখনও আসল বস্তু দেখ নাই।

শি। এই যে আপনার কোলে মেয়েটী দেখিলাম, এও কি ছায়া?

বা। ওটীও ছায়া বাবা! যদি মেয়েটীর সঙ্গে কথা কহিতে, মেয়েটীর কোলে উঠিতে, স্তন্য পান করিতে, তো, আসল বস্তুর জ্ঞান হইত।

শি। বাবা! জীবের মুক্তির জন্য তিনি স্বয়ং যখন দেখা দেন তখন জীবের কোটি জন্মের দুঃখ ক্লেশ কিছুই নহে। যাহা দেখিয়াছি, স্মরণে তাহা এমনি জড়াইয়াছে, যে যখনি মনে হয়; অমনি আনন্দে চমকিয়া উঠি; দেহ কণ্টকিত হয়, সমস্ত জগৎ স্বর্গ বোধ হয়। প্রভু! এসব আপনারই কৃপা, এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা কি করিতে পারি?

বা। কি কথা বাবা?

শি। আমার ভাগ্য কি ছায়া-দর্শন পর্য্যন্ত?

বা। না বাবা! কায়া দেখিতে পাবে।

শি। কবে পাব ঠাকুর?

বা। আকাশ-গঙ্গার সহিত, প্রেমদাকে ও বর্নলতাকে কাছে

বসাইয়া, যখন চারটী জীবনকে এক পূজার ফুলে গঠিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের রূপের ভিতরে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণে অঞ্জলি দিতে পারিবে, তখন সেই আসল বস্তু দেখিয়া মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা শুনিয়া, ভক্তির আবেগে, আকাশে সমুদ্রে পাহাড়ে বৃক্ষলতায় এক রূপময় প্রাণের সমুদ্র দেখিয়া আনন্দে সিহরিয়া উঠিলেন। ভাবে বিভোর হইয়া, সেই রূপময় প্রাণের সমুদ্র আবার দেখিবার জন্য কাতর হইলেন।

বা। বাবা! যে রূপের সাগর দেখিলে, তাহা মার রূপের আভা, এই আভার কিছু কিছু প্রকৃতির শোভায় ক্ষরিত হয়। তুমি এই প্রকৃতির শোভার ভিতরদিয়া, মার রূপ মাঝে মাঝে দেখিতে পাবে। রূপের ছটা দেখিতে দেখিতে মাকে একদিন দেখিতে পাবে। এইজন্য বলিতেছি এই কয়টী পাহাড়ে দিবসে থাকিবে। এই পাঁচটী পাহাড়ই তোমার আশ্রম। দিবসে গুহায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। রাত্রে ইচ্ছামত থাকিবে। তোমার যেপ্রকার প্রকৃতি তদনুসারে তোমাকে সাধন দিতেছি।—

শি। আমাকে কি করিতে হবে?

বা। যে মন্ত্র দিয়াছি তাহা সকালে ও সন্ধ্যাবেলা জপ করিবে। আর কেবল গাছ; লতা, পাতা, ফল, ফুল, মাটী, পাথর, জল, সমুদ্র, প্রস্রবণ, বালুকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে। গাছের গোড়া হইতে মাথা পর্য্যন্ত, রেণু রেণু করিয়া, দেখিবে; ইচ্ছামত স্পর্শ করিবে, ভাবমত ব্যবহার করিবে, প্রত্যেক বস্তুকে এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে, প্রকৃতির আদ্যন্ত চিন্তা করিবে, আকাশটা যতটা পার কল্পনায় ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে।

পদার্থ সকলের যতগুলা পার একবারে ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে। একটা বস্তুর সুক্ষ্মতম অংশ হইতে বৃহত্তম দেহ পর্য্যন্ত মনে ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে। ইহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। একটা ঘটনা দেখিবামাত্র তার পূর্ব্বঘটনা, আবার তার পূর্ব্বঘটনা, দেখিতে দেখিতে যতটা পার অগ্রসর হইবে; ইহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। দ্রব্যে দ্রব্যে দৃশ্যতঃ তুলনা করিবে। দ্রব্যে দ্রব্যে সংযোগ বিয়োগের ফল প্রত্যক্ষ করিবে, ইহাই প্রকৃত অধ্যয়ন। এই অধ্যয়ন হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎপত্তি। উরোপে এই অধ্যয়ন বাড়িতেছে তাই উরোপ বিজ্ঞানবলে বড়। ভারতে এ অধ্যয়ন নাই তাই ভারতের এত দুর্দ্দশা। এখন এই বিজ্ঞানের পথদিয়া মনস্বীদিগকে ঈশ্বর ধরিতে হইবে। যাঁহারা মনস্বী নহেন, তাঁহারা "নাম" জপিয়া ভগবানে যাইবেন। যাঁহারা মনস্বী প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই প্রকৃতি দর্শনে বিজ্ঞানপথে যোগের মন্দিরে যোগেশ্বরীকে দেখিবেন। মানুষের অধিকার অনুসারে সাধনার পথ ভিন্ন। তুমি প্রতিভাশালী, তোমার পথ কেবল নামজপ নহে। নামজপ যত পার কর। * আর এই ইন্দ্রিয়ে প্রকৃতিকে বিধিপূর্ব্বক ফেলিয়া, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উৎকর্ষে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করিবে— ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানপথ। এই পথে উরোপ, অত্যন্ত অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু উরোপের লক্ষ্য ব্রহ্ম নহে, জীবনের শান্তি নহে—উরোপের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সেবা। ভারতে যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মলাভ জন্য, এবং ভারতে আবার যে বিজ্ঞানপথ খুলিবে তাহা ব্রহ্মলাভের জন্য।

তুমি প্রতিভাশালী-হৃদয়বান পুরুষ। তোমাকে আর একটী নূতন পথ ধরিতে হইবে। সেটী হৃদয়বিচার ও বুদ্ধিবিচারের

সম্মিলন পথ। তোমরা বুদ্ধির বিচারশাস্ত্র পড়িয়াছ। পৃথিবীতে ইহাকে ন্যায়শাস্ত্র বা Logic বলে। কিন্তু বাবা! হৃদয়ের একটী বিচার আছে। বুদ্ধির অনেক বিচার হৃদয়ের বিচারের বিরোধী, আবার হৃদয়ের অনেক বিচার বা ভাব বুদ্ধিবিচারের বিরোধী। এই বিরোধ ভঞ্জন করিয়া অর্থাৎ হৃদয়ের ভাবে বুদ্ধির ভাবে মিলাইয়া এক নূতন বিচার শাস্ত্র তোমাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। পৃথিবীতে তোমাদ্বারা এক নূতন শাস্ত্র প্রচারিত হইবে। তুমি আজ হইতে এই সাধন অবলম্বন কর।



দশম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রূপময় প্রাণ বা প্রাণময় রূপ।

যুবা সাত বৎসর যাবৎ, এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে, শীতের হিমে, গ্রীষ্মের তাপে, বর্ষার জলে, আপনার দেহ মনকে শক্ত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেছেন। কষায়, তিক্ত, অম্ল, মধুর ফল, পাতা, রস, খাইয়া যেন অমৃতভোগে, বিশ্বাস ভক্তিতে, জীবনকে ধন্য বোধ করিতেছেন। যুবার সাধন কোন আসন বা মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁর মন প্রাণকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করে নাই। গুরুকৃপায় প্রকৃতির রূপে, শব্দে, রসে, বিশ্বাস, ভক্তি, ও জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছিল। বিস্তৃত নীলাকাশের কলঙ্কহীন গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, আপনার জীবনকে সেইরূপ গম্ভীর ও পবিত্র করিবার জন্য যুবা রোদন করিতেন এবং রোদনের করুণভাবপ্রবাহে ভাসিয়া, আকাশের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা তাঁর জীবনে বলসঞ্চার করিত। এই রোদনের বলে বনের শ্যামলা কান্তি হইতে মধুরি ও সজীবতা আপনার চরিত্রে আকর্ষণ করিতেন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গময় বিস্তারে কল-কলরবে, মহান্তরের গভীর ভক্তিরস পানে বিভোর হইয়া, সেই রবের সহিত আপনার রব মিশাইতেন। বর্ষায় মেঘরবপূরিত, কুসুমসুবাসিত পৃথিবীর গম্ভীর মুখশ্রী হইতে, কর্ম্মযোগের গভীর পবিত্র উপদেশ লাভে, সংসারে তদনুরূপ জীবন

যাপন জন্য প্রতিজ্ঞায় তেজোপূর্ণ হইতেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-প্রভাবে অন্তরে ভাবের বন্যা আসিলে, চক্ষের জলে নীরব ভাষায়; হৃদয়ের মধ্যে হাতে হাত রাখিয়া, পাহাড়ের আড়ালে চন্দ্র সূর্য্য তারকার উদয়াস্ত দেখিয়া, সংসারে কি ঐ রূপ স্থির গম্ভীর পবিত্র অক্লান্ত সেবাশীল প্রাণের উদয়াস্ত হবে না, এই ভাবিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত অশ্রুমোচন করিতেন।

কখনও এপ্রদেশ হইতে ও প্রদেশে যাইতে যাইতে, প্রকৃতির রেণুতে রেণুতে স্নেহ সিঞ্চিয়া, বিশেষ পদার্থের বিশেষ শোভার অদ্বিতীয়ত্বে বিমুগ্ধ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পদার্থকে আলিঙ্গন চুম্বন করিতেন। কখনও মেঘস্পর্শী পর্ব্বতের পদতলস্থ তৃণপুষ্পের কাছে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতেন। কখনও সন্ধ্যাপূর্ণ জলাশয়ের গাম্ভীর্য্য ও মাধুরির কাছে দাঁড়াইয়া করজোড়ে ভাবের উচ্ছ্বাসে গভীর প্রলাপে প্রকৃতির রসে রস বিস্তার করিতেন; কখনও কখনও দূরস্থ নির্ঝর ও আকাশপূর্ণ জলাশয় তাঁহার কল্পনায় প্রবেশ করিয়া প্রাণে এত আনন্দোচ্ছ্বাস তুলিত যে দুর্ব্বল জ্ঞানেন্দ্রিয় সে বেগে অসাড় হইয়া পড়িত, এবং যুবা প্রকৃতির বুকে নিদ্রিত শিশুর মত ঢলিয়া পড়িতেন।

মানুষের মানসিক অবস্থা দৈহিক অবস্থার অনুরূপ। দেহে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা কখনও অল্প কখনও অধিক, মনেও সেইরূপ। আজ যাহা দেখিবার জন্য প্রাণ পণ করিতেছি, কাল তাহা আর ভাল লাগেনা। যেমন দেহে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোন শক্তিদ্বারা নিয়মিত, হৃদয়ের ভাবও শক্তি দ্বারা নিয়মিত। যুবা প্রকৃতির উপর দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন না। যে অদৃশ্য প্রাণসাগর অনন্ত প্রকৃতিতে উপচিয়া উঠিতেছে, যে অদৃশ্য রূপসাগর চন্দ্র সূর্য্য তারকায় উপচিয়া

পড়িতেছে, যুবা প্রকৃতির ভিতরে সেই প্রাণ ও রূপ আভাসে দেখিয়া আনন্দে প্রমত্ত হইতেন। যখন প্রকৃতির অন্তরালে, সেই প্রাণময় রূপের বা রূপময় প্রাণের প্রকাশ না দেখিতে পাইতেন, তখন প্রাণ যাতনায় অস্থির হইত, বুকফাটিত, মাথাজ্বলিত,—আবার কাঁদিতে, কাঁদিতে যখন মৃতপ্রায় হইতেন, তখন লতায়, পাতায়, ফলে, ফুলে, জলে, স্থলে সেই প্রাণময় রূপের প্রকাশ দেখিতেন; আর অমনি মৃত ব্যক্তি যেন সহস্র জীবন লাভ করিত।

যুবা এইরূপে নীরবযাতনাময় প্রাণে তিন দিন ছট্ ফট্ করিতেছেন, কখনও পাহাড়ে শুইয়া কাতর দৃষ্টি ডুবাইয়া উপরের নীল সমুদ্র শুষিতেছেন; কখনও পার্শ্বে চাহিয়া, শ্যামলা প্রকৃতির রূপ ছিন্ন করিয়া সেই প্রাণপ্রবাহ দেখিতে উন্মত্ত হইতেছেন—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না, এমন সময়ে অদূরে কয়েকটী বৃক্ষের আড়ালে কি দেখিয়া আশা ভরসা, যোগ আরাধনা, উদ্যম উৎসাহের অতীত দেশে আত্মহারা হইলেন;—যুবার মন বুদ্ধি দৃষ্টি সব স্থির হইয়া গেল।

ভীষণ নিদাঘের স্থির গম্ভীর পূর্ব্বাকাশে, বৃক্ষসকলের আড়ালে, পূর্ণিমার চাঁদ যেমন রূপের আলোকে সেদিকের আকাশ, অন্ধকার ও সমস্ত পদার্থকে ডুবাইয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, সেইরূপ যুবার নিদাঘবৎ জীবনকে আলোকিত করিয়া, পূর্ব্বদিকের আকাশ ও তরুলতাকে জ্যোৎস্নাপূর্ণ করিয়া এক অপার্থিব চাঁদ বনের ভিতরে উদিত হইল। যেন আকাশের চাঁদ বন নির্জ্জন দেখিয়া সেখানে বিচরণ করিতে আসিয়াছে। যুবা যাতনাময় প্রাণে সেই চাঁদের দিকে চাহিলেন। বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়াই রহিলেন; যেন ধর্ম্ম রূপ ধারণে যুবার মন প্রাণ

কাড়িয়া লইলেন। যুবা জগতের অসংখ্য রূপের মধ্যে চাঁদকে সুন্দরতম বোধে চাঁদের দিকে চাহিয়া, আর সব ভুলিতেন; এখন চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলকে এই রূপপ্রভায় মলিন দেখিয়া, উহার রূপে সকলকেই ভুলিয়া গেলেন। যুবা স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে আপনার অস্তিত্ব ঢালিয়া, সেই সৌন্দর্য্যে মিশিতেছেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্র হইতে রূপ রস আকর্ষণ করে, যুবা সেই রূপ হইতে রূপ রস আকর্ষণ করিতেছেন। দৃষ্টি, আর চক্ষে নাই—(সেইরূপে অনেক জন্মের সাধ মিটাইতে,) মহাযজ্ঞে মহাভোজ্য ভোজনের মত, সেই রূপে ডুবিয়া তলা পাইতেছে না। মন আর দেহে নাই,—জগতের আর সব মননীয় বস্তু দূরে ফেলিয়া, সেই রূপকে মনন করিতে গিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছে। সেই রূপ রাশি বৃক্ষগুলি অতিক্রম করিয়া যুবার পাহাড়ের দিকে আসিতেছে, এদিক হইতে ওদিক যাইতেছে, গাছের পাতা, ফুল, ফল তুলিতেছে; যুবা কেবল রূপইদেখিতেছেন; রূপ সচল কি অচল তাহা বুঝিতে-ছেন না। রূপের সহিত এক হইয়া যুবা পাতা তুলিতেছেন ফল ফুল তুলিতেছেন, এদিক হইতে ওদিকে যাইতেছেন অথচ রূপ সচল কি অচল বুঝিতেছেন না। যুবা পাহাড়ে শুইয়া, সেই রূপের সঙ্গে মনে মনে এক হইয়া, অস্তিত্বে অস্তিত্বে এক হইয়া, দূরে যাইতে যাইতে—যেন স্বর্গের এক এক তালায় উঠিতে উঠিতে, হঠাৎ রূপ হইতে পৃথক হইয়া, ঝুপ্ করিয়া আপনার দেহে পড়িয়াগেলেন। সমস্ত অস্তিত্ব অমনি ভয়ে দুঃখে ক্ষোভে শোকে কাঁপিয়া উঠিল—যাতনায় চীৎকার করিলেন "উঃ কি হল! কোথায় গেল"! যুবা রূপের বিরহে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পাহাড় হইতে নামিলেন, দ্রুত বেগে উন্মাদের মত সেই দিকে ধাবিত

হইলেন; এদিকে ওদিকে বনপোড়া হরিণের মত ছুটাছুটি করিলেন; কিন্তু সে রূপ আর দেখিতে পাইলেন না। কাঁদিতে থাকিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যে বৃক্ষগুলির আড়ালে সেই রূপরাশি প্রথম দেখিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষগুলিকে আদরে আলিঙ্গন চুম্বন করিয়া কিছু তৃপ্তি পাইলেন; সেখানকার ধুলা বুকে মাখিয়া কিছু তৃপ্তি পাইলেন। কিন্তু সেই সামান্য তৃপ্তিতে তৃষ্ণা আরো বাড়িয়া উঠিল। যুবা যাতনায় আগুণ হইয়া, চক্ষের জলে আগুণ ফেলিতে, ফেলিতে, সেই কাঁটাবনে শৈলখণ্ডে বসিয়া অধোমুখে ভাবিতেছেন "এ কি দেখিলাম? মানবী না দেবী? যেন উলঙ্গিনী বোধহইল; যেন যুবতী বোধ হইল; এই নির্জ্জন বনে উলঙ্গিনী যুবতী রূপবতী দেখিয়া আমার মনে যে পবিত্র ভাবের ঝড় উঠিল, চক্ষু যে পবিত্র বৃষ্টি বর্ষণ করিল, তাহাতে মানবী বলিয়া বোধ হয় না। গুরুদেব যে দেব দেবীর কথা বলেন—তাই না তো? আহা! আজ হইতে বিশ্ব শোভাহীন হইল। শব্দের মাধুরি, রূপের মাধুরি, সব আমার কাছে কুৎসিৎ হইল। আমি এই কদাকার জগতে কি প্রকারে বাস করিব? আমি তাঁরে সম্ভাষণ না করিলাম কেন? আমি একি দেখিলাম? বাস্তব পদার্থ না জাগ্রত স্বপ্ন? এমন রূপবতী রমণী বোধ হয় জগতে কেহ কখনও দেখে নাই! আমি প্রকৃতির শোভার ভিতরে যে প্রাণময় রূপ সময়ে সময়ে দেখি, যেন সেই রূপ, মূর্ত্তি ধরিয়া সুন্দরী যুবতী সাজিয়া, আমাকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল। সেই পীনস্তনী নিবিড় নিতম্বীর উলঙ্গ রূপের আড়ালে, চন্দ্রতারকাশোভিত আকাশের ভিতরের সেই প্রাণময় রূপের স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলাম। যেন সেই রূপময়ী প্রাণমূর্ত্তি পূর্ণ যুবতীর সৌন্দর্য্যে আমার জীবনে সদ্ভাবের সমুদ্র

ছড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। আর অন্যতপস্যা করিব না। যদি যোগ তপস্যা করি, তো, সেই রূপবতীকে আবার দেখিবার জন্য। গুরুদেব! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি তপস্বী হইয়া রমণীরূপের উপাসক হইলাম। সাতবৎসর যাবৎ শীতে রৌদ্রে জলে, তিক্ত, কষায়, ফল মূল খাইয়া যে কঠোর সাধন করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় রসাতলে গেল; অথবা সেই তপস্যারই পুণ্য-ফল-স্বরূপ, ঐ রূপময়ীকে একবার মাত্র দর্শন করিতে পাইলাম। ওরূপ দর্শন, যে, কঠোর তপস্যার উপযুক্ত ফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? একি আবার সেই বনলতার ভাব? একবার ভাল করিয়া বিচার করি। বনলতার দর্শনে বিষমিশ্রিত অমৃত ভোগ হইত; বনলতার রূপস্পর্শে বাতাস যেন গরম হইয়া উঠিত; বনলতার অধরোষ্ঠের মধ্যস্থ রূপামৃত, চুম্বনে প্রবাহিত হইয়া আমার অস্তিত্বে যেন আগুণ বর্ষণ করিত; তখন রূপমোহে বা কামমোহে এসব বুঝিতে পারি নাই। এখন এই রূপের আলোকে বেশ বুঝিতেছি। এই রূপের ইহাও এক আশ্চর্য্য মহিমা! আমার জীবনের অতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ সকল রাক্ষসের ন্যায় ভয়ানক বোধ হইতেছে। যে জীবনে এত পাপ করিয়াছি, সে জীবনে ও রূপ অধিক ক্ষণ দেখিবার উপযুক্ত নহি।

"আহা! আহা! কি সুন্দর রূপই দেখিলাম! ক্ষুধায় মৃতপ্রায় ব্যক্তি যেরূপ দেখিলে ক্ষুধা ভুলিয়া শত হস্তির বল পায়, আমি যেন সেই রূপ দেখিলাম। অন্ধকার খুব নিবিড় হইয়াও যে রূপ ঢাকিতে পারে না; জিতেন্দ্রিয় বৈরাগী যে রূপের আহ্বানে আপনার কঠোরতা সামলাইতে পারে না; আমি যেন সেইরূপ

দেখিলাম! পৃথিবীর সৌন্দর্য্য প্রভাবে, শাস্ত্রের উপদেশে, কাব্যের রস সমুদ্রে থাকিয়াও যে জীবনে কোমলতার আবির্ভাব হয় নাই, ও রূপ দেখিলে—সে জীবন প্রণয়ে আকুল হইবেই হইবে"।

যেমন উষার দর্শনে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়, বনে ফুল ফুটে; তরু,লতা, তৃণ, পুষ্প, শিশিরছলে আনন্দাশ্রু মোচন করে, এই যুবতীকে দেখিয়া আমার জীবনে সেই রূপ অবস্থা হইল! আহা! আমি কি রূপই দেখিলাম!

যেমন চাঁদ আকাশের অল্পস্থান অধিকার করিয়া অনন্ত জগৎকে আলোকিত করে, সেইরূপ এই যুবতী এই বনের অল্পস্থান অধিকার করিয়া অনন্ত, অসীম, দেশ কালাতীত, অমর আত্মাকে, আলোকিত করিয়া গেল! আহা! আমি কি রূপই দেখিলাম।

প্রাতঃকালে সূর্য্য যেমন আপনার করস্পর্শে পদ্মকে রূপে গন্ধে ফুটাইতে থাকে, এই যুবতী রূপস্পর্শে আমার হৃদয়পদ্মকে সেই প্রকার রূপের সৌরভে ফুটাইয়া গেল। আহা! আমি কি দেখিলাম!

কবি যেমন আপনার কাব্যে প্রতিভাবলে কতই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, এই যুবতী আপনার রূপবলে আমার জীবনের মরুভূমিতে নন্দন কানন সৃজিয়া, রসের সাগর বর্ষিয়া, আমার বুদ্ধিকল্পনাকে প্রকাণ্ড করিয়া, বুকের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডটাকে পুরিয়া দিয়া, কোথায় অদৃশ্য হইল! আহা আমি কি দেখিলাম!

সেই রূপসী যদি বধিরের কর্ণকুহরে চুপে চুপে কথা কহে তো, তৎক্ষণাৎ বধিরতা দূর হয়। যদি অন্ধের চক্ষে পদ্মহস্ত বুলায়, তো তৎক্ষণাৎ অন্ধতা দূর হয়! আমি কি দেখিলাম!

আহা সেরূপ স্মৃতিতে ধরিয়া শত বৎসর অনাহারে অনিদ্রায়

থাকিলেও ক্লেশ বোধ হয় না। যদি মরি তো, আমার অস্থি কঙ্কাল যেন এই যুবতীর পাদস্পৃষ্ট মাটীতে থাকিয়া, সেই মাটীর সঙ্গে মাটী হয়। হে ভগবান! তোমার নিকট আমি এই প্রার্থনা করি।

হায়! একি স্বপ্ন? না সত্য? যদিও চক্ষে আর তাঁকে দেখিতেছি না, আমার স্মৃতিতে তাঁর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এমনি অঙ্কিত হইয়াছে,—এমনি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, আমি প্রত্যেক রোমের বর্ণনা করিতে পারি। চিবুকে একটী তিল—কালর এত রূপ জীবনে দেখিনাই। হায়! হায়! আমার এত দিনের তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য কি কোন দেবী ছলনা করিয়া গেলেন? কিন্তু সেমূর্ত্তিখানি যেন সরলতা ও রূপের মিশ্রণ বলিয়া বোধ হইল। আমার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না; যদি মুরি তো আমার অস্থি যেন এই খানে সেই যুবতীর পাদস্পৃষ্ট মাটীতে থাকিয়া বিশ্রাম পায়।

—:•:—

শেষ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

সিদ্ধা বিমলা।

চন্দ্রনাথতীর্থ হইতে দশক্রোশ দূরে, সমুদ্রতীরে, "শিবনাথ" নামে কয়েকটী পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে প্রস্তর মিশ্রিত লাল মাটী। তরু লতায় পাহাড় গুলি আচ্ছন্ন। ছোটনাগপুরে প্রস্তর ময় পাহাড়ের শুষ্ক, উলঙ্গ, শোভা; আর চন্দ্রনাথ অঞ্চলে পাহাড়ের সরস শ্যামল শোভা,। পাহাড়ের তলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত নয়ন ক্ষেপ করিলে, মনে হয় বিধাতা বৃক্ষ সকলকে উপরে উপরে সাজাইয়া বৃক্ষের একটী অতি প্রকাণ্ড "তোড়া" বাঁধিয়াছেন। উদ্যানে, বনে, জলে গাছের নানা মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশে চন্দ্রনাথ অঞ্চলে গাছের সমুদ্র আছে। যেমন জলের বিন্দু, জলের ডোবা, জলের সরোবর, জলের হ্রদ, জলের নদী থাকিলেও সমুদ্রে জলের প্রকাণ্ড বিস্তার, প্রকাণ্ড গভীরতা; সেইরূপ চন্দ্রনাথ অঞ্চলে বৃক্ষের সমুদ্র।

এই সব বনে বাঘের বড় ভয়। "শিবনাথ পাহাড়" গুলি এই রূপ বৃক্ষসমুদ্রে আচ্ছন্ন, বাঘের বাসস্থান। এই পাহাড় গুলির যেটী সমুদ্রের নিকটস্থ তার শোভা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাহাড়ে, সাগরে, আকাশে মিশিয়া সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য মূর্ত্তি। এই সব পাহাড়ের

শোভা, যেন বালিকাস্ত্রীর মত, সমুদ্রশোভার কোলে শুইয়া রহিয়াছে। সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের একটী বটবৃক্ষতলে একটী পর্ণকুটীরে, একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, তপস্যা করেন। ইহাঁর নাম বিমলা।

বিমলার কুটীরে, কুটীরের ধারে, পাহাড়ের গায়ে, সাগরের ধারে, একটী পরমা সুন্দরী বালিকা উলঙ্গিনী হইয়া, বনের বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষীর মত পূর্ণ স্বাধীনতায় বর্দ্ধিত হইতেছে। মেয়েটি বিমলাকে "মা" বলে। বিমলা ফল মূল খাওয়াইয়া মেয়েটীকে বড় করিতেছেন। বনে থাকিয়া বালিকার সাহস, বল, উদ্যম, একাগ্রতা, সরলতা, সমাজপালিতা বালিকা অপেক্ষা অনেক অধিক।

বালিকার যখন আট বৎসর বয়স, একদিন বিমলা তাহার অজ্ঞাতে, সমুদ্র জলে জপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

বিমলা প্রাণত্যাগ করিলে, বালিকা কয়েক দিন একটু বিমর্ষ ছিল, তার পর একলা অকুতোভয়ে, মহানন্দে, মহাসাহসে, বন বিহঙ্গিণীর মত প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্য গৃহে, কাল যাপন করিতে লাগিল।

এই বালিকাটী—কে?



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

সেই ঝড়ের পর।

পাঠকপাঠিকা! প্রথম পরিচ্ছেদে, আড়াই বৎসরের রাজকন্যা, আকাশগঙ্গাকে জানেন। বিধুমুখী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতী, এই বালিকার ধাত্রী। রাজবাটীর এই দাসী—ধাত্রীকে আকাশগঙ্গা, মাতৃবৎ জ্ঞান করিত। বিধুমুখীর কাছ ছাড়িয়া আকাশগঙ্গা এক দণ্ড থাকিতে পারিত না। বালিকা মাকে "রাণীমা" এবং ধাত্রীকে "মা" বলিত। ধাত্রীর কাছে থাকিলে বালিকা "রাণীমা"কে চাহিত না। যেন ধাত্রী বিধুমুখী তার প্রকৃত মা।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঝড়ের দুই ঘণ্টা আগে, বিধুমুখীর হাত ধরিয়া আড়াই বৎসরের আকাশগঙ্গা, গ্রামের মধ্যস্থলের গোল পুকুরের বাগানে ফুল তুলিতেছিল। ঝড়ের শব্দ শুনিবামাত্র, লতা, পাতা, ধুলা, খড় উড়িবামাত্র, বিধুমুখী তাড়াতাড়ি, আকাশ-গঙ্গাকে, কোলেধরিয়া, রাজবাটীর দিকে দ্রুত ছুটিতে লাগিল। ঝড় পথের মধ্যেই, আকাশগঙ্গা সহিত ধাত্রীকে আক্রমণ করিল। বিধুমুখী গতিক খারাপ দেখিয়া, পথের ধারের এক দোকান ঘরে প্রবেশ করিল। ঝড় বাড়িতে বাড়িতে ঘরের চাল উড়িয়া গেল।

এবং কিয়ৎক্ষণপরে ভীষণ ঝড় বেগে আকাশগঙ্গাসহিত বিধুমুখী আকাশে উড়িল। আকাশে উঠিবামাত্র, বিধুমুখী একবার ‘বাবা-গো” ! বলিয়া চীৎকার করিয়াই, মুৰ্চ্ছিতা হইল। আকাশগঙ্গা ইতিপূৰ্ব্বে ঘরের চাল উড়িবামাত্র “ওগোমাগো” ! রবে চীৎকার করিয়াই মুৰ্চ্ছিতা হইয়াছিল। মুৰ্চ্ছিতা আকাশগঙ্গা, মুৰ্চ্ছিতা বিধুমুখীর, মৃত আলিঙ্গনে, থাকিয়া ঝড়বেগে উড়িতে উড়িতে, কোন খানে বাধা না পাইয়া, কিয়ৎকাল মধ্যে কুড়িক্রোশ দূরস্থ এক পল্লীস্থ কোটাবাটীতে পতিত হইল। তাহাদের পতনের সময় “দুম্” “দড়াম” করিয়া কোন শব্দ হয় নাই। যেন পবনদেব স্কন্ধে করিয়া, তাহাদিগকে সেই বাটীর উঠানে নামাইয়া দিল। উহারা উঠানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণপরে ঝড়ের বেগ সে অঞ্চলে কমিয়া আসিল। সেই কোটা বাটীর এক ঘর হইতে এক মদনমূৰ্ত্তি যুবা, বাহির হইল। তখন অল্পরাত্রি হইলেও ভীষণ অন্ধকার ;—বিদ্যুতালোকে পৃথিবী মাঝে মাঝে আলোকময়ী হইতেছে। যুবা বিদ্যুতালোকে অকস্মাৎ উঠানে জলস্রোতে, ঝড়বাহিত আবর্জ্জনার মধ্যে স্বর্ণ হীরা মুক্তা চক্‌মক্ করিতে দেখিয়া, চমকিত হইল। আবার বিদ্যুতালোকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল একটা মানুষ তার দুইটা মাথা—একটা বড়—একটা ছোট—সেই দেহে অলঙ্কারের চক্‌মকানি।

যুবা ধীরে ধীরে উঠানে নামিল। অন্দাজে সেই স্থানের কাছে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিল, তাহাতে বড় আনন্দ। কারণ সেই দেহের গায়ে প্রায় দশ বার হাজার টাকার গহনা। তখন যুবা চীৎকার করিয়া তার স্ত্রীকে লণ্ঠনের আলো বাহিরের দাওয়ায় আনিতে বলিল। ঝড় ও জলের বেগ সত্ত্বেও

অনেক কষ্টে একটা লণ্ঠন স্ত্রী ঘরের বাহিরে আনিল। কিন্তু সে আলো নিবিয়া গেল। আলো নিবুক, যুবা অল্পক্ষণস্থায়ী আলোকেই প্রাঙ্গনপতিত মূর্ত্তিকে খুব জোরে বুকে ধারণ করিল। যুবা যাহাকে জাপটাইল তার রূপ কি বয়সের কোন কথা না ভাবিয়া, মৃত কি জীবিত কোন চিন্তা না করিয়া, মৎস্যলোভী বিড়ালের মত, সেই গহনাগুলির লোভে ঘরে লইয়া গেল। সেই যুবতী ও বালিকাকে বুকে ধরিয়া যাইতে যাইতে একটা নিঃশ্বাস অনুভব করিল। ঘরের মেজেতে শুয়াইল। যুবতীর শক্ত আলিঙ্গনে বালিকা রহিয়াছে। ঘরের আলোকে যুবা, যুবার মা, স্ত্রী ও একটী ভগিনী রূপবতীর আলিঙ্গনে আলোকময়ী আকাশগঙ্গাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। উহারা, "যেন সোণার পুতুল গো"! বলিয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলিল। তার পর বালিকাকে অনেক কষ্টে পৃথক করিয়া কম্বলে শুয়াইল। বালিকার বুক অল্প কাঁপিতেছিল। যুবা উহাদের অজ্ঞানাবস্থায় তাড়াতাড়ি বালিকার গহনাগুলি খুলিতে খুলিতে মা ও স্ত্রীকে বলিল 'এদের এইবার নদীর জলে ফেলতে হবে"।

মা। কাদের মেয়েরে? ঝড়ে উড়ে এল!

যু। যাদেরই হক, এখন আমাদের কপাল খুললো। নহিলে বাটীর মধ্যে দশ হাজার টাকা, উড়ে আসে,।

দুইজনে কথা হইতে হইতে, বিধুমুখীর একটু সংজ্ঞা হইল। একটু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল!

যুবা রূপবতী বিধুমুখীর চাঁদমুখের দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবিতেছিল "এটা বাঁচেতো, উপপত্নী করিয়া রাখিব; আর এই

খুকিটেকে নদীর জলে এই রাত্রেই ভাসায় ; একোন রাক্ষসমেয়ে — একে ঘরে রাখলে ধরা পড়বো"।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মাকে বলিল। মা বলিল "না না এমন কাজ করতে আছে বাবা! আমাদের বাড়িতে দুজনেই থাকুক, বাঁচুক তারপর যা হয় করা যাবে। এদের গা হিম্ বরফ, ছোট মেয়েটার বুক টিপ্ টিপ্ করছে, একটু আগুনের তাপ দিলে ভাল হবে। গহনাগুলা রেখে দাও—ও আর কে ধরবে? প্রাণ যিনি দিয়েছেন তিনি লবেন। কাল সব জগন্নাথ যাব—আর আজ এত মহাপাপ কি মনে করতে আছে?

কিছুক্ষণ পরে, মেয়েটার সংজ্ঞা হইল। ফুট্ ফুট্ করিয়া চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল—ঘুমাইয়া পড়িল—মুর্চ্ছারপর নিদ্রা। বিধুমুখীরও চৈতন্য হইল। বিধুমুখী চক্ষু চাহিল। প্রদীপের আলোকে সেই রূপের দৃষ্টি যুবার দৃষ্টির উপরে পড়িল যুবার বুক গুর, গুর, করিয়া উঠিল। যুবতী চক্ষু চাহিয়া ভাবিল "কোথা"? ক্রমে ক্রমে সব মনে হইল—চমকিয়া দুঃখে ভয়ে "খুকী! খুকী"! বলিয়া চীৎকার করিল। গৃহিণী ও বধু তখন সেই গহণা গুলি, সিন্ধুকে পুরিতে অন্যঘরে গিয়াছে, যুবা সেইখানে বসিয়া আছে।

বিধুমুখী দুইবার 'খুকি! খুকি"! বলিয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলে, যুবা বলিল "ভয় কি? তোমার খুকি বিছানায় ঘুমাচ্ছে"। বিধুমুখী দ্রুত উঠিয়া খুকীর দেহে প্রাণ অনুভব করিয়া, একটু ঠাণ্ডা হইল। তার পর যুবার রূপের দিকে তাকাইল—সে মদনমোহন রূপ যুবতীর প্রাণ ভেদ করিল—

মেয়েটাকে কোলে করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে বিদায় হইলেন। আপনার সাধনস্থল—সমুদ্রতীরস্থ শিবনাথ পাহাড়ে লইয়া গেলেন। যোগিনী সিদ্ধা। বশীকরণ শক্তি প্রেম বলে অত্যন্ত অধিক। অকাশগঙ্গা তাঁহাকে দেখিয়া অবধিই যেন ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়াছিল। বালিকা সেই মূর্ত্তিকে যত ভাল বাসিত এমন আর কাহাকেও নহে। বিধুমুখী অপেক্ষা অনেক অধিক। যোগিনীর নাম "বিমলা"। তীর্থস্থলে অনেকে তাঁহাকে 'সিদ্ধা বিমলা'

সেই [illegible] এ নাম কোথা" ?

যু। শ্বশুর বাড়ি।

বি। শ্বশুর কে ?

যু। আমার বাবা।

গৃহিণী ও বধু গহনাগুলা, সিন্ধুকে পুরিয়া, সেই ঘরে ফিরিল যুবতীকে খুকীর কাছে বসিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিতা হইল।

গৃ। হাঁগা তোমাদের ঘর কোথা ?

বি। আর ঘরের পরিচয় শুনে কিহবে ? দুইচার দিন পরে পরিচয় দেব।

গৃ। মা! ঝড় যদি থামেতো কাল আমরা সব শ্রীক্ষেত্র যাব। এই মাসের পঁচিশ দিন। পথে যাবে একমাস। কাল বেরুতেই হবে।

বি। আমিও যাব।

গৃ। বেশ তো মা!

বি। আপনারা ?

গৃ। ব্রাহ্মণ মা! ছেলের গলায় পৈতা দেখ্‌লে না।

তোমরা ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

বনে আকাশগঙ্গা।

সৌন্দর্য্যের প্রাণস্বরূপ বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ সেই সুন্দরী, সেই অরণ্যও সমুদ্রের মাধুরি বর্দ্ধিত করিয়া, বনদেবীর মত বাস করিতেছেন। সেই নির্জ্জনতায় বিধাতা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁর রূপের আদর্শে চরাচরের সৌন্দর্য্য ফুটাইতেন। বিধাতা চাঁদকে আকাশগঙ্গার মত সুন্দর করিতে-গিয়া পারিতেছেন না, বলিয়া প্রতি তিথিতে ভাঙিয়া ভাঙিয়া গড়িতেছেন। সেই কণ্ঠস্বরের আদর্শ দেখিয়া চরাচরে কত মধুর স্বরের সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু তেমনটী হইতেছে না বলিয়া সে অনুশীলন আর ফুরাইতেছে না। আকাশগঙ্গার অবয়বের প্রত্যেক অংশ এবং সমস্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য—দুইএ তুলনা না করিলে বিধাতার শিল্প চাতুরি বুঝা যায় না। অতি কুৎসিৎ পদার্থকে সে রূপের কাছে রাখিলে কুৎসিৎ আর কুৎসিৎ থাকে না। সেই অতুল রূপের আকাশগঙ্গা যেন রূপের স্পর্শমণি। প্রকৃতির যে অংশে আকাশগঙ্গা নাই তাহা সৌন্দর্য্যের পূর্ণিমা হইলেও অমাবস্যা।

যদি সুচতুর বিধাতা ইহাঁকে জনসমাজে রাখিয়া ফুটাইতেন, তো, বিধাতার সৃষ্টিবুদ্ধির দোষ দৃষ্ট হইত। কারণ চির দিন

সমভাবে পরিচালিত; দিন, মাস, বৎসর, শাসিত জনসমাজে; চির দিনের জন্য এক সুরে বাঁধা সুখ দুঃখময় সংসারে; ঐ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আপনার পুষ্টিকর সামগ্রী না পাইয়া বিবর্ণ হইত। মানুষের যে সংসার আকাশের অত দূর হইতে দেখিয়াও, পূর্ণিমার চাঁদ কলঙ্কিত হইয়াছে;—যাহার সংস্পর্শে যুবতীর যৌবন জোয়ারের জলের মত ক্ষণাস্থায়ী হইয়াছে; যেখানে শিশুর কচি হাসিতে মৃত্যুর কালিমা লুককায়িত রহিয়াছে; যেখানে যৌবন আনন্দের হাস্যে দুঃখের কলঙ্ক এড়াইতে পারিতেছে না; সে মানব সমাজ ও রূপের যোগ্য নিবাস নয়। বিধাতা এই নিমিত্ত সৌন্দর্য্যের নিকেতন স্বরূপ অরণ্য, পর্ব্বত, ও সমুদ্রের মধ্যে ও রূপকে রাখিয়াছেন।

আকাশে চাঁদের আলো ও মেঘে রামধনুরমত জলে আকাশের ছায়া এবং চন্দ্র সূর্য্য করের রঙ্গিন লীলার মত স্থলে ফুলের সুষমা এবং সুন্দরীর লাবণ্যের মত মানবমনের একটা অংশ বা প্রকৃতি আছে। জনসমাজের নীরস রীতি পদ্ধতিতে কয় জনের সে অংশ বা প্রকৃতির বিকাশ হয়? আকাশে নবীন নীরদের সৌন্দর্য্য স্পর্শে যে অংশের অমৃত প্রবাহে পৃথিবীতে অমর কবিতায় স্বর্গসৃষ্টি হইয়াছে; চাতকের স্বর মাধুরি সম্ভোগে যে অংশের স্বর মাধুরিতে পৃথিবীর বায়ু চিরসঙ্গীতময় হইয়াছে; মানব প্রকৃতির যে অংশ ফুটিলে, মনুষ্য যেন স্পর্শমণিস্পর্শে দুঃখময় সংসারে কেবল সুখই অনুভব করে; আকাশগঙ্গার সেই কোমলাংশ ফুটাইবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে নানা শোভার ভাণ্ডার স্বরূপ অরণ্য, পর্ব্বত ও সমুদ্র সংসর্গে রাখিয়াছেন। অরণ্য, পর্ব্বত, সমুদ্র ও আকাশ তাঁর পিতা, মাতা, ও শিক্ষকের

কার্য্য করিতেছেন জীবনের ভাব কুসুম ফুটাইবার জন্য, আকাশগঙ্গা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মেঘের বিচিত্র শোভানিঃসৃতি যে মদিরা পান করিতেছেন সেরূপ মদিরা আর কোথায়? সূর্য্যচন্দ্র স্বর্ণ কলসের মত, সমুদ্রে ও আকাশে শোভা বিস্তারে কাঁপিতে কাঁপিতে যখন জলে ডুবিত; এবং, বিষণ্ণ প্রকৃতির শোকাকুল কণ্ঠ হইতে যখন বিরহগীত উঠিত, তখন আকাশগঙ্গা বিশ্বকবিতার গম্ভীর করুণ রসে যে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেন, সেরূপ কবিতা আর কোথায়? অথবা যখন বনের শাখায় বিহঙ্গগণ মধুর স্বরে গীত গাইয়া বনের কুসুমে কুসুমে সৌরভবৃদ্ধি করিত, সে স্বরে আকাশগঙ্গার জীবনে যে আনন্দ উঠিত, মানবসমাজে মানব কণ্ঠে সে অমৃত কোথায়? অথবা বর্ষাকালে বর্ষণের শব্দের সহিত সমুদ্রের গর্জ্জন মিশিয়া, যখন বিধাতার অপূর্ব্ব বীর কাহিনী কীর্ত্তিত হইত; এবং যখন বজ্রধ্বনির সহিত অন্ধকারের গাম্ভীর্য্যে বন, সমুদ্র ও পর্ব্বত বিধাতার গাম্ভীর্য্যে উথলিয়া উঠিত, তখন আকাশগঙ্গার হৃদয়ে যে গাম্ভীর্য্যের প্রকাশ পাইত, মানব সমাজে কোন বাগ্মীতায় বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন বীরের হুঙ্কারে সে গাম্ভীর্য্যরসের উদয় হইতে পারে? অথবা নিবিড় বর্ষার শীতল বাতাসে বনকুসুমের শীতল গন্ধে দেহপ্রাণে যে সুশীতলা শান্তির সঞ্চার হইত মানব সমাজে কোন সুগন্ধে সে শান্তির প্রকাশ হইতেপারে?

আকাশগঙ্গার জীবনে মৃত্যুচিন্তা কখনও আসিত না। আপনার প্রকৃতি সঙ্গত আকাশ, বন ও সমুদ্র দর্শনে মনে মৃত্যুচিন্তা কখনও প্রবেশ করিত না। বনের ফুল শুকাইয়া মাটীতে মিশাইয়া যায়; পাখীর স্বর কিছু ক্ষণ পরে অন্তর্হিত হয়; এসব দেখিয়াও মরিবার চিন্তা মনে আসিত না। দেহের লাবণ্য কখনও মলিন হইবে;

রক্ত কখনও শীতল হইবে; মাংস কখনও কুঞ্চিত হইবে; এসব চিন্তা কখনও মনে উঠিত না।

সেই বনে তাঁহার জীবনে যৌবন যেন আকাশের চির পূর্ণিমার মত থাকিবে, এইরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়া, প্রকৃতির রূপসাগরে যেন স্বর্ণপদ্মের মত ভাসিতেন। আনন্দে আপনাকে এই অসীম আকাশ, গভীর সমুদ্র ও নিবিড় অরণ্যের যেন রাণী বলিয়া মনে করিতেন অর্থাৎ আকাশের প্রকাণ্ড নীলিমা, অসংখ্য নক্ষত্র, দীপ্তিশালী সূর্য্যচন্দ্র; অনন্ত শব্দময় নীল সমুদ্র এবং নানা বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন অরণ্য; এসব তাঁরই জন্য সৃষ্ট—ইহাদের তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। আকাশের সূর্য্য চন্দ্র অস্তমিত হইলে, যেন তাঁর প্রাণের সামগ্রী হারাইতেন এবং উহাদের বিরহে কাতর হইয়া কখনও কখনও অশ্রুপাত করিতেন। আবার আকাশের এক কোণে সেই সোণার সূর্য্যচন্দ্রকে সমুদ্রের জলে স্বর্ণ কলসের মত ভাসিতে দেখিলে, আনন্দে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেন এবং কখনও সঙ্কেতে কখনও বা অবোধ্যশব্দে তাঁহাদিগকে সোহাগ করিতেন। আলোকময় দিনকে আঁধারময় রাত্রে ডুবিতে দেখিয়া অবাক হইয়া, কখনও কখনও অশ্রুপাত করিতেন। সেই এক বিন্দু অশ্রুতে কতই বিমল উচ্চভাব ঘনীভূত হইত। আবার পূর্ব্বাকাশে, দিনের সৌন্দর্য্যছটা দেখিয়া বিমলানন্দে বিগলিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বালিকার মত নৃত্য করিতেন। বনে কোকিল পাপিয়া ডাকিলে তিনিও অবিকল তদ্রূপ শব্দ করিতেন। কখনও কোকিল পাপিয়ার শব্দানুকরণে উহাদের কর্ণে মদিরা ঢালিয়া উহাদের কণ্ঠকে উত্তেজিত করিতেন। কখনও পুষ্প বিশেষের শোভায় মোহিত হইয়া, উহাকে অবোধ্য ভাষায় সোহাগ

করিতেন। কখনও ভগ্নশাখ বৃক্ষের রস নির্গত হইতে দেখিলে, সেস্থানে যাতনা সন্দেহে ধীরে ধীরে ফুঁদিতেন, কভু বা শান্ত্বনার বাক্যে রোদন করিতেন। তবে সামাজিক মানুষের মত হাসি বা কান্না অধিক মাত্রায় দেখা যাইত না।

রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের বা খদ্যোতজ্বলিত বনের অনু-করণে আটা দ্বারা খদ্যোত নিজদেহে সংযুক্ত করিতেন এবং খদ্যোতজ্যোতি-শোভিতা হইয়া রাত্রিদেবীরমত বনে, পর্ব্বতে ও সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

জলপদ্ম, স্থলপদ্ম ও জ্যোৎস্নাপদ্ম।

বনদেবী আকাশগঙ্গা, দুইটী জগতের শোভায় বিমোহিত। একটী স্থূল একটী সূক্ষ্ম। একটী প্রকৃত, একটী প্রকৃতের ছায়া। কিন্তু ছায়া তাঁর কাছে প্রকৃত। জলাশয়ের নির্ম্মলজলে বনের এবং আকাশের প্রতিবিম্বকে একটী আলাদা জগৎ বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। জলের ভিতরের সেই মনোহর জগৎ হইতে একটী পরমাসুন্দরী বালিকা তাঁকে সর্ব্বদা উঁকি মারিয়া দেখেন। জলের ধারে বসিলে, সেই মূর্ত্তিও তাঁরমত বসিয়া, জলের ভিতর হইতে, তাঁর চক্ষুর সম্মুখে চক্ষুদুটী রাখিয়া, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি করেন। স্থূল ও সূক্ষ্মজগতে সেই বালিকারমত মনোহর বস্তু আকাশগঙ্গা কখনও দেখেন নাই। তিনি সেই মেয়েটীকে দেখিবার জন্য দিনে রাতে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকেন। তাঁহারা একসঙ্গে এক সময়ে একরূপ পদার্থ পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে, আনন্দে অধীরা হন। তাঁহারা পরস্পরকে সুন্দর ফল, ফুল, পাতা, এবং হাসিতে হাসিতে কিল, চড়, ঘুসী প্রভৃতির মত অঙ্গ ভঙ্গিমা দেখাইয়া দিনে রেতে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। জলের নিকট হইতে স্থানান্তর হইলে আর বালিকাটীকে দেখিতে পান না, এজন্য আকাশগঙ্গা কত শব্দে সোহাগ করিয়া তাঁহাকে জল হইতে

উঠাইবার প্রয়াস পান। আকাশগঙ্গার অঙ্গভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমূর্ত্তিটী অঙ্গভঙ্গি করেন, কিন্তু শব্দের প্রতিধ্বনি করেন না। এজন্য আকাশগঙ্গা কখনও ভাবেন, উনি বুঝি গাছপালারমত অঙ্গসঞ্চালন ভিন্ন আর কিছু পারেন না। কিন্তু যখন জলেরধারে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া জোরে তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন, তখন জলাশয়ের পার হইতে—বনের ভিতর হইতে, তাঁর ধ্বনির প্রতি-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনে করেন—ঐ বালিকাই তাঁহার ডাকের উত্তর দিতেছেন।

আকাশগঙ্গা জলের হিল্লোলশব্দকে জলের ভাষা ভাবিয়া, সে ভাষার উত্তরে কত কি শব্দ করেন। গাছ লতা পশু পক্ষীর শব্দে, শব্দ করিয়া উত্তর দেন। কখনও নির্ঝরের সুরে সুর মিশাইয়া নৃত্য করেন।

আকাশগঙ্গা বনের কোন গভীর অংশে, কোন বৃক্ষকোটরের সম্মুখে, আপনার শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া, সেই বালিকাকেই প্রতিশব্দের কারণ মনে করেন; এবং লুক্কায়িতাকে বাহির করিবার জন্য কত অন্বেষণ করেন—না পাইয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতে থাকেন।

একদিন এই প্রকারে সেই লুক্কায়িতা বালিকাকে অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে কি দেখিয়া স্থির হইলেন।

তখন রাত্রিকাল. জ্যোৎস্নায় আকাশ আনন্দে ঘন হইয়াছে। বৃক্ষসকলের ছায়া পাহাড়ের গায়ে, জ্যোৎস্নার গায়ে চিত্রিত হইয়া মাঝে মাঝে নড়িতেছে। পাহাড়ের ছায়া প্রকাণ্ড আকারে মাটীতে পড়িয়া বৃক্ষলতাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

বটবৃক্ষের ছায়া-মিশ্রিত আলোকে, আকাশের চাঁদ অপেক্ষা সুন্দর, জলের পদ্ম অপেক্ষা সুন্দর, এক জ্যোৎস্নাপদ্ম দেখিয়া যুবতী আনন্দে কৌতুকে স্তম্ভিতপ্রায় দাঁড়াইলেন।

যুবতী দাঁড়াইয়া বুকের উপর দুখানি করপদ্ম রাখিয়া সেই জ্যাৎস্নাপদ্মে তন্ময় হইয়া যাহা ভাবিলেন তাহা আমাদের ভাষায় অনুবাদিত করিলাম :—

"একি আমার সেই জলসঙ্গিনী ? তাঁর মাথায় তো আমারমত বড় বড় জটা ! এঁর জটা ছোট ছোট ! তাঁর মুখে আমারমত চুল নাই, এঁর মুখে আমার মাথার চুলেরমত চুল। এঁর বুকে চুল, মুখে চুল অথচ আমাদেরমত মুখ, হাত পা, নাক, কাণ। আমার মার মুখে কি বুকেতো চুল ছিল না। এঁর মুখে বুকে চুল ; আহা ! মা আমার কোথায়গেলেন ! মূর্ত্তিটী আমার মা নন, আমার সে জলসঙ্গিনী নন—তবে কে ? ইনি বোধ হয় আকাশের কেহ হবেন ? ঐ চাঁদের ভিতর হইতে বোধ হয় নামিয়াছেন ! কি সমুদ্রের ভিতরে থাকেন ! সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। ইনি যিনিই হউন আমি ইহাঁর সঙ্গে সমুদ্রে, আকাশে, বা চাঁদে গিয়া থাকিব। আমার মাকে বোধ হয় সেখানে দেখিতে পাব ! এই বন, পর্ব্বত, আকাশ, সমুদ্র সবই ওঁর—আমার কখনই নহে—আমিও ওঁর ! আমাকে হয়তো লইতে আসিয়াছেন। মা আমায় লইতে পাঠাইয়াছেন। আমি উহাঁকে ছাড়িব না। আহা ! কি সুন্দর রূপ ! একবার কাছে যাইনা ? আমার প্রাণ ওখানে যাইবার জন্য চঞ্চল হইতেছে কেন ? আমি কাছে যাই। এইতো কাছে আসিলাম ! আরো কাছে যাই ! এইতো আসিলাম ! আরো কাছে যাই। উনি আমারই জিনিস—আমারই জন্য আসিয়াছেন—আমি আরো কাছে

যাই। আমি ওঁরই জিনিস, উনি আমারই জিনিস, আরো কা
যাই। এইতো আসিলাম।

আহা! এবনে কত ফুল, কত লতা, দেখিয়া ছুঁইয়া, আম
মা যেমন আমাকে স্নেহ করিতেন, সেই রূপ স্নেহ করিয়াছি-
এখন এঁকে দেখিয়া—এঁর কাছে দাঁড়াইয়া আমার স্নেহের স
আরো কত মধুর ভাবের উদয় হইতেছে—সে সব ভাব
আগে কখনও হয় নাই।

আমি চাঁদ দেখিয়া আনন্দে উন্মাদিনীবৎ নাচিয়া থা
নাচিতে নাচিতে চাঁদকে কাছে আসিতে কত ডাকিয়া থাকি, চঁ
কখনও কাছে আসে নাই। এখন এঁকে দেখিতে দেখিতে বে
হইতেছে, যেন আমার চারিদিকে শত শত চাঁদ নামিয়া,
রূপে মিশিতেছে! চাঁদকে দেখিয়া যে আনন্দ, তাহার শত
আনন্দের সহিত আরও কত মধুর ভাব, ঐ রূপের সঙ্গে এ
হইবার জন্ম আমাকে চঞ্চল করিতেছে! আহা! আমি আ
সরিয়া যাই।

দেবী সেমূর্ত্তির কাছে গিয়া বসিলেন: বসিয়া পাগলিন
মত সেই মুখের দিকে চাহিলেন। চন্দ্রকর বৃক্ষচ্ছায়ায় মিশি
সে মুখে নড়িতেছে—সে মুখ শত চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর! দে
আরো সরিলেন। গায়ের কাছে বসিলেন। বসিয়া সে রূপে
এমনি মোহে পড়িলেন যে পাগলিনীর মত সে দেহে ধীরে ধীরে-
(যেন তাঁর করস্পর্শে সে দুর্লভ দেহে আঘাত না লাগে এ
ভাবে) সে দেহের পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাত দিলেন। আহা
কি অনন্ত তৃপ্তি! যেন শতচন্দ্রের লাবণ্যময় দেহ স্পর্শ করিলেন
যেন জগজ্জীবনের সাকার মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিয়া, প্রাণময় আন

সিহরিয়া উঠিলেন। একবার স্পর্শ করেন আর অমনি আনন্দ-বিদ্যুতে চমকিয়া হাত সরাইয়া অশ্রুমোচন করেন।

অশ্রুফেলিতে ফেলিতে মনে হয় যেন তিনি নক্ষত্র খচিত আকাশ অপেক্ষা ভাগ্যবতী—কেন না আকাশ তাঁহাকে ওরূপ স্পর্শ করিয়া সুখভোগ করিতেছে না। তিনি সমুদ্র অপেক্ষা বড়—কারণ সমুদ্র এঁকে তো হারা হইয়াছে! তিনি চাঁদ অপেক্ষাও বড়—কারণ চাঁদে ইনি নাই—ইনি এখন চাঁদ ছাড়িয়া তাঁর কাছে!

এইরূপ আনন্দে ফুলিতে ফুলিতে (যেন অমৃতের নেশায় বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া) সেই মূর্ত্তির কোলে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন।

যোগী তখন মুদিত নয়নে কল্পনাচক্ষে কোন দেবীমূর্ত্তিধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সুতরাং আকাশগঙ্গা সম্বন্ধে তখন এক-বারেই অজ্ঞ।

আকাশগঙ্গা যোগীর কোলে যেন অনন্ত তৃপ্তির কোলে বসিলেন। বসিয়া, দাড়ির চুলে অঙ্গুলিচম্পক সঞ্চালন করিতে করিতে যোগীর গলায় যেন অনন্ত শান্তিকে জড়াইলেন। তখন যোগী ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলেন। দেখিলেন, আপনার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি বাহিরে আসিয়া ভুজবেষ্টনে তাঁর রোমে রোমে অমৃত সঞ্চার করিতেছেন। চক্ষে ও স্পর্শে প্রাণ আসিয়া সে রূপে ও অমৃতে কিয়ৎক্ষণ ডুবিয়া রহিল। তার পর সেই রূপের ভিতরে এক প্রাণময়ী আনন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া, সেই মূর্ত্তিতে মিশিবার জন্য যোগী দেবীর মুখ চুম্বনে ঢলিয়া পড়িলেন। যোগী চুম্বনের ভরে মাটীতে ঢলিয়া পড়িলে, দেবী সে ক্রোড় ছাড়িয়া মাটীতে বসিয়া "কি ? কি ?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেবীর কান্না দেখিয়া

যোগী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। আবার সেই দেবীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ মুখচন্দ্রমা দেখিতে দেখিতে মনে হইল, এই নশ্বর মৃত্তিকাময় জগতের উপরে একটী আনন্দঘন জগতের রচনা হইয়াছে এবং সেই আনন্দঘন দেশের রাণীকে যেন তিনি বিবাহ করিতেছেন। যোগী আনন্দে বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কে" ?

দেবী সে কথার অর্থ বুঝিলেন না ; কিন্তু সে কথার মদে উথিত হইয়া, আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে যোগীর আবার গলা জড়াইলেন। জড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "মা ! কই" ?

"তাতো জানি না—আপনার মা কি এই বনে আছেন" ?

যোগী যাহা বলিয়া উত্তর দিলেন, দেবী তাহার অর্থ বুঝিলেন না। যোগী সেই রূপ, সেইরূপে মধুর শব্দ, মুখে ফুলের গন্ধ সম্ভোগ করিতে করিতে ভাবিতেছেন "সুখদুঃখময় সংসারে এমন তৃপ্তি আছে! নশ্বর রূপের সাগরে এমন রূপপদ্ম আছে! এ রূপ ?—না স্নেহ প্রেমের সাকার মূর্ত্তি! এ মুখের শব্দ ?—না স্নেহ প্রেমের সঙ্গীত। এ মুখ এত দিন কোথায় ছিল ? এই যুবতী উলঙ্গ পূর্ণ সৌন্দর্য্যে আমার গলা জড়াইয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনে আনন্দের সমুদ্র সৃজিয়াছে ; কামনার আগুণ নিবাইয়াছে ;—পবিত্রতার এই যুবতী মূর্ত্তি এত দিন কোথায় ছিল! আমি পবিত্রতার এই স্ত্রীমূর্ত্তিকে কি বলিয়া ডাকিব ? এমূর্ত্তিতে জননীর আত্মোৎসর্গ, ভগিনীর স্নেহ, ও পত্নীর প্রেম সব যেন জমাট বাঁধিয়াছে ; এই জননী ভগিনী পত্নীর সম্মিলিত মূর্ত্তিকে আমি কি বলিয়া ডাকিব, কি প্রকারে ব্যবহার করিব ? ইনি যেন তীর্থেশ্বরী আমি যেন তীর্থযাত্রী ;

ইনি যেন দেবী আমি যেন পূজক; ইনি যেন ভগবতী আমি যেন মহাদেব। ইনি যেন জোৎস্না আমি যেন মৃত্তিকা; ইনি যেন পদ্মিনী আমি যেন সরোবর। ইহাঁকে দেখিয়াই আমার সর্ব্ববাসনার শান্তি। আর কোন কামনা নাই। সুখে লোভ নাই; দুঃখে ভয় নাই, সম্পদে অহংকার নাই; বিপদে অধৈর্য্য নাই। আমার জন্ত এরূপকে কে বনে রাখিয়াছিল? সহস্র বনলতা, সহস্র প্রেমদা এরূপের পাথারে তলাইয়া যায়; সহস্র কাম এরূপ দেখিলে মন্ত্রভীত সর্পের মত আপনার দংশন বিস্মৃত হয়। আমার জন্য এরূপ কে এবনে রাখিয়াছিল? সমুদ্র মন্থনে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে পাইয়াছিলেন, আমি জীবনের সুখ দুঃখ মন্থনের পর এই রূপবতীকে পাইয়াছি আমার ভাগ্যে এতটা সুখ হইবে কে জানিত? আমি এ রূপকে কোথায় রাখিব? প্রকৃতি চাঁদকে আকাশের বুকে রাখিয়াছে; রত্নকে সমুদ্রের হৃদয়ে রাখিয়াছে; আমি এ রূপকে কোথায় রাখিব? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে প্রেমানন্দের পবিত্র উচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে, সেই জ্যোৎস্না পদ্মিনীর পবিত্র মুখে আপনার মুখ রাখিতে গিয়া সামলাইলেনঃ কি? যে মুখে কামের সেবা করিয়াছি সেই মুখ এমন পবিত্রতার স্বর্গে রাখিব? ভাবিয়া করযোড়ে গদ গদ স্বরে বলিতেছেন” “দেবী আপনি কে? আমাকে ক্ষমা করুন”!

দেবী সে ভাষা বুঝিলেন না। তিনি যে গোটা কুড়ি ত্রিশ, শব্দ প্রতিপালিকার কাছে শিখিয়াছিলেন, সে অভিধানে ওসব শব্দ নাই।

ভাষা বুঝিতে না পারুন, যোগীর চক্ষের জলে এবং ভাষার কাতারতায় গলিয়া গিয়া, আবার যোগীর গলা জড়াইলেন। সে

বামদেব আগেই জ্ঞানদানন্দনকে বলিয়াছিলেন, আকাশগঙ্গাকে অন্দরে প্রেমদার কাছে পাঠাইবে। আর আমার একটী শিষ্যা যিনি আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা—এঁকে আমার ঘরের পাশের একটী ঘরেস্থান দিবে—একটা মোটা কম্বল এঁর শয্যা হইবে।

এ মেয়েটী যে কে—তাহা বামদেব ভিন্ন আর কেহ জানেন না।

রাজা মহাশয় গৈরিক বসন ছাড়িয়া গৃহস্থের বেশে অন্দরে গেলেন।

এক সপ্তাহ পরে, বামদেব আপনারঘরে কয়েকটী আসন পাতাইলেন। ঘরের ঠিক মধ্যে আপনার, আপনার বাম দিকে জ্ঞানদানন্দনের—এবং জ্ঞানদার চারিদিকে অবগুণ্ঠনবতী, প্রেমদা, ও আকাশগঙ্গার। প্রাতে সকলে পবিত্র বেশে সেই ঘরে আসিয়া নিজ—নিজ আসনে বসিলে বামদেব ঘরের দ্বারের অর্গল রোধ করিলেন। সে ঘরের দিকে আদতে কেহ না যায়, এই জন্য একজন সিপাহি পাহারা দিতে রহিল। সকলে আসনে বসিয়া গম্ভীর হইলে, বামদেব বলিলেন" আকাশগঙ্গাকে ভক্তি শিখাইবার জন্য সমাজে আনা গেল, ভক্তি উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহা মানবপ্রকৃতির অতীত বস্তু। জ্ঞান মানব প্রকৃতিতে বীজাকারে আছে—ইহা আপনা আপনি বৰ্দ্ধিত হয়। ভক্তির-বীজ অন্যস্থান হইতে আনিয়া প্রকৃতিতে রোপণ করিতে হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভক্তির বৃদ্ধি হয় না—ইহা কার্য্য কারণের অতীত বস্তু। বনে ইহার উৎকর্ষ হয় না—ইহার উৎকর্ষ মানব সমাজে। সমাজ বন্ধনের উদ্দেশ্য মানব, মানবকে দেখিয়া আত্মতত্ত্ব শিখিবে, এবং আত্মতত্ত্ব শিখিয়া মানব মানবকে পূজা করিবে।

ঈশ্বর চিন্ময় মানবমূর্ত্তি। সেই চিন্ময় মানবমূর্ত্তি, এই ভৌতিক মানবমূর্ত্তিতে দেখাইবার জন্যই, মানবসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য"। "এখন তোমাদিগকে সেই চিণ্ময় মানবমূর্ত্তি দেখাইব। তোমরা একাগ্র মনে নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা কর"।

উহারা অনেকক্ষণ নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিলেন। প্রেমদা প্রথমেই ভক্তিতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পা জড়াইয়া সমাধিস্থা হইলেন।

আকাশগঙ্গা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। বামদেব বলিলেন মা! তুমি তোমার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাক। স্বামীর মুখ দেখিবামাত্র আকাশগঙ্গা দেখিলেন, স্বামীর মাংসমূর্ত্তি, বিলীন হইয়া এক আনন্দঘন শিবমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দেহে এক অনন্ত প্রেমময়ী মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াই, আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িলেন।

জ্ঞানদানন্দন বস্ত্রাচ্ছাদিতা মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন—বুঝিতে পারিলেন না কে। অনেকক্ষণের পর আন্দাজে ঠিক করিলেন, অমনি তিনটী স্ত্রীমূর্ত্তি আকাশে তাঁর দৃষ্টি পথে প্রকাশিতা হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তিনটীমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য নারীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। আপনার পরিচিতা অনেক স্ত্রীলোক সেখানে দেখিলেন—অসংখ্য নানা জাতীয় স্ত্রীলোক। সেই সব মূর্ত্তি একত্র হইয়া এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেমূর্ত্তি বর্ণনাতীত। পর পরিচ্ছেদে কিছু বর্ণনা করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

কবিতার আদর্শমূর্ত্তি। *

যে ঘৃত খাইয়াছে সে ঘৃতের আস্বাদন ভাষায় বলিতে পারে না, কিন্তু মনে মনে বুঝে। যে খায় নাই তাহাকে ঘির স্বাদ বুঝানর উপায় ঘি খাওয়ান। সেইরূপ যে মহামায়ার মূর্ত্তি দেখিয়াছে সে মনে মনেই জানে; ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। মহামায়ার মূর্ত্তি কি প্রকারে বর্ণনা করিব? যিনি দেখেন নাই, তিনি এ বর্ণনায় কল্পনারই খেলা দেখিবেন। যিনি সাধনার কাতরতায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তিনি আমার বর্ণিত এই মহামায়া চিত্র বুঝিবেন। আমি সে মূর্ত্তি, সে রূপ, সে রূপের ভাষা প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি তুলনার সামগ্রী একত্র করিয়া, সেই আসল মূর্ত্তির নকলে, একটা শোলার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলাম।

---

* যাহারা রস্কিনের "মডার্ন পেণ্টারস্" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে "Superhuman ideal" (আদর্শাতীত আদর্শ) নামক প্রবন্ধ বুঝিয়াছেন: তাঁহারা এই অধ্যায়টী ভাল বুঝিবেন।

"পাঠক পাঠিকা!

জ্যোৎস্নাকে ঘন কর। তাহাতে একটী সুন্দরীমূর্ত্তি গড়। ইহা খুব কোমলা মূর্ত্তি হইল। এই কোমলতার প্রতি রেণুতে কোটি কোটি বজ্র মিশাও। বজ্র ঐ কোমল সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আপনার ভীমভাব লুক্কায়িত করুক। এই সৌন্দর্য্যের কোমল বজ্র মূর্ত্তির ভিতরে অনন্ত প্রেম শোণিত হউক। কোটি কোটি শিরিশ কুসুমের কোমলতা ছাঁকিয়া; কোটি কোটি পদ্ম গোলাপের সৌরভ ছাঁকিয়া ঘন করিয়া, এই মূর্ত্তির এক একটী লোমে রাখ। জগতের প্রাণ ঘন হইয়া দুখানি পাদপদ্ম হউক। সে পাদপদ্মেরতলে ভক্তদলের লোকসেবাজনিত শ্রান্ত মুখের রাঙা রং ঘন করিয়া মাখাও।

পৃথিবীতে সুন্দরী যুবতীর অঙ্গস্পর্শে সজীব কোমলতা, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ে সুখ প্রবাহ ঢালিয়া দেয়: কিন্তু এই কোমলদেহে বজ্রশক্তি দেখা যায় না। বজ্রশক্তির সহিত শিরিশ ফুলের কোমলতা স্ত্রীলোকে অসম্ভব। কিন্তু মহামায়ার মূর্ত্তিতে কোটি কোটি বজ্রের অনন্ত শক্তির সহিত অনন্ত শিরিশ কুসুমের অনন্ত কোমলতা মিশিয়াছে। এ পাদপদ্ম স্পর্শ করিবামাত্র জগতের কোমলতা কঠিন বোধ হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের গায়ে পদ্মগন্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু মহামায়ার অঙ্গে অসংখ্য পদ্মের সুশীতল গন্ধ, লোমে লোমে সৌরভ বিস্তারে অসংখ্য ভ্রমরকে প্রলুব্ধ করিতেছে। এই লোমের একটী পৃথিবীতে পড়িয়া কোটি কোটি পদ্মের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কোমলতার একটী রেণু পৃথিবীতে আসিয়া পদ্ম, গোলাপ, শিরিশ প্রভৃতি ফুলে এত কাল ধরিয়া কোমলতার রচনা করিতেছে,

মহামায়ার হাসির এক কণাতে জগৎ অনন্ত কাল প্রতি উষায়, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি পূর্ণিমায় হাসিতেছে। কোটি উষা, কোটি সন্ধ্যা, কোটি পূর্ণিমাকে ঘন কর, করিয়া মহামায়ার একটী লোমে মিশাও। এই রূপ একটী মূর্ত্তি পাঠক পাঠিকা! কল্পনায় ধারণ করুন।

জ্ঞানদানন্দন এইরূপ মূর্ত্তি দেখিলেন। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির অপূর্ব্ব মুখশ্রীর দিকে তাকাইবামাত্র জ্ঞানদানন্দনের হৃদয়ে একটু কাম ভাব জাগিল। অমনি ভয়ে, লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ নত করিলেন। মার পা দেখিয়া ভক্তিতে বিভোর হইলেন। তখন মহামায়া জগৎ ভুলান স্বরে বলিলেন "বাবা! স্ত্রীলোকের মুখের দিকে কখনও চাহিবে না। কত মহাযোগীর পতন উহাতে হইয়াছে"! মুখ নত করিয়া থাকিলেও সেই মুখ স্মৃতিতে থাকিয়া মাঝে মাঝে কামাগ্নির উদ্দীপনা করিতেছে। ভক্ত ভক্তির জলে তাহা নিবাইতে পারিতেছেন না। সে আগুন তাঁর অস্তিত্বকে যেন বজ্রদাহে পুড়াইবার প্রয়াস পাইতেছে। ভক্ত সে দাহ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন "মাগো! তুমি ইচ্ছাময়ী! তোমার ইচ্ছাতেই সব হয়! আমাকে এবিপদ হতে উদ্ধার কর মা!

বলিতে বলিতে ব্যাকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিলে ভক্ত আপনার মুদিত নয়নের ভিতরে এক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলেন। একটী প্রকাণ্ড মড়ার মাথা, উপরের আকাশকটাহের সর্ব্বাংশ ঢাকিয়াছে। সেই মাথার তলে প্রকাণ্ড ভীষণ উদর—রুধিরে রঞ্জিত; প্রকাণ্ড স্বচ্ছ উদরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাড়ি ভুঁড়ি দেখা

যাইতেছে। সেই নাড়ি ভুঁড়ির ভিতরে কোটি কোটি শ্মশান—শ্মশানে কোটি কোটি নর নারী জলন্ত চুল্লীতে বিকট আকৃতিতে পুড়িতেছে। সেই ভীষণ অস্থিময় মুণ্ডে শোণিত, বসা, ও পচা মাংস ঝুলিতেছে। সেই মুণ্ডের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড কুলার মত জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে। তাহাতে রাঙা রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে। এক এক ফোঁটা রক্ত শূন্যে পড়িয়াই এক একটা অসুর মূর্ত্তিতে আকাশ ছাইয়া সেই বিকট মূর্ত্তিতে ছায়ার মত মিশিতেছে। যুবার ভিতরের কামাগ্নি ভয়ানক রসে নিবিয়া গেল। তখন ভক্ত অয়ে মা! মা! বলিয়া চক্ষু খুলিয়া যেন বাহিরের সেই সুন্দর মূর্ত্তি জড়াইতে গেলেন। অমনি মা তাঁকে কোলে তুলিলেন। যে কোমল বজ্রহস্তে ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া আছেন, কত অসুর বিনাশ করিয়াছেন, সেই কোমল বজ্রহস্তে মাতৃস্নেহ বর্ষিয়া, মহামায়া ভক্তকে কোলে তুলিলেন। সেই ক্ষুদ্র অনন্তহস্ত স্পর্শে, মাতৃপ্রেমকোল স্পর্শে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির প্রবাহে ভক্তের অস্তিত্ব প্লাবিত হইল। ভক্ত মা! মা! বলিতে বলিতে আনন্দের ঘোরে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে মার অমৃতপূর্ণ স্তনে মুখ দিলেন। যে স্তনপ্রস্রবণ হইতে স্নেহের ধারা জননীর স্তনে স্তনে বহিয়া জগতে সন্তানরক্ষা করিতেছে, জগতের সেই মাতৃস্নেহপ্রস্রবণে মুখ দিবামাত্র, মতৃস্নেহ, মাতৃকোমলতা, মাতৃপ্রয়াস সম্ভোগে আনন্দাধিক্যে বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া ভক্তিতে ডুবিয়া রহিলেন। মা, ঘুমন্ত শিশুর মত, সেই ভক্ত দেহকে বামদেবের কোলে রাখিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তখন বামদেবের সহিত ভক্তির উন্মাদক রঙ্গে সকলে স্তব করিতে থাকিলেন। উহাঁদের স্তবশেষে জ্ঞানদানন্দনের

বাহ্যজ্ঞান হইল। গুরুর কোল হইতে উঠিয়া বসিলেন। মা! মা! রবে কাঁদিয়া কণ্টকিতদেহে বিরহের দুঃখে অধীর হইতেছেন, এমন সময়ে সুবিধা বুঝিয়া বামদেব বনলতার চক্ষের কাপড় খুলিয়া দিলে দেবী সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন যাহা দেখিলেন তাহা বর্ণনাতীত। পর পরিচ্ছেদে কিছু বর্ণনা করিলাম।

শেষ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

একস-ট্যাসি বা চিদানন্দ।

কত মুখ, দেখিতে দেখিতে একখানি মুখে, আপনার বা জগতের সর্ব্বস্ব দেখা যায়। তাহা অপরিচিত হইয়াও চির-পরিচিত। মুহূর্ত্তে যাঁহাতে স্বর্গ পাই, তাঁর প্রাণের ভিতরে পুঁতিয়া যাই বা তাঁকে আপনার প্রাণের ভিতরে তলাইয়া, দুজনে সুখ-সমুদ্রের কোথায় অনন্তকালের জন্য ডুবিতে থাকি। তখন দুইজনের এত বৎসরের, এত শতাব্দীর, এত জনমের, সমস্ত দুঃখ, সেই মুহূর্ত্তস্পর্শে স্পর্শমণিস্পর্শে স্বর্ণবৎ সুখের আকার ধারণ করে। সেই একটী মুহূর্ত্ত, অনন্তকালকে আপন সুখময়গর্ভে উদরস্থ করে। সে মুহূর্ত্ত অনন্তের মস্তকে রাজমুকুট! ইহাকে বাদ দিলে, অনন্তকাল— অনন্তদরিদ্র। যদি কোন পুরুষ কোন রমণীর চাঁদমুখে, অনন্তকে এই প্রকারে জলবুদ্‌বুদেরমত মিশিতে দেখেন, তো, তিনি মহাসিদ্ধ—সমস্ত জগতের তিনি একমাত্র অধীশ্বর। স্বর্গ তাঁর আনন্দের কণা ধরিতে পারে না। সেই রমণীর নয়নজ্যোতিতে সমস্ত আকাশের জ্যোতি অন্ধকারতুল্য বোধ হয়। এই রমণীমুখ দর্শন যিনি করেন, তিনি মহাদেব আর এই রমণী ভগবতী। পুরুষ স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক পুরুষে এই প্রকারে মজিয়া, মাটীতে স্বর্গসৃষ্টি করেন।

যে মুহূর্ত্তে বনলতা জ্ঞানদানন্দনের রূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, সেই মুহূর্ত্ত অনন্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আজ যে সুখসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিল, বনলতা অনেক বৎসর পর তাহা দেখিবামাত্র, আনন্দেরতেজে এমনি অভিভূতা—উন্মাদিনী—হইলেন, যে দৃষ্টি স্থির করিয়া সেই রূপে, বিধাতার রূপ শুষিতে শুষিতে অসার-জ্ঞান হারাইয়া পতিতা হইলেন। তাঁর প্রাণ অনন্তপ্রাণে মিশিয়াগেল। আনন্দ ভিতরে বাহিরে এমনি অনন্ত হইল, যে, বনলতার দেহ সে আনন্দবেগ ধরিতে পারিল না। ধমনীতে আনন্দ নাচিতে নাচিতে, স্নায়ুতে আনন্দ উথলিতে উথলিতে, মস্তিষ্কে এত তেজ প্রকাশ করিল, যে, আনন্দভরে মস্তিষ্কের কোমল ব্রহ্মরন্ধ্র আনন্দে ফাটিয়াগেল। তখন রক্ত বা আনন্দধারা পিচকারির জলেরমত আনন্দে উপরে উঠিল। দেবী অপলক অনন্ত দৃষ্টিতে, স্বামীমূর্ত্তিতে আনন্দ ঘন, অনন্ত ঘন, চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আনন্দে ঢলিতে ঢলিতে আনন্দ ঘন মূর্ত্তির পাদপদ্মে আনন্দের কপাল আনন্দে রাখিলেন, অর্থাৎ স্বামীপাদপদ্মে আপনাকে, অনন্ত আনন্দ পুষ্প করিয়া, অঞ্জলি দিলেন।

সেই সময়ে জয় "শিবদুর্গা," জয় "শিবদুর্গা," বলিয়া সকলেই ভক্তিতে অধীর হইলেন।

বামদেব তখন সমাধিস্থ। জ্ঞানদানন্দন সমাধিস্থ। [illegible] ও আকাশগঙ্গা ভক্তির আনন্দে অশ্রুপূর্ণা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।